মনসামঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ

বাসুদেব রায়

382709

Dhaka University Library
382709

এম, ফিল, অভিসন্দর্ভ - ১৯৯৭
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

M.Phil.

Dhaka University Institutional Repository

DEPARTMENT OF BENGALI, UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH, PHONE : RES. 505294, OFF. 500346

ABUL KALAM MANZUR MORSHED
M. A. (Dhaka), M. A. (Brit. Col.), Ph. D. (Edinburgh)
PROFESSOR

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা হচ্ছে যে বাসুদেব রায় লিখিত "মৈমনসিংহ কাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ" এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ তাঁর নিজস্ব রচনা। অভিসন্দর্ভ লেখার সময় তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং মূল কাব্যগুলি পড়ে উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন।

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
২৫.১২.৯৭.
তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্যে প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ ''মনসামঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ'' আমার সুদীর্ঘ পাঁচ বছরের গবেষণার ফল স্বরূপ।

১৯৯৩ সনের পয়লা ফেব্রুয়ারী থেকে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের তত্ত্বাবধানে ''মধ্যযুগের কাব্যে দেবদেবী'' শীর্ষক শিরোনামে গবেষণা শুরু করি। পরবর্তীতে আমার তত্ত্বাবধায়ক গবেষণার বিষয় ''মনসামঙ্গল কাব্যে দেবদেবীর স্বরূপ '' শীর্ষক শিরোনামে পুনর্বিন্যস্ত করে দেন। মূলতঃ তাঁর স্নেহধন্য সহায়তা ও সহৃদয় অনুপ্রেরণা না পেলে আমার এ গবেষণা কাজ কোনদিন শেষ হত কিনা সন্দেহ। তিনিই গবেষণার প্রয়োজনে ১৯৯৬ সনে আমাকে ভারত পাঠানোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা করার পাশাপাশি তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মৃণাল কান্তি নাথের কাছে চিঠি লিখে পাঠান। অধ্যাপক মৃণাল কান্তি নাথ আমাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ করে দেন। আমি তাঁর কাছে সহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বিশেষ সহৃদয়তার সঙ্গে আমাকে সহায়তা করেছেন। এঁদের মধ্যে রতন কুমার দাশ, মোঃ আমান উল্লাহ-সহ সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

রঘুনাথ ভট্টাচার্য, নিতাই চন্দ্র দাস, বিশ্বজিৎ সাহা, প্রফুল্ল কুমার, সুভাষ চন্দ্র রায়, প্রদীপ কুমার সাহা, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ বন্ধুরা আমার গবেষণা কাজে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এছাড়া সযত্নে কম্পিউটার মুদ্রণের জন্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের উর্ধ্বতন সহকারী জনাব মোঃ বাহার আলম-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাসুদেব রায়

ডিসেম্বর, ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
ভূমিকা		৪
প্রথম অধ্যায় ঃ	মঙ্গলকাব্যের শ্রেণীবিভাগ ঃ মনসামঙ্গল	১১
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	বিভিন্ন কবির মনসামঙ্গল কাব্যে দেবদেবীর তালিকা	৮৩
তৃতীয় অধ্যায় ঃ	মনসামঙ্গল কাব্যে পৌরাণিক ও লৌকিক দেব-দেবীর গুরুত্ব	১৫৬
চতুর্থ অধ্যায় ঃ	গ্রীক পুরাণের দেব-দেবীর সঙ্গে ভারতীয় পৌরাণিক দেব-দেবীর তুলনামূলক আলোচনা	২০৭
পঞ্চম অধ্যায়ঃ	মনসামঙ্গল কাব্যে সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় পট ভূমির স্বরূপ	২৩৪
উপসংহার		২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মধ্যযুগের বাঙালী বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সাপ, ও বাঘ ভীতি, রাজরোষ ইত্যাদি নানাবিধ দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছে। এসবের নিপীড়নে এ দেশের জনগণ যতই মুখোমুখি পিড়িত হয়েছে, ততই তারা বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর আশ্রয় নিয়ে প্রতিকারের প্রার্থনা জানিয়েছে। এই লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কীর্তনকে উপলক্ষ করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিশাল পরিমণ্ডলে এক শ্রেণীর কাব্য গড়ে উঠে , সাহিত্যের ইতিহাসে সেগুলোই 'মঙ্গলকাব্য' নামে পরিচিত।

দেবতাদের মানুষ সৃষ্টির ব্যাপার নিয়ে সন্দেহ থাকলেও, মানুষ যে দেবতা সৃষ্টি করেছে তা নিয়ে সংশয় নেই। মানুষ দেবতা সৃষ্টি করেছে বলেই পৃথিবীর বিভিন্ন জনসমাজে দেবতাদের মধ্যে এত বৈচিত্র্যময় রূপ দেখা যায় এবং একই জনসমাজে দেবতা-কল্পনায় দেশ-কাল-ভাব অনুসারে দেবতাদের রূপ ও স্বরূপের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তিপত্তনের কাল নির্ধারণ করা যেমন অসাধ্য ব্যাপার, তেমনি ভারতবর্ষীয় দেবতাদের উদ্ভব নিরূপণ করা সম্ভব নয়। কোন এক অজ্ঞাত অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষে দেবতাদের রূপকল্পনা , উপাসনা এবং পূজার্চনা চলে আসছে তার সূত্র নির্দেশ সহজ নয়। দেবতাদের প্রকৃতি ও আচরণেও বৈচিত্র্য বিদ্যমান। ভারতীয় দেবতাদের একটি ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস সুস্পষ্ট ঃ বেদ থেকে উপনিষদ, উপনিষদ থেকে পুরাণ এবং পুরাণ থেকে লৌকিক রীতিতে; দেব-উপাসনার রীতি-প্রকৃতিও ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে। পৌরাণিক যুগের দেবপূজায় বৈদিক যজ্ঞ ও ব্রহ্মচিন্তা পরিবর্তিত আকারে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই যুগে দেবতাকে প্রত্যক্ষগোচর করে তোলার জন্যে প্রস্তরময়ী অথবা মৃন্ময়ী প্রতিমা গঠন করে পূজার আয়োজন জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাঁদের সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক এবং চমকপ্রদ কাহিনীর অভাব নেই।

আর্যরা যখন এ দেশে আসেন তখন তাঁদের বৈদিক ধর্ম এদেশে বসবাসকারীদের ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। ঋক, সাম ও যজু বেদের কাল পর্যন্ত সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বৈদিক ধর্ম তার নিজস্ব সত্ত্বা কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হলেও অথর্ব বেদের সময়েই বৈদিক ধর্মের উপর লোকায়ত ধর্মের ছাপ পড়তে দেখা যায়। পুরাণ, রামায়ণ এবং মহাভারতের যুগে লোকায়ত ধর্মেরই জয়জয়কার অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ শিব বা মহেশ্বরের কথা উল্লেখ করা যায়। বেদে

Dhaka University Institutional Repository

শিব বা মহেশ্বর বা মহাদেবের কোন কথা নেই। সেখানে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সঙ্গে রুদ্রের উল্লেখ আছে। অথচ পুরাণের যুগে রুদ্র অর্থাৎ অগ্নির জায়গায় শিব দেবাদিদেব মহাদেব হিসেবে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সঙ্গে মিলে 'ত্রয়ী দেবতা ' হয়েছেন। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তার পাশাপাশি শিব সংহারকর্তার মর্যাদাপূর্ণ আসনে সমাসীন। এমন কি কোন কোন সময় কিংবা ক্ষেত্রে শিব ব্রহ্মা-বিষ্ণুসহ সকল দেবতাদের সম্মিলিত শক্তির চেয়েও শক্তিমান। কিন্তু এই শিব হচ্ছেন প্রাক-আর্য যুগের মানুষের অর্থাৎ অনার্যদের দেবতা। এ উপমহাদেশে বৈদিক ধর্মের ক্রম-বর্ধমান প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার আদিম অধিবাসীরা বৈদিক ধর্মে দীক্ষিত হলেও, তাদের নিজস্ব ধর্মের প্রভাব আর্য-ধর্মের মধ্যে সংক্রামিত করতে সক্ষম হয়েছে। এরই ফলস্বরূপ অসংখ্য অবৈদিক যেমন- চণ্ডী, রক্ষা-কালী, শ্মশান-কালী, ভৈরব-ভৈরবী, ষষ্ঠী, শীতলা, ঘট্য-লক্ষ্মী, শ্মশান-শিব, লিঙ্গ-যোনি, চড়ক, মনসা প্রভৃতি দেব-দেবীরা কালের পরিক্রমায় আর্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূজিত হয়েছেন।

বাঙালীর মননে এবং অধ্যাত্মবুদ্ধিতে সাংখ্য - যোগ-তন্ত্রের প্রভাব বিদ্যমান। সর্বপ্রাণবাদে (জড়বাদে) এবং যাদুতে বিশ্বাসও তার অবচেতন ও নিঃসঙ্গ মনে চির-ক্রিয়াশীল। গুপ্ত আমলে এবং সেন আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসক অবস্থান করলেও বাংলাদেশের মানুষ প্রাচীন জড়বাদের সংস্কার -পুষ্ট জৈন-বৌদ্ধ হওয়ার কারণে এখানে মহাযান ও তজ্জাত মন্ত্র-তন্ত্র কালচক্র-বজ্র-সহজযানী বিকৃত বৌদ্ধমতই জনপ্রিয়তা পেয়ে লোকধর্মে পরিণত হয়।[১] গুপ্ত আমল এবং সেন আমলের মধ্যবর্তী সময়ে প্রায় চারশ' বছর বাংলার শাসনক্ষমতায় বৌদ্ধ পালরা অধিষ্ঠিত থাকার পরেও বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে বিশেষ করে সেন আমলে বৌদ্ধ বিলুপ্তি প্রায় সম্পন্ন হয়ে আসে। এই সময়েই নিম্নবিত্তের এবং সমাজ-বহির্ভূত বৌদ্ধরা নির্যাতনের আশঙ্কায় ভীত হয়ে হিন্দুসমাজে আত্মগোপনের মাধ্যমে সুপ্তভাবে স্বধর্ম রক্ষায় ব্রতী হল। সেনদের উচ্ছেদ করে তুর্কী আমল এলে দেখা যায় ঃ ''সেন আমলের ব্রাহ্মণ্য সমাজপতির রোষের ভয়ে এতকাল যারা তাদের বিশ্বাস সংস্কারে গড়া লৌকিক দেবতার তথা জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ও ঋদ্ধির প্রয়োজনে সৃষ্ট ইষ্ট ও অরি দেবতার পূজা কিংবা মাহাত্ম্য-কথা নির্ভয়ে-নির্বিঘ্নে-নির্দ্বিধায়-প্রকাশ্যে প্রচার করতে পারেনি, তারা বিদেশী বিধর্মী তুর্কী শাসনের প্রশ্রয়ে কিংবা ঔদাসীন্যে কিংবা উৎসাহে ক্ষমতাবিচ্যুত সমাজপতির পীড়নের ভয়মুক্ত হয়ে স্ব স্ব ইষ্ট ও অরি দেবতার মঙ্গল-গানে মুখর করে তুলল বাঙলার পরিবেশ।''[২] এভাবে অরি (যেমন - মনসা, শীতলা, শনি প্রভৃতি) এবং মিত্র (যেমন-চণ্ডী, ধর্মঠাকুর, সত্যনারায়ণ প্রভৃতি) শক্তি প্রতীক বিভিন্ন লৌকিক দেবতার সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি তাঁদের পূজার প্রসার এবং মাহাত্ম্য প্রচারিত হতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষকদের ধারণা, তুর্কী-আক্রমণের অনেক আগে থেকেই-খ্রীস্টীয় দশম-একাদশ শতক থেকেই - বাংলাদেশের হিন্দু ও বৌদ্ধ এবং আর্য ও অনার্য-স্তরের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ তথা মিলন-স্পৃহার জন্যে ধর্ম ও সংস্কৃতিগত একটা ব্যাপক পরিবর্তন-স্রোত বয়ে যায়।[৩] বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং অনার্য গোষ্ঠীভুক্ত সম্প্রদায়গুলো দৃঢ় অধ্যাত্ম্য প্রত্যয় ও সুস্পষ্ট ধর্মস্বাতন্ত্র্য হারিয়ে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম ও দেবতাদের মধ্যে এক মিশ্র-দেবতত্ত্বের আশ্রয়-গ্রহণে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষারত ছিল। পৌরাণিক বিশুদ্ধ ভক্তিবাদের সাথে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার পার্থিব ঐশ্বর্যস্পৃহা মিশ্রিত হয়ে এক আদর্শহীন, দেবপ্রসাদ-লালায়িত, ভক্তিমূল্যে সুখক্রয়লোলুপ ভিক্ষা-মনোবৃত্তি মানুষ ও দেবতার মধ্যেকার নতুন সম্পর্ক-নির্ধারণকারী হিসেবে দেখা দেয়। ধর্মের উন্নত-আদর্শভ্রষ্ট দুর্বল মানুষ কামনার আশ্রয়দাতা দেবতার পায়ে পড়ে কিছু ধূলিমলিন সংসার সুখ অর্জনের মাধ্যমে ভক্তি সাধনার সুলভ চরিতার্থতা লাভ করে। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলোতে এই পরিবর্তনের একটি অংশ প্রতিফলিত হয়েছে। রাজনৈতিক বিপর্যয়ের আঘাত এই পরিবর্তন-তরঙ্গের গতিবেগ বৃদ্ধি করলেও তা তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মূল প্রেরণার সাথে সম্পর্কহীন। মঙ্গলকাব্য-গুলোতে শুধু মানুষের কথা - তার জীবনচর্চার বিভিন্ন দিক থেকে শুরু করে চরিত্র-মাহাত্ম্য পর্যন্ত সবই ধরে রাখা হয়েছে । ''দেবতা সেখানে উপলক্ষ্য মাত্র, মানুষই লক্ষ্য[৪] এমন কি দেবতাটি''কে পর্যন্ত ক্রোধহিংসায় রূপ দিয়ে পৃথিবীর সাধারণ মানুষ রূপেই আঁকা হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে মনসামঙ্গলই প্রাচীনতম এবং চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগেই পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক রূপলাভকারী ; এর প্রভাব কালক্রমে অন্যান্য মঙ্গল-কাব্যের উপর বিস্তার লাভ করে। সর্পদেবী মনসার পূজা প্রচারের কাহিনী বর্ণনা করাই মনসামঙ্গল কাব্যের উদ্দেশ্য। খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতকে তুর্কী আক্রমণের পটভূমিকায় বাংলাদেশের সন্ত্রস্ত হিন্দু সমাজকে নিজেদের দুর্গ শক্তিশালী করার প্রক্রিয়ায় নিম্নবর্ণের অনেক আচার ও বিশ্বাসের সঙ্গে আপোষ করতে হয়েছে। উচ্চবর্ণের প্রতিভূ চাঁদ সদাগর মনসাদেবীর শত নির্যাতন, বিড়ম্বনার মধ্যেও মাথা নিচু করেননি। অবশেষে স্নেহের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে তিনি বাঁ হাতে মনসার পূজা দেন। আসলে অনার্যদের দেবতা মনসাকে কত আভ্যন্তর বাধা বিপত্তি এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আর্য সমাজে তথা উচ্চ বর্ণে স্থান করে নিতে হয়েছিল তার অস্পষ্ট ঐতিহাসিক ইঙ্গিত রয়েছে এ কাহিনীতে । যে-দেবতা স্বভাব মাহাত্ম্যে নয়, শক্তি প্রয়োগ করে ভক্তি আদায় করেন সেই মনসার চরিত্রে অন্তত নম্রতা এবং মাধুর্যগুণ আশা করা উচিত নয়। মঙ্গলকাব্যের দেবতারা প্রায় সবাই কোপন স্বভাবের হলেও ''মনসার চরিত্র এমনকি মঙ্গল দেবতাদের মধ্যেও বেশি সন্ত্রাসবাদী।''[৫] গ্রীক দেবতাদের মধ্যেও এ ধরনের মূর্তি আবিষ্কার করা সহজ নয়। অথচ মনসার মত

Dhaka University Institutional Repository

লৌকিক দেবতাদের ক্রূরতা এবং নিষ্ঠুরতার কারণেই তাঁরা মধ্যযুগের মানুষের শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। সামাজিক অনাচারের দিনে যখন নিষ্ক্রিয় শৈবধর্মের আদর্শ এদেশের সমাজ থেকে বিদায় নিয়েছে, তখন ''প্রবল রাষ্ট্রশক্তির সম্মুখে সমগ্র সমাজ নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় বিবেচনা করিয়া তাহার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য এক ভয়ঙ্করী শক্তি-দেবতার উদ্বোধন করিল।''৬ জীবনের উত্তাল অনিশ্চয়তা, রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মুখে মানুষের অসহায়ত্ব এবং আত্মবিশ্বাস যেন ''মনসা' নামক ভয়ঙ্করী শক্তি-দেবতাতে সংহত ও প্রগাঢ় অভিব্যক্তি পেয়েছে।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ''মনসামঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ ''। স্বাভাবিক কারণেই এই আলোচনার পরিমন্ডল সমগ্র মঙ্গলকাব্য নয়, মঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতম শাখা 'মনসামঙ্গল' কাব্য।

''মনসামঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ'' বলতে মনসামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত-উল্লেখিত - বিধৃত আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় পটভূমির স্বরূপ এবং তারই প্রেক্ষিতে গড়ে উঠা পৌরাণিক ও লৌকিক দেব-দেবীদের স্বরূপ উন্মোচনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

শিব-প্রভাবের বিরুদ্ধে চন্ডীর সংগ্রামের পরিধির চেয়েও মনসার সংগ্রামের পরিধি বিস্তৃততর। চন্ডী-মঙ্গলে দেখা যায়, আর্য-সমাজ বহির্ভূত শক্তির প্রভাব আর্য সংস্কার আশ্রিত পরিবারে ঢুকেছে - ধনপতি সদাগরের দ্বিতীয় স্ত্রী খুল্লনার মাধ্যমে চন্ডীদেবী তাঁর প্রভাব, মাহাত্ম্য ছড়িয়েছেন এবং পরিশেষে পত্নী খুল্লনা ও পুত্র শ্রীমন্তের প্রভাবেই , ধনপতি চন্ডীর মাহাত্ম্য তথা চন্ডী পূজায় সম্মতি দেন। কিন্তু মনসামঙ্গলে দেখা যায়, এই প্রভাব কেবলমাত্র স্বতন্ত্রভাবে পরিবারের চৌহদ্দীতে আটকে না থেকে সমাজের সকল স্তরে সমস্ত গন্ডির মধ্যে আলোড়িত হয়েছে। মনসাকে স্বীকার না করা ও তাঁর পূজায় রাজী না হওয়ার কারণে চাঁদ সদাগরের জীবনে যে সর্বনাশা দুর্যোগ নেমে এসেছে, মনসাকে স্বীকার করার মাধ্যমে সে দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে -

''ব্রাহ্মণে হাতে ধরে সুদ্রে ধরে পায়।
পাত্রগণে চান্দের আগে কহিআ বোজায়।।
একদিন পুজ সাধু জয় বিসহরি।
ধরে পুত্রে ঘরে নেহ চম্পক অধিকারী।।
প্রজাগণের বচন সুনিআ চন্দ্রধর।

Dhaka University Institutional Repository

গদগদ করি বোলে প্রজার গোচর।।
পদ্মা পূজিবারে জেন চান্দ সদাগরে।
চিত্তে সাত পাচ করে মুখে নাহি সরে।।''[৭]

এখানে লক্ষণীয় যে, মনসাপূজার আবেদন ব্যাপক এবং সামাজিক। অবশেষে চাঁদ সদাগর মনসাপূজায় সম্মতি প্রদান করেন। সমাজের সকল অংশ যে দেবতার প্রতি স্বীকৃতি জানিয়েছে, সমাজ-বিধায়ক হয়ে চাঁদ সদাগরের পক্ষে সেই শক্তিকে স্বীকার না করে নেবার তাই কোন যুক্তি বা অর্থ থাকে না। এই নিরঙ্কুশ স্বীকৃতির মাধ্যমে অনার্য দেবতা মনসার পাশাপাশি অনার্যদের ভাবনাকল্পনারও নিশ্চিত বিজয় সূচিত হয়েছে। মনসামঙ্গল কাহিনীর দিক থেকে প্রাচীনতম হলেও দেবতা হিসেবে ব্রাহ্মণ্য-সমাজে স্বীকৃতির বিবেচনায় নবীন। এ থেকে প্রমাণিত হয়, কত সুদীর্ঘকাল ব্যাপী এই স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্রাম চলেছিল। অবশ্য স্বীকৃতি অর্জনে বিলম্ব ঘটলেও যখন তা এসেছে সেটা পরিপূর্ণভাবেই এসেছে।

মধ্যযুগের বাংলাদেশের নিরন্তর ভাঙ্গায় বিপর্যস্ত হাহাকার এবং শুকনো আবহাওয়ার কথা স্মরণে রেখে বলা যায় যে, সে পরিবেশে যে দেবতা শুধু অকুণ্ঠ চিত্তে দিতে জানেন, তাঁরই প্রাধান্য। চণ্ডীদেবীর মতই মনসাদেবীরও দেওয়ার ক্ষমতা অপরিসীম বলে তাঁকেও স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাই মধ্যযুগের মানুষ চণ্ডীর মত মনসাকে আশ্রয় করে তাদের দুঃখ-ভরা বর্তমান থেকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতে উত্তরণের কল্পনা করেছে। বাস্তবের মধ্যে নিবিষ্ট তাদের মন পরিপূর্ণ বিশ্বাসেই মনসার প্রসাদে সর্বাঙ্গীন পূর্ণতার ভরসা রেখেছে।

''মহাদেব বলে পদ্মা পৃথিবী বিদিত।
ভক্তিভাবে পূজিলে আশা পূরণ বাঞ্ছিত।।
সর্ব্বকালে নিরাপদ থাকে সেই জন।
অপুত্রার পুত্র হয় দরিদ্রের ধন।।
হারাইলে ধন পায় সেবার ইনাম।
ধন ধান্য সম্পদে বাড়ে সেই জন।।''[৮]

লক্ষণীয় দিক হচ্ছে, স্বয়ং মহাদেব বা শিব কর্তৃক মনসা বা পদ্মার মাহাত্ম্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে এখানে শক্তির (মনসার) প্রাধান্য এবং শিবের ব্যর্থতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। শক্তির নিকট শিবের পরাজয়

Dhaka University Institutional Repository

থেকে এ তত্ত্বই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে যে, বাস্তব সামাজিক ও জাগতিক সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ জীবন তথা মর্ত্যজীবনকে যে দেবতা স্বীকার করেন, ভাবমার্গে তাঁর ললাটেই বিজয় - তিলক অঙ্কিত হয়। আর যে দেবতা উল্টোটা অর্থাৎ জাগতিক জীবনকে অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র ভাবমার্গীয় অধ্যাসকে আশ্রয়ের মাধ্যমে পারমার্থিক কল্যাণের কথা চিন্তা করেন তিনি 'দুঃখ মাত্র ধন' জন-সাধারণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন।

খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে শুরু করে অষ্টাদশ, এমন কি ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত পাঁচশ' বছর ধরে অসংখ্য কবি মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি - কান্না মেশান মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন । 'বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য' রক্ষা করে তাঁরা একই কাহিনী-কাঠামোর মধ্যে তাঁদের কাব্যকে গড়ে তুলেছেন, যেখানে দেবতারাও ধূলি-ধূসরিত এই মর্ত্য-ভূমিতে নেমে এসেছেন স্বর্গপুরীর মোহনীয় আবেষ্টনী ভেদ করে, এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ''কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। যদি তাঁহারা নিজ নিজ অভ্রভেদী মূর্তি ধারণ করিবার চেষ্টা মাত্র করিতেন, তাহা হইলে বাংলার গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের স্থান হইত না।''[৯] তাই মনসামঙ্গল 'বাঙালীর জাতীয় কাব্য' হিসেবে মর্যাদার অধিকারী হয়েছে।

মনসামঙ্গল কাব্য সম্পর্কে বহু খ্যাতিমান, পরিশ্রমী, নিবেদিত প্রাণ গবেষকের মূল্যবান তথ্য-সমৃদ্ধ গবেষণা বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধতর করেছে। মনসামঙ্গল তথা মঙ্গলকাব্যগুলো সম্পর্কে গবেষকরা মূলতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন।

১। কবিদের জীবনী সম্পর্কিত গবেষণাধর্মী বিচার, বিশেষ করে কাব্য রচনার কাল নির্ধারণের চেষ্টা।

২। দেবদেবী সম্পর্কিত পুরাতাত্ত্বিক , ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক বিচার।

৩। সাহিত্যের ইতিহাসে কবি এবং কাব্যের বিশিষ্ট স্থান নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ।

৪। কাব্যের রচনারীতি আলোচনা প্রসঙ্গে সংস্কৃত রীতি অবলম্বনে অলঙ্কার-নির্ণয়।

৫। ভাষাতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ।

৬। পাত্র-পাত্রীর চরিত্রাদির বিচার-বিশ্লেষণ। ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

এ সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণেই মনসামঙ্গলের ইতোপূর্বেকার গবেষণা-সমালোচনাকে পূর্ণাঙ্গ বলা যায় না। বিশেষ করে মনসামঙ্গলের দেবদেবী সম্পর্কিত আলোচনা-গবেষণাতে এখনও অনেক বিষয় অনুদ্‌ঘাটিত রয়েছে। এ ধরনের একটি প্রায় অনুদ্‌ঘাটিত বিষয়কে তুলে ধরার প্রয়োজনের দাবীকে স্বীকার করেই মনসামঙ্গলের দেবদেবীদের স্বরূপ সন্ধানের প্রয়াসে লিখিত আলোচ্য অভিসন্দর্ভ ''মনসামঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ ''।

তথ্য নির্দেশ ঃ

০১। মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, শ্রীরায় বিনোদঃ কবি ও কাব্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯১, পৃঃ ৬

০২। আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খন্ড), বর্ণ মিছিল, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৮, পৃঃ ২৯

০৩। শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (প্রথম খন্ড ঃ আদি ও মধ্য যুগ), ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৬৭, পৃঃ ৬০

০৪। শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য, পুঁথি প্রকাশনা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪, পৃঃ ১৩

০৫। ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রাচীন কাব্য ঃ সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৩, পৃঃ ৯১

০৬। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ), ১৯৮৯, পৃঃ ২৪৭

০৭। তমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত (সম্পাদিত), সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২, পৃঃ ৩২৯-৩০

০৮। বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য (সঙ্কলিত), বিজয় গুপ্ত প্রণীত পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, বাণী-নিকেতন, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত (প্রথম প্রকাশ, ১৩৩৫), পৃঃ ৫২

০৯। আশুতোষ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত ও সঙ্কলিত), বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬২, ভূমিকা পৃঃ ২

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মঙ্গলকাব্যের শ্রেণীবিভাগ ঃ মনসামঙ্গল

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগীয় বিভিন্ন কবিদের রচিত মঙ্গলকাব্যগুলো বাংলার সমাজ জীবনের দর্পণ স্বরূপ। খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্ম-বিষয়ক আখ্যান-কাব্য প্রচলিত ছিল, তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের[১] ভাষায় বলা চলে যে মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই প্রথম বাঙালীর সামাজিক অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে। এই কারণে মঙ্গলকাব্যসমূহকে বাংলার মাটির সম্পদ (product of the soil) হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে ; কেননা মঙ্গলকাব্যধারার উদ্ভব ও বিকাশ বাংলার লোক-জীবনের জন্ম ও বিবর্তন ধারার সংগে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । মোট কথা, '' বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে এই কাব্য-প্রকাশের ধারা বিচিত্র সম্পর্কে যুক্ত হয়ে আছে ।''[২]

বঙ্গদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, খ্রীস্টীয় একাদশ শতক পর্যন্ত এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের আধিপত্য ছিল । এর পূর্বে পাল রাজগণ এখানে প্রায় চারশ' বছর রাজত্ব করেন। উল্লেখ্য, পাল রাজত্বের শেষ অর্থাৎ খ্রীস্টীয় দশম ও একাদশ শতকের পূর্বে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তেমন ভাবে বিস্তার লাভ করতে সক্ষম হয়নি। অবশ্য, পাল রাজগণের সময়কালেই বঙ্গদেশে প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের সাথে স্থানীয় বেশ কিছু লৌকিক ধর্ম-সংস্কারের সংমিশ্রণ শুরু হয়। ফলস্বরূপ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মিশ্র কতকগুলো লৌকিক ধর্মমতের সৃষ্টি হয় । এদিকে সেনরাজদের সময় থেকেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তৎকালীন বঙ্গদেশের বিভিন্ন জায়গায় নানাবিধ সামাজিক অবস্থার সাথে সন্ধি করার ফলে বিভিন্ন নতুন সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। কালক্রমে সমাজে পুরাতন ধর্ম বিশ্বাসের মূল শিথিল হয়ে নবাগত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হলেও রক্ষণশীল সমাজ পুরাতনকে একেবারে পরিত্যাগ করতে ব্যর্থ হয়। ফলতঃ এই বঙ্গদেশের প্রচলিত ধর্মসংস্কারই যুগোপযোগী সংস্কার মাত্র লাভ করত সমাজের অন্তস্থলে সুপ্তাবস্থায় অবস্থান নেয় । '' বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার যে কি ভাবে এক দেহে লীন হইয়া আছে, মঙ্গলকাব্যগুলি তাহারই পরিচয় ।''[৩]

Dhaka University Institutional Repository

এটা সর্বজনবিদিত যে , হিন্দু সেন বংশ রাজত্বের সময়ে অর্থাৎ খ্রীস্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশ তুর্কীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। গবেষকদের ধারণা, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক সেন রাজগণ এদেশের নগণ্য সংখ্যক উচ্চ বর্ণের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়েছিলেন । সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নশ্রেণীর উৎপীড়িত জনসাধারণ তুর্কী আক্রমনের সময় হয় রাজবিরোধী কিংবা উদাসীন ছিলেন। ফলে সেন রাজগণ তুর্কীদের এ লঘু আক্রমণেও ক্ষমতাচ্যুত হলেন । তা সত্ত্বেও মিশ্র-জাতি বাঙালী অধ্যুষিত এই বঙ্গদেশে '' যে সমাজ-সংহতি সংঘটিত হয়েছিল, যে ভাব-সাঙ্কর্যের সৃষ্টি হয়েছিল, বাংলাদেশের মৃত্তিকা-উপাদানের সঙ্গে পৌরাণিক ও শাস্ত্রানুগ বোধবুদ্ধির যে মিশ্রণ ঘটেছিল এবং এই মিশ্রণের ফলশ্রুতি স্বরূপ বাংলা কাব্যধারায় যে প্রবল উচ্ছ্বাসময়, প্রচন্ড বেগ সমন্বিত বন্যা প্রবাহ সঞ্চারিত হয়েছিল মঙ্গলকাব্য তারই সার্থক সাক্ষ্যবাহী ।''[৪]

মঙ্গল কথাটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কল্যাণ । আবার, '' লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য কথা মঙ্গল গান নামে আখ্যাত এবং লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্যকথা সম্বলিত পাঁচালীগুলো মঙ্গল নামে পরিচিত।''[৫] অর্থাৎ, যে কাব্যের কাহিনী শুনলে সকল রকম অকল্যাণ দূর হয় এবং পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভ তথা মঙ্গল অর্জিত হয়, মোটামুটিভাবে তাকেই মঙ্গলকাব্য বলা হয়। 'মঙ্গল' শব্দটির অর্থ 'বিজয়' হিসেবেও গ্রহণ করা যায় এই কারণে যে, ''এক এক ধারার মঙ্গলকাব্য এক একটি বহিরাগত দেবতার সমস্ত বাধা-বিঘ্ন ও বিরুদ্ধ মতবাদ অতিক্রম করে নিজ নিজ পূজা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা-অর্জনের বিজয় বার্তা ঘোষিত করে। এই মঙ্গলকাব্যের মূল বিষয় এক একটি দেবতার মাহাত্ম্য-কীর্তন।''[৬] বাংলার মাটিতে সৃষ্ট মঙ্গলকাব্যের এই নতুন দেবতামন্ডলে তথা '' লৌকিক দেবতা-ব্যূহে স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য অনার্য-সংস্কৃতির সুস্পষ্ট নিদর্শন।''[৭] মনসা এবং চন্ডী-ই মঙ্গলকাব্যের প্রধান স্ত্রীদেবতা। ধর্মঠাকুর পুরুষদেবতা। শিবকেও বৃহত্তর অর্থে মঙ্গলকাব্যের বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

মঙ্গলকাব্য জাতীয় রচনা মোটামুটিভাবে চারটি অংশে বিভক্ত ঃ

- প্রথম অংশ-বন্দনা । এই অংশে বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা করা হয়।
- দ্বিতীয় অংশ - গ্রন্থ-রচনার কারণ - বর্ণনা । আত্ম-পরিচয় বর্ণনা পূর্বক এ প্রসঙ্গে প্রায় সকল কবিই তাঁদের বর্ণিত দেব-দেবীর প্রত্যক্ষ আদেশ বা স্বপ্নাদেশের কথা উল্লেখ করেছেন।
- তৃতীয় অংশ - দেব খন্ড । পৌরাণিক দেবতার সাথে লৌকিক দেবতাদের সম্বন্ধ সৃষ্টিই এর মূলকথা। এই অংশে শিবের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

০ চতুর্থ অংশ-নর খন্ড এবং আখ্যায়িকার বর্ণনা। এটাই মঙ্গলকাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ খন্ড। দেবতার পূজা-প্রচারের জন্যে কোন কোন দেবতা তথা স্বর্গলোকের অধিবাসী অভিশাপগ্রস্ত হয়ে নরলোকে জন্মগ্রহণের বর্ণনা এতে আছে। যেমন - চন্ডীমঙ্গলের কালকেতু-ফুল্লরা, দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র ও পুত্রবধূ নীলাম্বর ও মায়া ; মনসামঙ্গলের লখিন্দর-বেহুলা কামদেবতা মদনের পুত্র ও পুত্রবধূ এবং ইন্দ্রসভার নর্তক-নর্তকী অনিরুদ্ধ ও উষা ইত্যাদি ।

পূর্বেই উক্ত হয়েছে - ব্রাহ্মণ্য আদর্শের বিরুদ্ধে লৌকিক আদর্শের সংঘাত, ব্রাহ্মণ্য জীবন-দর্শনের সঙ্গে লৌকিক জীবন-দর্শনের সংঘাতের মাধ্যমে ''বাংলার মধ্যযুগ লৌকিক জীবনের জাগরণ ও অভিব্যক্তিতে চঞ্চল ও মুখর''[৮] হয়ে উঠে । এর ফলে বাঙালী এক বিশাল দেব-পরিমন্ডলের অধিকারী হল। অর্থাৎ, '' রামায়ণ, মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণগুলির মধ্য দিয়ে সর্বভারতীয় হিন্দুর যে আরাধ্য দেবমন্ডলী, তার থেকে স্বতন্ত্র বাঙালী হিন্দুর একটি নিজস্ব দেবমন্ডলী গড়ে উঠল। তাতে রইল সর্ব ভারতীয় পৌরাণিক অনেক দেবদেবীর পরিবর্তিত রূপ এবং অনেক লৌকিক দেবদেবীর পরিবর্তিত তথা ঊর্ধ্বায়িত রূপ ।''[৯] বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি মুসলিম শাসনামলে যখন রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হল সেই সুযোগে বঙ্গদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ '' অনার্য ধ্যানধারণা ও দেবদেবী ক্রমাগত প্রাধান্য অর্জন করতে লাগল।''[১০] অবশ্য - লোকায়ত ধর্মের প্রভাবে উদ্ভূত এসব অনার্য তথা লৌকিক দেব দেবী '' পরবর্তী কালে ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন।''[১১] তা হলে, মূল আর্যেতর ভাবধারার সঙ্গে পৌরাণিক সংস্কারের সমন্বয়ী আদর্শে রচিত মঙ্গল সাহিত্যকে যথার্থ মঙ্গলকাব্য হিসেবে অভিহিত করা যায়। প্রথম দিকে চন্ডী ছিলেন অনার্য বিশেষ করে ব্যাধ জাতির দেবী। কিন্তু কালক্রমে তিনি পৌরাণিক শিবের পত্নী পার্বতী বা উমার সাথে একাত্ম হয়ে যান । সর্পের দেবী ক্রূর প্রকৃতির মনসার অনার্যত্ব প্রায় সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু পরবর্তীকালে (সমন্বয়ের যুগে) তিনি-ই শিবের মানস কন্যা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। পুরুষ দেবতা ধর্ম ঠাকুর পৌরাণিক না হয়েও পৌরাণিক বিষ্ণুর সাথে প্রায় একাত্ম হয়ে যান । ফলে পূর্বের সংস্কার ভেঙ্গে কিংবা ভুলে গিয়ে ব্রাহ্মণ কবিরাও এ সমস্ত দেব-দেবীর আরাধনা তথা তাঁদের মহিমা - প্রচারক কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন।

মধ্যযুগে ' মঙ্গল ' শব্দের প্রভাব বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর ওপর লক্ষ্য করা যায় - শাক্ত, শৈব, সৌর প্রভৃতি এমনকি বৈষ্ণবরাও একাকার হয়ে যান। বৈষ্ণবদের চৈতন্য-মঙ্গল, অদ্বৈত-মঙ্গল, গোবিন্দ-মঙ্গল, কৃষ্ণ-

Dhaka University Institutional Repository

মঙ্গল, রাধিকা-মঙ্গল প্রভৃতি কাব্যগুলো এসময় রচিত হতে থাকে, যদিও এগুলো মঙ্গলকাব্যধারার-বৃত্তে প্রবেশাধিকার অর্জন করতে সক্ষম হয়নি প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অভাবে । এর বাইরের মঙ্গলকাব্য-সমূহের মধ্যে মূলতঃ দু'টি ধারা পরিলক্ষিত হয়- পৌরাণিক ও লৌকিক। পৌরাণিক পর্যায়ে রয়েছে দুর্গা-মঙ্গল, ভবানী-মঙ্গল, গঙ্গা-মঙ্গল, গৌরী-মঙ্গল, অন্নদা-মঙ্গল সূর্য-মঙ্গল, প্রভৃতি এবং লৌকিক পর্যায়ে রয়েছে - মনসা-মঙ্গল, চণ্ডী-মঙ্গল, ধর্ম-মঙ্গল, শিব-মঙ্গল বা শিবায়ন, শীতলা-মঙ্গল, ষষ্ঠী-মঙ্গল, রায়-মঙ্গল প্রভৃতি। এসমস্ত মঙ্গলকাব্যকে আমরা মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি ঃ

ক) প্রধান মঙ্গলকাব্য - মনসা-মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল ;

খ) বিশিষ্ট মঙ্গলকাব্য - শিবমঙ্গল বা শিবায়ন, অন্নদা মঙ্গল প্রভৃতি এবং

গ) গৌণ মঙ্গলকাব্য - শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল প্রভৃতি ।

সত্যি কথা বলতে কি, মঙ্গলকাব্য বলতে মূলতঃ মনসামঙ্গল , চণ্ডীমঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গলকেই বুঝিয়ে থাকে। শিবমঙ্গল বা শিবায়ন মঙ্গলকাব্য কিনা এ প্রশ্নে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, যদিও বেশ কয়েকজন কবিই এ কাব্য রচনা করেছেন। আর অন্নদামঙ্গলের একক রচয়িতা ভারতচন্দ্র তাঁর অতুলনীয় কবি প্রতিভা (চণ্ডীমঙ্গলের মুকুন্দরামের কথা স্মরণে রেখেও বলা যায়) দিয়ে খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে যে নতুন বৈশিষ্ট্যের মঙ্গলগান রচনা করেন, গবেষকদের দৃষ্টিতে তা পুরোপরি মঙ্গলকাব্য হয়ে উঠতে পারেনি। আর গৌণ মঙ্গলকাব্যসমূহও স্বাভাবিক কারণেই যথার্থ মঙ্গলকাব্য হয়ে উঠতে পারেনি। এখন আসা যাক প্রধান তিনটি মঙ্গলকাব্য (মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল) - এর কথায়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কবি এ তিন মঙ্গলকাব্যধারার কাব্য রচনা করেন। অনেক সমালোচক বাঙালী কবিদের রচিত বিশেষ অঞ্চলের মঙ্গলকাব্যগুলোকে বাংলার জাতীয় মহাকাব্যরূপে চিহ্নিত করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে রাঢ় অঞ্চলে রচিত ' ধর্মমঙ্গল ' কাব্যের নামোল্লেখ করা যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলো রাঢ় অঞ্চলে জাতীয় মহাকাব্য হিসেবে মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু, যেহেতু পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর - দক্ষিণ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেই মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ কাব্য প্রচারিত হওয়ায় মনসা-পূজক সম্প্রদায় সম্পূর্ণ বঙ্গদেশ (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ) - সহ সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহে (আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার কোন কোন স্থানে) অবস্থান করছে, সেহেতু অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন - '' ধর্মমঙ্গলকে নহে, মনসামঙ্গল কাব্যকেই মধ্যযুগীয় বাংলার জাতীয় কাব্য বলা যাইতে পারে।''[১২] মনসামঙ্গলকাব্য হচ্ছে '' বাংলাদেশের রামায়ণ''[১৩], যে কাব্যধারায় ' চণ্ডীমঙ্গলের, কবি মুকুন্দরাম কিংবা 'অন্নদামঙ্গলে'র কবি ভারতচন্দ্রের মত প্রথম শ্রেণীর কবি-প্রতিভার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও প্রচারণা এবং

Dhaka University Institutional Repository

জনপ্রিয়তার প্রাবল্য বয়ে যায়। অধ্যাপক সাঈদ-উর রহমান তাই সঙ্গত কারণেই মনসামঙ্গলকে '' বাঙালীর জাতীয় কাব্য''[১৪] বলে অভিহিত করেছেন, যদিও তিনি চণ্ডীপূজার বিকাশস্থল হিসেবে পশ্চিম বাংলার উল্লেখ কালে মনসাপূজার বিকাশস্থল পূর্ব বাংলা বলে উল্লেখ করেছেন।[১৫]

এখন সংক্ষিপ্ত পরিসরে মনসামঙ্গল, চণ্ডী, চণ্ডীমঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গল-এই তিন জাতীয় কাব্যধারার মধ্যে-তুলনামূলক আলোচনা করে দেখা যায়। বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী নিয়ে মনসামঙ্গল, কালকেতুর উপাখ্যান ও ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান - এ দু'টি কাহিনী নিয়ে চণ্ডীমঙ্গল এবং হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী ও লাউসেনের কাহিনী- এ দু'টি স্বতন্ত্র কাহিনী নিয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত। সংশ্লিষ্ট নামের দেব-দেবীদের মাহাত্ম্যপ্রচার বা পূজাপ্রচারই হচ্ছে কাব্যধারাত্রয়ের মূল উপজীব্য বিষয়। অবশ্য, যে কোন অজুহাতে ছলে - বলে - কলে-কৌশলে পূজা-আদায়ের জন্যে উন্মুখ মঙ্গলকাব্যধারার দেবতাদের মধ্যে ধর্মঠাকুর যথেষ্ট ব্যতিক্রম । বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ধর্মমঙ্গল প্রাচীনতম ; কিন্তু কাব্য নিদর্শন সমূহের দিক দিয়ে নবীনতম। ধর্মমঙ্গলে ঘটনার কালনির্দেশক ধর্মপাল ও তাঁর পুত্রকে ঐতিহাসিক বিবেচনা করলে ঘটনাকাল খ্রীস্টীয় নবম-দশক শতক হয়। আদি কবি ময়ূ ভট্টের আবির্ভাবকাল অজ্ঞাত থাকায় অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতকের পূর্বে পরিলক্ষিত হয় না ।[১৬] মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে ভাবপ্রেরণার দিক দিয়ে কোনটা পূর্ববর্তী তা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব হলেও এটা সুস্পষ্টভাবেই বলা যায় যে, সাহিত্যিক উন্মেষের দিক দিয়ে মনসামঙ্গলই প্রাচীনতর। খ্রীস্টীয় চতুর্দশ-পন্নদশ শতকের মধ্যেই উভয় দেবী (মনসা ও চণ্ডী) পৌরাণিক ভক্তি, রূপ প্রভৃতি আত্মসাৎ করত অস্পৃশ্য, অনার্য, অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সীমানা ভেদ করে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের মূল কেন্দ্রের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন-সেটা জোর দিয়েই বলা যায়। গবেষকরা এমনও মন্তব্য করেছেন - '' হয়ত চৈতন্য-ধর্ম, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদের মধ্য দিয়া ক্রমপ্রতিষ্ঠিত পৌরাণিক আদর্শ ও তন্ত্রশাস্ত্রের মাধ্যমে শক্তিপূজার বিশুদ্ধতর ভাবদীক্ষা প্রাচীনতর লৌকিক ধর্মগুলির বেগবান প্রবাহকে প্রতিরুদ্ধ না করিলে মনসা ও অনার্যচিন্তাপ্রসূতা উগ্রচণ্ডী দেবীই আজ পর্যন্ত আমাদের প্রধান দেবতারূপে পূজিতা হইতে থাকিতেন।''[১৭] যা হোক, মনসামঙ্গলের আদি রচয়িতা কানা হরিদত্তের আবির্ভাবকাল খুব সম্ভবত খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে অথবা চতুর্দশ শতকের প্রারম্ভভাগে।[১৮] পক্ষান্তরে, চণ্ডীমঙ্গলের আদি রচয়িতা মাণিক দত্তের আর্বিভাব-কাল সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত না হওয়ায় আনুমানিকভাবে বলা যায়-খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতকের পূর্বে এই কাব্য রচিত হয়নি।[১৯] আচার্য সুকুমার সেন মনে করেন - চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল সুস্পষ্ট অবয়ব পাবার অনেক পূর্বেই মনসার কাহিনী

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্ফুটিত হয়েছিল। তাঁর মতে, '' ধর্মমঙ্গলের ঐতিহ্য আর মনসামঙ্গলের ঐতিহ্য এক মূল হইতেই উদ্ভুত।''[২০] তিনি তাঁর মতের সমর্থনে নাথ পন্থীদের প্রাচীন ছড়ার উল্লেখ করেছেন -

''মাতা হমারী মনসা বোলিয়ে
পিতা বোলিয়ে নিরঞ্জন রিাকার।

- আমাদের মাতাকে বলা হয় মনসা, নিরাকার নিরঞ্জনকে পিতা বলা হয়।''[২১] উল্লেখ্য, ধর্মমঙ্গলকাব্যে ধর্মঠাকুরের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তাতে তাঁকে অনেকটা বৌদ্ধ প্রভাবজাত বলে মনে করা যায়। সুকুমার সেনের পান্ডিত্যপূর্ণ অভিমত হচ্ছে - '' ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের বর্ণনার সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিপত্তন কাহিনীর যোগাযোগ আছে। প্রাচীন মনসামঙ্গল ও চন্ডীমঙ্গল কাব্যে এই ঋগ্বেদীয় সৃষ্টি পত্তন কাহিনীর ভাবই অনুবৃত্ত।''[২২] অস্পৃশ্য , নীচ জাতীয়রাই সকল দেবতার আদি পূজক। মনসাদেবীর আদি পূজক হিসেবে দেখা যায় কৈবর্ত ও চন্ডালদের , চন্ডীদেবীর আদি পূজক হিসেবে লক্ষ্য করা যায় কিরাত সম্প্রদায়কে এবং ধর্মঠাকুরের আদি পূজক হিসেবে ডোমদের নাম উল্লেখযোগ্য। রামায়ণের হনুমান চরিত্রটির উল্লেখ তিনটি কাব্যেই দেখতে পাওয়া যায়। আন্চলিক কাব্যধারা ধর্মমঙ্গলের কাহিনী মনসামঙ্গল এবং চন্ডীমঙ্গলের তুলনায় স্বতন্ত্র। এ কাব্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ, বীরত্ব প্রভৃতি বিশেষ স্হান করে নিয়েছে। অবশ্য যুদ্ধের বর্ণনা মনসামঙ্গল এবং চন্ডীমঙ্গলেও আছে। কিন্তু সেসব স্হানের যুদ্ধ অনেকটা ঘরোয়া পর্যায়ের কিংবা দেবতাদের অলৌকিক শক্তি প্রকাশের প্রেক্ষাপটে কল্পিত। আর ধর্মমঙ্গলের যুদ্ধ মূলতঃ রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত এবং অনেকটা দৈব প্রভাবমুক্ত। মনসামঙ্গল এবং চন্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবতারা প্রধান ভুমিকা গ্রহণ করলেও '' ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেবতা কোনদিনই মুখ্য ছিলনা ।''[২৩] মনসামঙ্গল কাব্যধারার মধ্যে কাহিনীগত ঐক্য গড়ে উঠেছিল সারা বঙ্গদেশে, পক্ষান্তরে চন্ডীমঙ্গলের ক্ষেত্রে তা হয়নি। ধর্মমঙ্গল রাঢ় এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। চন্ডীমঙ্গল বঙ্গদেশের সীমানার বাইরে যাওয়া তো দূরের কথা, দেশের সকল অন্চলেই প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। একমাত্র মনসামঙ্গলই এ কাজটি করতে সক্ষম হয়েছে। বলা যায় - '' যে সকল উপকরণের উপর ভিত্তি করিয়া সমগ্র বাংলায় একটি অখন্ড লোকসংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, মনসা-মঙ্গল তাহাদেরই অন্যতম।''[২৪] পূর্ববঙ্গ, রাঢ় , উত্তরবঙ্গ প্রভৃতি এলাকার শত শত কবি মনসামঙ্গল কাব্যধারায় অবগাহন করেন। সমগ্র মঙ্গলকাব্য সাহিত্যে এ এক পরম বিস্ময় ! স্বাভাবিক ভাবে মনে হতে পারে নদী-মাতৃক বঙ্গদেশের সর্পসঙ্কুল পরিবেশের কারণে বাঙালী কবিরা ভয়ে-ভক্তিতে মনসার মাহাত্ম্য-কীর্তন করেছেন। কিন্তু আসল কারণ তার চেয়েও গভীরতর। মনসামঙ্গলের কাহিনীর বৈশিষ্ট্যই তাঁদেরকে স্বতঃপ্রবৃত্ত করেছে এ

Dhaka University Institutional Repository

পথে। চাঁদ সদাগরের সংসারের শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও চারিত্রিক দৃঢ়তা, সতী বেহুলার বেদনা-বিধুর রূপ বাঙালীর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশকে তীব্রভাবে আন্দোলিত করেছে। এর মাঝেই বাঙালী তাদের স্বতন্ত্র, নিজস্ব, একান্ত কাছের রামায়ণকে খুঁজে পেয়েছে। পরিপূর্ণ জীবনরসের দিশারী মনসামঙ্গল কাব্য বাংলার প্রকৃতির সাথে কতখানি গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় তা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে -

"মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল-বট -তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
দেখেছিল, বেহুলাও একদিন গাঙুরের জলে ভেলা নিয়ে -
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায় -
সোনালি ধানের পশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায় ,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল, - একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁট ফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।"[২৫]

মধ্যযুগের বিভিন্ন রকম সাহিত্য বিভিন্নভাবে চাঁদ সদাগর-বেহুলার কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে । মনসামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের উৎস খুঁজতে গিয়ে কোন কোন গবেষক দু'টি কারণকে চিহ্নিত করেছেন - "(১) গঠন ভঙ্গির সংহত ও সংঘাত - কেন্দ্রিক ঐক্য এবং (২) চরিত্র সৃষ্টির অভিনব ঐশ্বর্য।"[২৬] পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে - মনসামঙ্গলকাব্যের কাহিনী সমগ্র বঙ্গদেশের পাশাপাশি আসাম, বিহার ও উড়িষ্যায় অর্থাৎ প্রাচীন বৃহত্তর বঙ্গে বিস্তার লাভ করেছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই সুসংহত হয়ে উঠা কাহিনী (যা অন্য কোন মঙ্গলকাব্যে গড়ে উঠেনি) নিয়ে রচিত মনসামঙ্গল খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ছ'শ বছর ব্যাপী শত-সহস্র কবি-গায়েনের কল্যাণে ব্যাপক ভৌগলিক সীমার মধ্যে সদম্ভে পদচারণা করতে থাকে। মনসামঙ্গলের যে সমস্ত কবির নাম বর্তমানে দেখা যায়, কালের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া কবিদের সংখ্যার তুলনায় তা নিতান্তই অপর্যাপ্ত। কবিদের সংখ্যার তুলনায় প্রাপ্ত পুঁথি-কাব্যের পরিমান আরো কম। দীনেশচন্দ্র সেন[২৭] তাঁর বিখ্যাত ' বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে নিম্নোক্ত ৬২ জন মনসামঙ্গল কবির নামোল্লেখ করেছেন -

Dhaka University Institutional Repository

১। কাণাহরিদত্ত, ২। নারায়ণদেব, ৩। বিজয়গুপ্ত, ৪। রঘুনাথ,৪। যদুনাথ পন্ডিত, ৬। বলরাম দাস, ৭। জগন্নাথসেন, ৮। বংশীধর, ৯। দ্বিজবংশীদাস, ১০। বল্লভঘোষ, ১১। বিপ্রহৃদয়, ১২। গোবিন্দদাস, ১৩। গোপীচন্দ্র, ১৪। বিপ্রজানকীনাথ, ১৫। দ্বিজবলরাম, ১৬। কেতাকাদাস, ১৭। ক্ষেমানন্দ, ১৮। অনুপমচন্দ্র, ১৯। রাধাকৃষ্ণ, ২০। হরিদাস, ২১। কমলনয়ন, ২২। সীতাপতি, ২৩। রামনিধি, ২৪। কবিচন্দ্রপতি, ২৫। গোলোকচন্দ্র, ২৬। কবি কর্ণপূর, ২৭। জানকীনাথ দাস, ২৮। বর্দ্ধমান দাস, ২৯। ষষ্ঠীবর সেন, ৩০। গঙ্গাদাস সেন , ৩১। রামবিনোদ, ৩২। আদিত্যদাস, ৩৩। কমললোচন, ৩৪। কৃষ্ণানন্দ, ৩৫। পন্ডিত গঙ্গাদাস, ৩৬। গুণানন্দ সেন, ৩৭। জগদ্বল্লভ, ৩৮। বিপ্রজগন্নাথ, ৩৯। জগমোহন মিত্র, ৪০। জয়দেব দাস, ৪১। দ্বিজজয়রাম, ৪২। নন্দলাল, ৪৩। বাণেশ্বর, ৪৪। মধুসূদন দেব, ৪৫। বিপ্ররতি দেব, ৪৬। রতিদেব সেন, ৪৭। রামকান্ত, ৪৮। দ্বিজরসিকচন্দ্র, ৪৯। রাজা রাজ-সিংহ (সুসঙ্গ) , ৫০। রামচন্দ্র, ৫১। রামজীবন বিদ্যাভূষণ, ৫২। বিপ্ররামদাস, ৫৩। রামদাস সেন , ৫৪। দ্বিজ বনমালী, ৫৫। বনমালী দাস, ৫৬। বিপ্রদাস, ৫৭। বিশ্বেশ্বর, ৫৮। বিষ্ণুপাল, ৫৯। সুকবি দাস, ৬০। সুখদাস, ৬১। সুদাম দাস, ৬২। দ্বিজহরিরাম।

কেতকাদাস - ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল সম্পাদনাকোলে সম্পাদকের ভূমিকায় যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য[২৮] প্রায় দেড়শ'* মনসামঙ্গলের কবির নাম উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তিনি আশংকা প্রকাশ করেছেন বহু গায়েন-এর নামও এর মধ্যে থাকতে পারে। তাঁর নাম সমূহ সংগ্রহের উৎসগুলো হচ্ছে - ক) দীনেশচন্দ্র সেনের ' বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ' গ্রন্থ , (খ) মুদ্রিত বিভিন্ন মনসামঙ্গল গ্রন্থ , (গ) বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত প্রাচীন পুথিসমূহ, এবং (ঘ) মনসাতত্ত্ব ও মনসামঙ্গলের উপর লিখিত প্রবন্ধাদি। কবিদের বর্ণনানুক্রমিক নাম- সূচী নিম্নরূপ ঃ

১। অনন্ত পন্ডিত, ২। অনুপ চন্দ্র ভট্ট, ৩। আদিত্য দাস, ৪। আনন্দরাম চক্রবর্ত্তী, ৫। কবি কর্ণপুর, ৬। কবি চন্দ্র, ৭। কবি বল্লভ, ৮। কবি রত্নাকর, ৯। কমল - নয়ন, ১০। কমল নারায়ণ, ১১। কমল লোচন, ১২। কালারায়, ১৩। কালিদাস, ১৪। কালীচরণ সিদ্ধান্ত, ১৫। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬। কাশীনাথ দ্বিজ, ১৭। কাশীনাথ সেন, ১৮। কৃত্তিবাস পন্ডিত, ১৯। কৃপারাম দত্ত, ২০। কৃষ্ণচরণ, ২১। কৃষ্ণানন্দ, ২২। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, ২৩। কোটীশ্বর দাস, ২৪। ক্ষেমানন্দ, ২৫। গঙ্গাদাস পন্ডিত,

---

* সম্পাদক ১৪৭ জন মনসামঙ্গল-কবির কথা বললেও বাস্তবে ১৪৮ জন পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২৬। গঙ্গাদাস সেন, ২৭। গঙ্গাধর, ২৮। গঙ্গারাম দত্ত, ২৯। গুণাকর, ৩০। গুণানন্দ সেন, ৩১। গুপ্ত কবি, ৩২। গুরুদাস, ৩৩। গোপালচন্দ্র মজুমদার, ৩৪। গোপীকান্ত দ্বিজ, ৩৫। গোপীচন্দ্র দৈবজ্ঞ, ৩৬। গোলোক চন্দ্র, ৩৭। গোলোক নাথ, ৩৮। গোবিন্দদাস, ৩৯। গৌরকিশোর, ৪০। গৌরচন্দ্র দ্বিজ, ৪১। চন্দ্রধর গাঞান, ৪২। চন্দ্রপতি, ৪৩। চন্দ্রাবতী, ৪৪। চৈতন্যদাস, ৪৫। ছিরা বিনোদ, ৪৬। জগৎ জীবন, ৪৭। জগৎ বল্লভ, ৪৮। জগন্নাথ দাস, ৪৯। জগন্নাথ বিপ্র, ৫০। জগন্নাথ বৈদ্য (সেন), ৫১। জগমোহন মিত্র, ৫২। জয়দেব দাস, ৫৩। জয়রাম দ্বিজ, ৫৪। জানকীনাথ দাস, ৫৫। জানকীনাথ বিপ্র (দ্বিজ, পন্ডিত), ৫৬। জীবন মৈত্র, ৫৭। তন্ত্র-বিভুতি, ৫৮। তিনকড়ি বিশ্বাস, ৫৯। ত্রিলোচন দ্বিজ, ৬০। দামোদর দ্বিজ, ৬১। ধর্ম্মদাস মালী, ৬২। নন্দলাল, ৬৩। নারায়ণ দাস, ৬৪। নারায়ণ দেব, ৬৫। পদ্মাবতী, ৬৬। পুরুষোত্তম. ৬৭। পূর্ণচন্দ্র, ৬৮। বংশীদাস দ্বিজ, ৬৯। বংশীধন, ৭০। বংশীধর, ৭১। বংশীবদন, ৭২। বনমালী দাস, ৭৩। বনমালী দ্বিজ, ৭৪। বর্দ্ধমান দত্ত, ৭৫। বর্দ্ধমান দাস, ৭৬। বলরাম দাস, ৭৭। বলরাম দ্বিজ, ৭৮। বল্লভ দাস, ৭৯। বল্লভ ঘোষ, ৮০। বাণেশ্বর , ৮১। বিজয় গুপ্ত, ৮২। বিনোদরাম দাস (রায়), ৮৩। বিপ্রদাস পিপলাই , ৮৪। বিশ্বনাথ , ৮৫। বিশ্বম্ভর, ৮৬। বিশ্বেশ্বর, ৮৭। বিষ্ণুপাল, ৮৮। ভবানন্দ নীন, ৮৯। ভবানী, ৯০। ভানুদাস শুক্লবৈদ্য, ৯১। ভানুনারায়ণ দ্বিজ, ৯২। ভৈরবচন্দ্র, ৯৩। মধুসূদন দে, ৯৪। মনোহর দ্বিজ, ৯৫। মহেশ, ৯৬। মুক্তারাম নাগ, ৯৭। মুরারি দাস, ৯৮। মুরারি মিশ্র, ৯৯। মুরারীশ্বর , ১০০। যদুনাথ পন্ডিত, ১০১। যদুবর, ১০২। রঘুনাথ (দ্বিজ), ১০৩। রতিদেব বিপ্র, ১০৪। রতিদেব সেন (বৈদ্য) , ১০৫। রতিনাথ, ১০৬। রত্নেশ্বর দ্বিজ, ১০৭। রবিদাস বিপ্র, ১০৮। রমাকান্ত, ১০৯। রসিকচন্দ্র দ্বিজ, ১১০। রসিকানন্দ, ১১১। রাজকৃষ্ণ, ১১২। রাজসিংহ , ১১৩। রাধাকৃষ্ণ, ১১৪। রাধানাথ, ১১৫। রাধানাথ চৌধুরী, ১১৬। রাবণ পন্ডিত, ১১৭। রাম ঘোষ, ১১৮। রামচন্দ্র, ১১৯। রামজীবন বিদ্যাভূষণ, ১২০। রামদাস বিপ্র, ১২১। রামদাস সেন (বৈদ্য), ১২২। রামনাথ, ১২৩। রামনিধি, ১২৪। রামবিনোদ, ১২৫। রামেশ্বর নন্দী, ১২৬। রায় তিলক, ১২৭। রায় বিনোদ, ১২৮। রূপনারায়ণ, ১২৯। ষষ্ঠীবর দত্ত, ১৩০। ষষ্ঠীবর সেন, ১৩১। শশিভূষণ দেব, ১৩২। শিবচরণ দাস, ১৩৩। শিবরাম, ১৩৪। শিবানন্দ, ১৩৫। শ্যামগোবিন্দরাম, ১৩৬। সীতাপতি দেব, ১৩৭। সীতারাম দাস, ১৩৮। সুকবি দাস, ১৩৯। সুখদাস, ১৪০। সুদাম দাস, ১৪১। হরগোবিন্দ শর্ম্মা, ১৪২। হরি দত্ত, ১৪৩। হরিদাস দেব, ১৪৪। হরিবল্লভ, ১৪৫। হরিরাম দ্বিজ, ১৪৬। হরিহর দত্ত, ১৪৭। হৃদয় ব্রাহ্মণ, ১৪৮ হৃদয়ানন্দ দত্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বেই উক্ত হয়েছে ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ এমনকি ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়কাল ব্যাপী শত শত কবি মনসামঙ্গল কাব্য ধারায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের কাব্যের মূল সুরের উৎস এক হলেও বিভিন্ন জনের কাব্যের প্রকাশভঙ্গিতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকা স্বাভাবিক এবং তা আছেও। কাহিনীর দিক দিয়ে পর্যালোচনা করলে মনসামঙ্গল কাব্য সমূহের মধ্যে মোটামুটি তিনটি ধারা পরিলক্ষিত হয় ঃ

১। রাঢ়ের ধারা - এ ধারার কবিদের মধ্যে আছেন বিপ্রদাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বিষ্ণুপাল, সীতারাম দাস, রসিক মিশ্র, বাণেশ্বর রায়, দ্বারিকা দাস প্রমুখ।

২। পূর্ববঙ্গের ধারা - বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, দ্বিজ বংশীদাস, শ্রীরায় বিনোদ, গঙ্গাদাস সেন প্রমুখ হচ্ছেন এ ধারার কবি। এ ধারার কাব্য সমূহ প্রায়শঃই 'পদ্মাপুরাণ ' নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

৩। উত্তরবঙ্গ ও কামরূপের ধারা - তন্ত্র-বিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবনকৃষ্ণ মৈত্র, নারায়ণ দেব , মনকর, দুর্গাবর প্রমুখ এ ধারার কবি।

উল্লেখ্য, সুকবি নারায়ণ দেবকে নিয়ে পূর্ববঙ্গের ধারা এবং উত্তরবঙ্গ ও কামরূপের ধারা- এই উভয় ধারার মধ্যেই টানাটানি থাকায় তাঁর নাম উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হল। কাহিনীর দিক থেকে রাঢ়ের ধারা এবং পূর্ববঙ্গের ধারা মোটামুটি এক হলেও উত্তরবঙ্গের ধারাটি একটু ভিন্ন ধরনের । এতে ধর্মমঙ্গলের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। একথা স্বীকার্য, পুরাণই মঙ্গলকাব্যের উৎস, লৌকিক গাত্রাবরণে আবৃত মঙ্গল দেব-দেবীদের পৌরাণিক দেব-দেবীরূপে ফুটিয়ে তোলার জন্যে মঙ্গল কবিদের আকর্ষণ অস্বাভাবিক নয়। এজন্যেই মঙ্গলকাব্যকে তাঁরা সংস্কৃত পুরাণের আদর্শে গড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অবশ্য, মঙ্গল-কবিদের সযত্ন প্রয়াস সত্ত্বেও মঙ্গলকাব্যসমূহ পুরাণ হতে পারেনি। যেমন, মনসামঙ্গলের ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ্য করি - '' পৌরাণিক মনসা ও মঙ্গলকাব্যের মনসার বংশপরিচয় এক হইলেও উহাদের প্রকৃতি ও ক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ কোন মিল দেখা যায় না। মঙ্গলকাব্যে পুরাণের অনুসৃতি নাই, আছে লোক-জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা- নির্ভর ও লোক- আখ্যায়িকা-ভিত্তিক নব পুরাণ-মহিমার সৃষ্টি।''[২৯] আলোচ্য ' মনসামঙ্গল' কাব্য কত যে বিচিত্র ঐতিহ্যের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে তা বলে শেষ করা যায় না। প্রচলিত মনসামঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে একটি পুরাতন স্বতন্ত্র কাহিনীর ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়, যা ক্রম-বিবর্তনের ধারায় বর্তমান কাহিনীর সাথে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। স্মর্তব্য, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ নিরপেক্ষ অত্র স্বাধীন লৌকিক কাহিনীটির মূল উৎস মনসামঙ্গলেই নিহিত রয়েছে। যা হোক, প্রথমে

Dhaka University Institutional Repository

বহুল আলোচিত মনসামঙ্গলের মূল কাহিনী (বেহুলা -লখিন্দরের কাহিনী)-টি বর্ণনা করার পূর্বে এর দেব খন্ড তথা পূর্বভাগ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হচ্ছে -

মনসামঙ্গল কাহিনীর পূর্বভাগে প্রথমেই শিবের মানস কন্যা মনসার জন্ম-প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। কমল বনে পিতা-পুত্রীর পরিচয়ের পর শিব কন্যাকে পত্নী চন্ডীর ভয়ে লুকিয়ে ঘরে (কৈলাসে) নিয়ে যান। কিন্তু, শেষরক্ষা হয়না। মনসার উপস্থিতি বুঝতে পেরে চন্ডী তাঁর সাথে কলহে লিপ্ত হন। এই কলহে চন্ডীর আঘাতে মনসার একটি চোখ কানা হয়ে যায়। তখন মনসা প্রচন্ডভাবে রেগে গিয়ে বিষদৃষ্টি প্রয়োগ করে চন্ডীকে অচৈতন্য করে ফেলেন। অবশ্য মনসার কৃপায় (বিশেষ করে শিবের অনুরোধের প্রেক্ষিতে) চন্ডী পুনরায় জ্ঞান ফিরে পান। এরপর রয়েছে চন্ডীর প্ররোচনায় শিব কর্তৃক মনসাকে নির্বাসন প্রদান। সমুদ্র-মন্থন কালে বিষপানে শিব মৃতপ্রায় হলে কন্যা মনসাই তাঁকে সারিয়ে তোলেন। অতঃপর দেবতারা সকলে মিলে জরৎকারু মুনির সাথে মনসার বিবাহ দেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই মনসা স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে সহচরী নেতকে নিয়ে বিষণ্ন মনে দিনাতিপাত করতে থাকেন । এরপর মনসা মর্ত্যলোকে তাঁর নিজের পূজা প্রচারে ব্রতী হন। এখানেই মনসামঙ্গলের দেব খন্ডের সমাপ্তির পর নর খন্ডের শুরু হল। অর্থাৎ কাহিনীর মূল অংশ বেহুলা-লখিন্দর তথা চাঁদ সদাগরের কাহিনীর শুভারম্ভ এখান থেকে ঃ

চম্পক নগরে চাঁদ সদাগর নামে এক বণিক ছিলেন ; তিনি পরম শৈব- প্রতিদিন শিবপূজা না করে অন্নজল স্পর্শ করেন না। শিব নাম জপকারী চাঁদ সদাগর চরম বিপদেও কিংবা ভুলেও শিব ভিন্ন অন্য কোন দেবতার নাম মুখে আনেন না। তাঁর পত্নীর নাম সনকা, তিনি স্বামীকে লুকিয়ে সর্পদেবী মনসার পূজা করেন। একদিন জানতে পেরে চাঁদ সদাগর তাঁর স্ত্রীর মনসাপূজার ঘট পায়ের আঘাতে ভেঙ্গে দিলেন। মনসা চাঁদের এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। তিনি চাঁদের স্বপ্নসাধের বাগান-বাড়ী একদিন ধ্বংস করে ফেললেন। কিন্তু 'মহাজ্ঞান'-এর অধিকারী চাঁদ সদাগর অনায়াসেই ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই বাগান -বাড়ী কে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনলেন। আবার, মনসার প্রত্যক্ষ প্ররোচণায় চাঁদের আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবদেরকে সাপে দংশন করতে লাগল। কিন্তু চাঁদের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং অব্যর্থ সর্পবৈদ্য শঙ্কর গারুড়ী সর্পদংশনে মৃতদেরকে চোখের নিমিষেই পুনর্জীবিত করে তুলতে লাগলেন। মনসার প্রতিশোধ গ্রহণের প্রাথমিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় মনসা দুশ্চিন্তায় পড়লেও হাল ছাড়লেন না।

Dhaka University Institutional Repository

মনসা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, যদি শঙ্কর গারুড়ী জীবিত থাকে তাহলে তাঁর পক্ষে প্রতিশোধ নেওয়া একরকম অসম্ভব হয়ে যাবে। তাই তিনি এখন শঙ্কর গারুড়ীর প্রাণনাশে যত্নবান হলেন। শঙ্কর নেতার শিষ্য - নেতার বরে তার দেহ অজর, অমর ; অবশ্য তার মৃত্যুর একটা উপায় আছে, সেটা সে ব্যতীত অন্য কেহ জানে না। মনসা কৌশলে শঙ্কর গারুড়ীর স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামীর মৃত্যুর উপায় জেনে নিয়ে সেই উপায় অবলম্বন পূর্বক তাকে (শঙ্করকে) মেরে ফেললেন। এতে চাঁদের দক্ষিণ হাত অর্থাৎ শক্তির উৎস বহুলাংশে নষ্ট হয়ে গেল। ওদিকে ছলনার আশ্রয় নিয়ে মনসা চাঁদের 'মহাজ্ঞান' - ও হরণ করলেন। এখন আর চাঁদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের কোন বাধা রইল না। মনসা প্রথমেই চাঁদের ছয় পুত্রকে হত্যা করলেন।

মনসা কৈলাসে গিয়ে পিতা শিবকে বললেন, '' মর্ত্যলোকে আমার পূজা করিতে চাই কি করিলে আমার পূজার প্রচার হইবে, তাহা আমাকে বলিয়া দাও।'' শিব তাঁর মানসকন্যা মনসাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন - '' চাঁদ সদাগর যদি তোমার পূজা করে, তবেই তাহা হইবে, নতুবা হইবে না।'' মনসা চাঁদের অপরিহার্যতা দেখে তার সম্মুখে আবির্ভূতা হয়ে বললেন, '' আমার পূজা কর, পুত্র ফিরিয়া পাইবে, মহাজ্ঞান ফিরিয়া পাইবে।'' এ কথার প্রত্যুত্তরে ক্রোধান্ধ চাঁদ হেঁতালের লাঠি নিয়ে মনসাকে তাড়া করলেন, লাঠির এক ঘায়ে মনসার কাঁকালি ভেঙ্গে গেল। মনসা পালিয়ে রক্ষা পেলেন।

স্বামীর দুর্মতি দেখে স্ত্রী সনকা চোখের জলে বুক ভাসিয়ে চাঁদের পা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, '' দেবতার সঙ্গে বাদ করিও না, মনসার পূজা কর, আমার সোনার চাঁদেরা ফিরিয়া আসুক।'' চাঁদ তখন স্ত্রীকে বিভিন্ন কথার মাধ্যমে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় করলেন।

অন্ত্যজ দু'ভাই ঝালুমালু নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে জালের মধ্যে মনসার ঘট পেল, সেই ঘট তারা গৃহে এনে স্থাপন করত পূজা করতে লাগল। সনকা গোপনে ঝালুমালুর বাড়ী এসে মনসার পূজা দিলেন। মনসা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে পুত্রবর দিলেন, কিন্তু শর্ত জুড়ে দিলেন-চাঁদ সদাগর যদি তাঁর পূজা না করেন, তবে বিয়ের রাতে পুত্র সাপের কামড়ে মারা যাবে। সনকা ভাবলেন, বিয়ে না করালেই হবে। পুনরায় পুত্রের মুখ দর্শনাভিলাষের আনন্দ নিয়ে তিনি বাড়ী ফিরে এলেন।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে চাঁদ সদাগর চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজিয়ে বাণিজ্য যাত্রার আয়োজন করলেন। যাত্রাকালে চাঁদ যথারীতি শিব পূজায় মনোনিবেশ করলেন মনসা সে সময় পূজাস্থানে এসে পুনরায় চাঁদকে মিনতি করে বলতে লাগলেন, '' আমার জন্যও একবার ফুলজল দাও, ছয় পুত্র এখনই ফিরিয়া পাইবে।'' চাঁদ এবারও মনসাকে অপমানিতা করে তাড়িয়ে দিলেন।

চৌদ্দ ডিঙ্গা সহ চাঁদ পাটনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। নিজের স্বল্পমূল্যের কিংবা অপাংক্তেয় দ্রব্য সামগ্রীর বিনিময়ে বহু মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার দিয়ে চৌদ্দ ডিঙ্গা পরিপূর্ণ করত এবার চাঁদ সদাগর দেশের দিকে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে মনসা আবারও আবির্ভূতা হলেন এবং চাঁদকে উদ্দেশ্য করে বললেন, '' আমার পূজা কর, না করিলে অনুতাপ করিতে হইবে।'' চাঁদ মনসার কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন, ''যে হাতে শিবপূজা করি, সেই হাতে চেঙমুড়ী কানীর পূজা করিব ? '' বার বার অপমানিতা, প্রত্যাখাতা মনসার জিঘাংসাবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। চাঁদকে চরম শিক্ষা দেওয়ার জন্যে তিনি কৃতসংকল্প হলেন। মনসার আদেশে মধ্য-সমুদ্রে অসময়ে বান ডাকল। দেখতে দেখতে সমুদ্রের জল উত্তাল হওয়ার পাশাপাশি তুমুল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল । চাঁদের ধন-সম্পদপূর্ণ চৌদ্দ ডিঙ্গা সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের আঘাতে ক্ষণকালের মধ্যেই অতলে ডুবে গেল। সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে চাঁদ কলার মোচার ন্যায় ভাসতে লাগলেন। চাঁদ ডুবে মরলে মনসার পূজার প্রচার হবে না - এই চিন্তা করে মনসা চাঁদকে কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখলেন। বিদেশ, বিভূঁয়ে সুদীর্ঘ বার বছর নানা দুঃখ কষ্ট সহ্য করে অবশেষে ভিক্ষুকের বেশে চাঁদ নিজের দেশে ফিরে এলেন।

বাণিজ্য-যাত্রার পর জন্ম নেওয়া চাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দর তখন তরুণ কিশোর। গৃহে ফিরে চাঁদ সদাগর পুত্রের মুখ দেখে দুঃখরাশি বিস্মৃত হয়ে নতুন আশায় বুক বাঁধলেন। তিনি কালবিলম্ব না করে উজানিনগরের সায়বেনের কন্যা বেহুলার সাথে পুত্রের বিবাহ ঠিক করে ফেললেন চম্পকনগরে পুনরায় প্রাণের বন্যা বইয়ে দিতে। বিয়ের রাতে সর্পদংশনে লখিন্দরের মৃত্যুর আশংকার কথা চিন্তা করে চাঁদ বর-বধূর বাসর যাপনের জন্যে এক নিশ্ছিদ্র লৌহ - বাসর নির্মাণ করালেন। কিন্তু নির্মম নিয়তির আগ্রাসন রোধ করা গেল না এত করেও , লৌহ - বাসরের মধ্যেই সর্পদংশনে লখিন্দর প্রাণ বিসর্জন দিল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন প্রথা অনুসারে সর্পদংশনে মৃত লখিন্দরের দেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। বেহুলা বলল, সে মৃত স্বামীর অনুগামিনী হবে, স্বর্গের দেবতাদের কাছ থেকে তার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনবে। আত্মীয়স্বজনের নিষেধ - অনুনয় অগ্রাহ্য করে বেহুলা মৃত স্বামীর দেহ কোলে নিয়ে গাঙ্গুড়ের স্রোতে ভেলায় ভেসে চলল। নদীর বিভিন্ন ঘাটে নানাবিধ বিপদ দেখা দিতে লাগল। কিন্তু অসম্ভব সাহস এবং তীক্ষ্ণ উপস্থিতবুদ্ধির দ্বারা বেহুলা সকল বিপদ কাটিয়ে তার লক্ষ্যপানে ছুটে চলল। এরপর ভেলা এসে নেতার ঘাটে ঠেকল। নেতা স্বর্গের ধোপানী - দেবতাদের কাপড় কাচেন। বেহুলা এসে নেতার পায়ে লুটিয়ে পড়ল এবং বলল, '' দেবতাদিগকে বলিয়া আমার স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া দাও।'' তখন নেতা বেহুলাকে বলতে লাগলেন, '' নৃত্য দেখাইয়া দেবতাদিগকে যদি সন্তুষ্ট করিতে পার, তবে তাঁহারা তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন ; আমার সঙ্গে চল, আমি সকল ব্যবস্থা করিয়া দিব।'' বেহুলা ছয় মাসে অবশিষ্ট থাকা স্বামীর অস্থি কয়খানা আঁচলে বেঁধে নেতার সাথে দেবসভায় গেল। সেখানে বেহুলা সমবেত দেবতাদের সামনে তার নাচ দেখাল। বেহুলার নাচে সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা তাকে বর দিতে চাইলে সে স্বামী লখিন্দরের প্রাণভিক্ষা চাইল। তখন শিব মনসাকে লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে বললেন। মনসা বললেন, '' দিতে পারি, কিন্তু চাঁদ আমার পূজা করিবে এই শর্তে।'' একথা শুনে বেহুলা বলল, ''তাহাই হইবে। আমার ছয় ভাসুর, স্বামী, শ্বশুরের চৌদ্দ ডিঙ্গা সব ফিরাইয়া দাও, আমি তাঁহাকে দিয়া তোমার পূজা করাইব।'' এরপর মনসা সবই ফিরিয়ে দিলেন।

চৌদ্দ ডিঙ্গা, ছয় ভাসুর ও স্বামী নিয়ে বেহুলা দেশের অভিমুখে রওয়ানা হল। চাঁদের সাত পুত্রসহ চৌদ্দ ডিঙ্গা গাঙ্গুড়ের ঘাটে ভিড়ল। সংবাদ শুনে চাঁদ সদাগর উন্মাদের ন্যায় ছুটে এলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে শুনতে পেলেন, তাঁকে মনসার পূজা করতে হবে, সেই মুহূর্তে কারো প্রতি দৃষ্টিপাত না করে পুনরায় ঘরে ফিরে গেলেন। বেহুলার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সে শ্বশুরের পায়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল এবং শান্ত অথচ দৃঢ় ভাবে বলল, '' আমার দিকে একবার তাকাও।'' চাঁদ সদাগর পুত্রবধূ বেহুলার মুখের দিকে তাকাতে পারছেন না। অভ্রভেদী শালতরু বুঝি একটু স্নেহকোমল দক্ষিণা হাওয়ার স্পর্শেই ধরাশায়ী হয় ! চাঁদের জীবনে এত বড়ো দ্বন্দ্ব ইতোপূর্বে আর কোনদিন দেখা দেয়নি। বেহুলা বলছে, ''তুমি বাম হাতে মনসাকে একটি ফুল দাও, তাহা হইলেই মনসা খুশি হইবে।'' বেহুলার আবেগপূর্ণ আহবান শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় চাঁদ সদাগর বলছেন, '' আমি মুখ ফিরাইয়া থাকিব, দেখিব না কাহাকে ফুল দিলাম।'' বেহুলা তখন তাঁকে আশ্বস্ত করে বলল, '' তাহাতেই হইবে।'' অবশেষে সকল দ্বিধা - দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে চাঁদ সদাগর মুখ ফিরিয়ে বাম হাতে মনসার উদ্দেশ্যে একটি ফুল ছুঁড়ে দিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

এতে তাঁর প্রতিজ্ঞাও রক্ষা পেল - তিনি যে হাতে শিবপূজা করেন, মনসাকে পূজা করে সেই হাত কলঙ্কিত করলেন না। কিন্তু মনসা চাঁদের এই অবজ্ঞামিশ্রিত পূজাতেই খুশি হলেন। মর্ত্যে তাঁর পূজার প্রচার হল। ছয় পুত্র , ধনজন নিয়ে চাঁদের সংসার ভরে উঠলেও লখিন্দর - বেহুলার গৃহ সংসারে বাস করা হল না- তাঁরা শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

মনসামঙ্গলের কাহিনীর এখানেই সমাপ্তি । মনসামঙ্গল কাব্যশাখার প্রত্যেক কবিই এই কাহিনী-সূত্রকে অনুসরণ করে তাঁদের কাব্য রচনা করেছেন। অবশ্য মূল কাহিনীসূত্র অব্যাহত রেখেও প্রায় প্রত্যেক কবিই নানা পরিবর্তন - পরিবর্ধনের মাধ্যমে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখেছেন। পূর্বেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, মনসামঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে দু'টি স্বতন্ত্র লৌকিক কাহিনীর ধারার সম্মিলন ঘটেছে - ''একটি শঙ্কর গারুড়ী-নেতার কাহিনী ও অপরটি চাঁদ সদাগর-বেহুলার কাহিনী। প্রথম কাহিনীটি প্রাচীনতর এবং ইহার সঙ্গেই আসিয়া পরবর্তী কালে চাঁদ সদাগর-বেহুলার কাহিনীটি যুক্ত হইয়াছে।''৩০ একটি স্বতন্ত্র কাব্যের বিষয়বস্তুর অধিকারী 'শঙ্কর গারুড়ী-নেতার কাহিনী' -র মধ্যে যে লৌকিক দেবচরিত্রের আভাস পাওয়া যায়। তিনি হচ্ছেন - নেতা। শঙ্কর গারুড়ী নেতার শিষ্য এবং তাঁরই বরে (স্বতর্ব্য, মনসার বরে নয়) শঙ্করের দেহ অজর ও অমর। এদিকে , মনসামঙ্গল কাব্যের সর্বত্র নেতাকে রজক - কুমারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ; অবশ্য স্বর্গের দেবতাদের ধোপানী। বুঝাই যাচ্ছে, তাঁর আভিজাত্য বৃদ্ধি করার এক সযত্ন প্রয়াস রক্ষিত হয়েছে এতে। 'মনসার সহচরী' রূপে পরিচিতা রজককুমারী নেতা সম্ভবত '' কোন রজকের কন্যা বিষনাশকারী কতকগুলি প্রক্রিয়ায় জ্ঞান লাভ করিয়া কালক্রমে সাধারণ জনগনের মধ্যে দেবীত্বে উন্নীত হইয়া গিয়াছিল। স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা মনসা হইতে প্রাচীনতর ; তাহা না হইলে মনসাচরিত্রের সর্বব্যাপক প্রতিষ্ঠার উপর এই কাহিনীতে তাহার কোন ভাবেই স্থান পাওয়া সম্ভব ছিল না।''৩১ অর্থাৎ, বলা যায়-চাঁদ সদাগর-বেহুলার কাহিনী প্রচলিত হওয়ার পর মনসার সহচরীর পদপ্রাপ্তির মাধ্যমে নেতা মনসামঙ্গল কাব্যে সীমিত পরিসরে হলেও অবস্থান করছেন।

বাংলার মনসামঙ্গলের কবিরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব সীমাবদ্ধ ভৌগলিক জ্ঞানের আলোকে অত্র কাহিনীর ঘটনাস্থান সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এরই ফলশ্রুতিতে বাংলা, বিহার ও আসামের বহু জায়গার অধিবাসীরাই চাঁদ সদাগরের নিবাস-স্থান কিংবা বেহুলার বাসর-ঘরের স্থান - এর দাবীদার হিসেবে আত্ম প্রকাশ করতে থাকে। বলা বাহুল্য, এদের কারো দাবীর পক্ষেই কোন তথ্যভিত্তিক কিংবা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ

Dhaka University Institutional Repository

নেই, যদিও মনসা এবং চাঁদ সদাগরের কাহিনীটি বাংলার পাশাপাশি সেসব অন্যত্রও ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। পূর্বেই বলা হয়েছে-মনসামঙ্গলের কাহিনীটি একটি স্বাধীন লৌকিক কাহিনী ; রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণে এর উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে না, মনসামঙ্গলই এর মূল উৎস। মনসামঙ্গল কাব্যাকারে লিখিত হওয়ার অনেককাল পূর্ব থেকেই মনসার এই লৌকিক কাহিনীটি সমাজে প্রচলিত ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। সম্ভবতঃ মনসামঙ্গলের সংক্ষিপ্ততম মূল কাহিনীটি ছড়ার আকারে লোকের মুখে মুখে ফিরত। এরপর খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ - চতুর্দশ শতকের দিকে '' কোনও কোনও শক্তিশালী কবির নিপুণ হস্তে পড়িয়া তাহা কাব্য-কাহিনীবদ্ধ হইয়াছে। তারপর ক্রমে লৌকিক কাহিনীর সংক্ষিপ্ততম অংশটির মধ্যে প্রথমত নেতা ধোপানী, শঙ্কর গারুড়ী ও পরে মহাভারতের নাগ-কাহিনীও আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এই ভাবেই মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যখানি এক জটিল রূপ এবং বিপুলায়তন লাভ করিয়াছে।''[৩২] অবশ্য , চরিত্রসৃষ্টি এবং কাব্যগুণে মনসামঙ্গল মধ্যযুগের সাহিত্যে অন্যতম প্রধান স্থানের অধিকারী।

সর্বজনসম্মত না হলেও মোটামুটি স্বীকৃত মত হচ্ছে - মনসা এবং চাঁদ সদাগরের কাহিনীটি বিহার থেকেই বাংলাদেশে এসেছে, বাংলাদেশে আসার পর ইহা এখানকার স্থানীয়রূপ পরিগ্রহ করেছে। কাহিনীটির যে উত্তরবঙ্গের পথে আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং পূর্ববঙ্গের পথে আসামের সুরমা উপত্যকায় প্রবেশ ঘটেছিল, তাও অনুমান করা কষ্টকর নয়। বিহারে মনসামঙ্গলের লৌকিক কাহিনীটি নিজস্ব পূর্ণতা এবং সংযম রক্ষা করেই প্রচলিত আছে। একেই কাহিনীর মূল ধারা মনে করার বিশেষ কারণ হচ্ছে- সেখানকার ধর্মীয় অবস্থার অনুকূল না হওয়ার জন্যেই হয়ত এতে অবান্তর মহাভারতীয় ও পৌরাণিক আখ্যানসমূহ এসে যুক্ত হতে পারেনি। মনসামঙ্গল কাব্য বাংলাদেশে এসেই অধিকতর কল্পনাশক্তিধারী বাঙালী কবিদের হাতে পড়ে পত্রে - পুষ্পে সুশোভিত-পল্লবিত হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ থেকে আসামে গিয়ে মনসামঙ্গল সেখানকার স্থানীয় রূপ লাভ করেছে। বাংলার প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতকে উড়িষ্যাতেও যে বাঙালী সংস্কৃতির ঢেউ লেগেছিল, তারই রেশ ধরে সপ্তদশ শতকে উড়িষ্যার প্রখ্যাত কবি দ্বারিকাদাসকে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি মনসামঙ্গল রচনাতেও ব্রতী হতে দেখা যায়। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, মনসামঙ্গলের কাহিনী উড়িষ্যাতেও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

কোন কোন গবেষক মনে করেন যে, চাঁদ সদাগর দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী ছিলেন বলে সেখান থেকেই চাঁদ সদাগর-বেহুলার কাহিনী বাংলাদেশে আসে। তাদের এই মতবাদের সপক্ষে যুক্তি সমূহ হচ্ছে - (১) বাংলা মনসামঙ্গলের কাহিনীটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করলে এর সঙ্গে দক্ষিণ সমুদ্রের নিবিড় যোগের বিষয়টা ধরা পড়ে, ; (২) তেলেগু ভাষায় সিজ-মনসা গাছের নাম হচ্ছে চেংমুড়। সিজ-মনসা গাছের তলাতেই দেবী মনসার পূজা হয়ে থাকে। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগর একাধিকবার মনসাকে তাচ্ছিল্য বা ব্যঙ্গার্থে ' চেংমুড়ী ' বলেছেন। বাংলা ভাষায় চেংমুড়ী শব্দের কোন অর্থ নেই। সে হিসেবে অনুমান করা হয়, তেলেগু ভাষা থেকে চেংমুড়ী কথাটি যেমন বাংলা ভাষায় এসেছে, তদ্রূপ মনসামঙ্গলের কাহিনীটিও দাক্ষিণাত্য থেকে বঙ্গদেশে এসেছে। পক্ষান্তরে, এই মতের বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি[৩৩] হচ্ছে-বাংলা ভাষায় বহু দ্রাবিড় শব্দ চালু রয়েছে ; সুতরাং বিক্ষিপ্ত দু'একটি শব্দ মিলে যাওয়ার সাথে সমগ্র কাহিনীর মিল বুঝায় না। বিশেষ করে বাংলা মনসামঙ্গলের কাহিনীটি যদি দাক্ষিণাত্যেই সর্ব প্রথম উদ্ভূত হয়ে থাকত তাহলে সেখানকার বিচিত্র এবং সমৃদ্ধ লোক সাহিত্যসংগ্রহের কোথাও না কোথাও অবশ্যই চাঁদ সদাগর-বেহুলার কাহিনীর উল্লেখ থাকত। কিন্তু তা নেই কেন ? তা হলে দেখা যাচ্ছে-অত্র কাহিনীটি দাক্ষিণাত্যের তুলনায় বিহার থেকেই বাংলাদেশে আসার প্রেক্ষাপট অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

আবার, অনেক গবেষক মনসামঙ্গল কাহিনীটির উদ্ভবের মূল হিসেবে রাঢ়ের কথা উল্লেখ করেছেন এভাবে - '' মনসামঙ্গলের কাহিনীটি বীরভূম জেলার কোন অঞ্চলে একদিন বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল এবং সেখান হইতেই ক্রমে পূর্ববঙ্গে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এমন অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না[৩৪] স্যতর্ব্য , সমগ্র বঙ্গের মধ্যে রাঢ় - ভূমির অন্তর্গত বর্তমান বীরভূম জেলায় অদ্যাবধিও মনসা পূজার সর্বাধিক প্রচলন রয়েছে। বিহারে প্রচলিত মনসা - কাহিনীতে মনসা পাঁচ ভগিনীর অন্যতম, বাকী চার ভগিনী সর্বক্ষণ তাঁর সহচরী। বীরভূম জেলাতেও বিহারের ন্যায় মনসা - সম্পর্কিত ধারণা চালু রয়েছে। বীরভূমের সবস্থানে পাঁচটি কিংবা সাতটি ঘট মনসা হিসেবে সবসময় পূজিত হয় এবং তাঁরা পরস্পর ভগিনী সম্পর্কে আবদ্ধ বলে উক্ত হয়।

ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণে পাওয়া যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে হিন্দু সেনরাজারা পূর্ববঙ্গে চলে যান এবং সেখানে আরও প্রায় দেড়শ বছরের মতো স্বাধীন ভাবে রাজকার্য পরিচালনা করেন। অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবার সে সময় পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে সেনরাজগণের

Dhaka University Institutional Repository

রাজত্বে নতুন বসতি নির্মাণ করেন। নারায়ণ দেবসহ মনসামঙ্গলের কয়েকজন বিখ্যাত কবিও প্রায় একই সময়ে রাঢ়দেশ তথা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। মূলতঃ তাঁরাই পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের মধ্যে মনসামঙ্গলের কাহিনী প্রচার করেছিলেন। পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গলের দিক্ -পাল কবি বিজয় গুপ্ত " তাঁহার রচনায় রাঢ়ের প্রচলিত কাহিনীর ধারাটিকেই অনুসরণ করিয়াছেন।"৩৫ তাঁর কাব্যে নেতার জন্ম প্রসঙ্গে যে কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে তা রাঢ় অঞ্চলের বিষয়বস্তু শূন্য-পুরাণ বা ধর্মসাহিত্য সংশ্লিষ্ট, পূর্ববঙ্গে কোথাও এর প্রচলন নেই। মনে করা যেতে পারে, মনসামঙ্গলের কাহিনীর সাথে রাঢ়ের এই বিশিষ্ট লৌকিক ধর্মমূলক জনশ্রুতিটিও পূর্ববঙ্গে এসে প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু এটি পূর্ববঙ্গের লৌকিক ধর্মের অনুকূলে না থাকার কারণে চৈতন্য-পূর্ববর্তী তথা প্রথম দিক্ কার মনসামঙ্গলের কবি হিসেবে বিজয় গুপ্ত অনুসরণ করলেও পূর্ববঙ্গের পরবর্তী কবিগণ তা বর্জন করেছেন। বিজয়গুপ্ত তাঁর কাব্যে ধর্মপূজার কৃচ্ছ্র সাধনার (স্মতর্ব্য, ধর্মপূজা পূর্ববঙ্গে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত হলেও পশ্চিমবঙ্গের একটি লৌকিক ধর্ম) ব্যাপারসহ রাঢ়ের জনশ্রুতি অনুসরণ করায় অনেকটা নিঃসংকোচেই বলা যায় যে, মনসামঙ্গলের কাহিনী রাঢ়ে পরিপুষ্টি লাভ করেছিল।

সময়কালের দিক থেকে কোন কোন গবেষক মঙ্গলকাব্যধারাকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন ঃ

১। উদ্ভব যুগ ঃ খ্রীস্টীয় দ্বাদশ - চতুর্দশ শতক। মঙ্গলকাব্যধারার অঙ্কুর আবির্ভাব কাল । অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে এ যুগের কোন কবিকে না পাওয়া গেলেও মনসামঙ্গলে কবি কানা হরিদত্তকে পাওয়া যায়।

২। সৃজন যুগ ঃ খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক । মঙ্গলকাব্যধারার ক্ষেত্রে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ যুগ হচ্ছে এটি। এর একদিকে রয়েছে চৈতন্য-পূর্ব মঙ্গলকাব্যের ধারা, অপরদিকে রয়েছে চৈতন্য-প্রভাবিত মঙ্গলকাব্যের ধারা । চণ্ডীমঙ্গল চৈতন্য প্রভাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। মনসামঙ্গলে চৈতন্য পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে রয়েছেন নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত এবং বিপ্রদাস পিপলাই। চৈতন্য প্রভাবিত (ষোড়শ শতক)-দের মধ্যে আছেন দ্বিজ বংশীদাস, তন্ত্র- বিভূতি, শ্রীরায় বিনোদ প্রমুখ।

৩। ঐশ্বর্যময় যুগ ঃ খ্রীস্টীয় সপ্তদশ- অষ্টাদশ শতক। চৈতন্যোত্তর মঙ্গলকাব্যের যুগ। ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, দুর্গামঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যসমূহ এ সময়ই রচিত হয়। মনসামঙ্গল কাব্য-

Dhaka University Institutional Repository

ধারার বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবির এ সময় আবির্ভাব ঘটে। যেমন- কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, জগজ্জীবন ঘোষাল, বিষ্ণু পাল প্রমুখ। এছাড়াও দ্বারিকা দাস, ষষ্ঠীবর দত্ত, জীবন মৈত্র, সীতারাম দাস প্রমুখ মনসামঙ্গলের কবিগণও এসময়ই আত্মপ্রকাশ করেন।

বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য প্রভাব সর্বব্যাপী এবং সর্বপ্লাবী । মঙ্গলকাব্যধারাও এর থেকে মুক্ত নয়। চৈতন্য-পূর্ব, চৈতন্য-প্রভাবিত এবং চৈতন্য-উত্তর মঙ্গলকবি বিশেষ করে আলোচ্য মনসামঙ্গল কবিদের মধ্যে তাই কাহিনী বিন্যাস, উপস্থাপনা পদ্ধতি ও চরিত্র চিত্রণের মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা যায়। চৈতন্য-পূর্ব যুগের কবিদের কাব্যে মনসাদেবীর প্রতি ছিল '' আতঙ্কগ্রস্ত ভক্তি, স্বৈরাচারী ভাগ্য-বিধাতার নিকটে মানুষের ভয় -মিশ্রিত ভক্তি।''[৩৬] অর্থাৎ, তখন লৌকিক চেতনা এবং অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিই প্রধান ছিল। কিন্তু, চৈতন্য প্রভাবে কিংবা চৈতন্যোত্তর যুগের কবিদের কাব্যে সেই ভয়ভক্তির মধ্যে দেখা দিল ''দাস্যরসের একটা স্থির নম্রতা। তাতে আর হীনতাবোধ নেই ; বরং আছে আচার, বিনয়, সহিষ্ণুতা, স্নেহ, প্রীতি, মমতা, সখ্য প্রভৃতি মানবীয় গুণগানের একটু নতুন স্পর্শ। ''[৩৭] আবার কেউ কেউ বিষয়টাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ '' মনসামঙ্গলের ধারায় প্রথম দিকের কবিদের মধ্যে পৌরাণিক চেতনার একান্ত অভাব দেখা যায়। পরে যত শেষের দিকের কবিদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, ততই তাঁহাদের কাব্যে পৌরাণিক উপাদানের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়।''[৩৮] এজন্যেই নারায়ণ দেব থেকে বিজয় গুপ্তের কাব্যে পুরাণের উপাদান বেশী, বিজয় গুপ্তের থেকে দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে, দ্বিজ বংশীদাসের থেকে জীবন মৈত্রের কাব্যে আবার জীবন মৈত্রের কাব্যের থেকে রাধানাথ রায় চৌধুরীর কাব্যে পুরাণের উপাদান বেশী।

অরিদেবতা মনসার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পাঁচালীই বাংলাসাহিত্যে প্রাচীনতম - এতে কোন সন্দেহ নেই। সম্ভবতঃ খ্রীস্টীয় একাদশ শতকের দিকে সেনরাজবংশের প্রতিষ্ঠার সময় হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগে বৌদ্ধ দেবদেবীগণ যখন নতুন পরিচয়ের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিলেন , তখন বৌদ্ধ জাঙ্গুলীতারা মনসা নামে পরিচিতি লাভ করেন। দেবীর মাহাত্ম্যসূচক সংস্কৃত পুরাণের আখ্যানসমূহ এরপর ক্রমান্বয়ে রচিত হতে থাকে। বাংলা মঙ্গলগানের পালারূপে চাঁদ সদাগর - বেহুলার কাহিনী এরও পরে আনুমানিক খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে বলে ধরে নেওয়া যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে, কানা হরিদত্ত হচ্ছেন এ ধারার আদি কবি। মনসামঙ্গলের আদি কবি হিসেবে কানা হরিদত্তের গ্রহন যোগ্যতা

Dhaka University Institutional Repository

সর্বজনস্বীকৃত না হলেও নানা বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অধিকাংশ গবেষক, পন্ডিত, বিদ্যোৎসাহী তাঁকে মেনে নিয়েছেন।

মনসামঙ্গলকাব্য ধারার প্রভাবশালী কবি বিজয় গুপ্ত তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেছেন -

''মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য ।
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরি দত্ত ।।
হরি দত্তের গীত লুপ্ত পাইল কালে ।
জোড়াগাথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে।।
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুন্দর ।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর ।।''[৩৯]

কানা হরিদত্তের কাব্য সম্পর্কে অশ্রদ্ধেয় মন্তব্যপূর্বক খ্রীস্টীয় পন্ধদশ শতকের পূর্ববঙ্গের বরিশাল অন্ধলের কবি বিজয় গুপ্ত তাঁকেই মনসামঙ্গলের আদি কবির স্থান দিয়েছেন। দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন বিজয় গুপ্তের সময়ে যে গীতি দীর্ঘকাল প্রচলিত থেকে লুপ্ত হয়েছিল, তা অন্তত দু'তিনশ বছর পূর্বে রচিত হওয়ার কথা । তাই তাঁর বিশ্লেষণ হচ্ছে-''সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হরিদত্ত বিদ্যমান ছিলেন। হিন্দু রাজত্বের শেষ সময়ে-যখন গৌড় দেশের উৎসব, সাহিত্য এবং আমোদ প্রমোদ সমস্ত আর্য্যাবর্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় সম্ভবতঃ হরিদত্ত তাঁহার কাব্য লিখিয়াছিলেন।''[৪০] কিন্তু মঙ্গলকাব্যের বিশেষজ্ঞ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন - ''সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হরিদত্ত বিদ্যমান ছিলেন।''[৪১] দীনেশচন্দ্র সেন[৪২] সহ অনেক গবেষক কানা হরিদত্তকে পূর্ববঙ্গের কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আবার ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য[৪৩] সহ অনেক গবেষক হরিদত্তের বাসস্থান সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছেন। কানা হরিদত্ত সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যের সমূহ অভাবের দিকটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক মন্তব্যে - '' একটি ' দিল্লিকা লাড্ডু' লইয়া আলোচনা করিব যাহার কথা শোনা যায়, কিন্তু ' আঁখি পাখি ' ধরিতে পারে না।''[৪৪] তিনি কানা হরিদত্তের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সংশয় প্রকাশ করেছেন ।[৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

বিচ্ছিন্ন কিছু পদ বা পদাংশ ছাড়া কানা হরিদত্তের সম্পূর্ণ মনসাগীতি বা মনসামঙ্গল -এর পুঁথি যেহেতু আজ পর্যন্তও আবিষ্কৃত হয়নি সেজন্যে তাঁর সম্পর্কে অনুমান ছাড়া বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করা সম্ভব নয়। যেমন-শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছেন - '' মনে হয় হরিদত্ত মঙ্গলকাব্যের যে আদিমরূপ - ইহার ব্রতকথা ও পাঁচালীর ন্যায় সংক্ষিপ্ত আকার ও শিথিল অবয়ব-বিন্যাস-তাহারই প্রবর্তক ছিলেন। ইহার কাব্যমূল্য, বর্ণনা পদ্ধতি ও গীতরূপায়ণ খুব নিকৃষ্ট স্তরেরই ছিল ও ইহা নানাবিধ স্থূল অঙ্গভঙ্গী ও বৈচিত্র্যহীন সুর প্রয়োগে আবৃত্তির দ্বারা প্রাকৃত জনসাধারণের কথঞ্চিৎ মনোরঞ্জন করিত।''[৪৬] আবার, আহমদ শরীফ মনে করেন- '' হয়তো কালে আদি রচয়িতা হরি দত্তের পাঁচালী অনুলিপির অভাবে-অনাদরে হারিয়ে গেছে, এবং কিছু কিছু পাঠ হয়তো স্বনামে-বিনামে অন্যের রচনায় আজো আত্মরক্ষা করছে।''[৪৭] তিনি কানা হরিদত্তকে খ্রীস্টীয় পনুরদশ শতকের গোড়ার দিককার বিজয় গুপ্তের এলাকার কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৪৮] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ [৪৯] কানা হরিদত্তের সময়কাল খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথম দিক হিসেবে চিহ্নিত করত তাঁকে পূর্ববঙ্গের অধিবাসী হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। ভূদেব চৌধুরী[৫০] কানা হরিদত্তকে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ এলাকার অধিবাসী হিসেবে উল্লেখ করত খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতককে তাঁর সময়কাল ধরেছেন।

কানা হরিদত্তের রচনাবলী যতো সংক্ষিপ্তই সংগৃহীত হয়ে থাক্ না কেন সেগুলোকে বিজয়গুপ্তের অভিযোগ অনুযায়ী অপাংক্তেয় বলা যায় না। বিজয় গুপ্তের মতো না হলেও হরিদত্তের কবিত্ব কিংবা পাণ্ডিত্য কোনটিরই যে অভাব ছিল না তা তাঁর নিম্নোক্ত রচনাংশ থেকেই বুঝতে পারা যায়।

''বিচিত্র নাগে করে দেবী গলার সূতলি ।
শ্বেত নাগে করে দেবী বুকের কাঁচুলি ।।
অনন্ত নারায়ণে পদ্মার মাথার মণি।
বেত নাগে করে দেবী কাঁকালি কাছুনি।।

* * * * *

অমৃত নঞান এড়ি দেবী বিষ নঞানে চায়।
চন্দ্র- সূর্য গিয়া তবে আন্ডেতে লুকায়।।
দর্পণ হাতে করি দেবী বেশ বানায়।
মনসার চরণে লাচাড়ী হরি দত্তে গায়।।''[৫১]

Dhaka University Institutional Repository

যা হোক, ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও কানা হরিদত্ত হচ্ছেন মনসামঙ্গলের আদি কবি। তাই, '' আদি - কবির স্থান কেবলমাত্র যে ইতিহাসে, তাহা নহে, ... আদি-কবির হৃদয়ে যে সুরটি সর্ব প্রথম বাজিয়া উঠে, তাহা যুগ যুগান্তে নূতন নূতন কবির হৃদয়-পথ বাহিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই ভাবেই ক্রৌঞ্চমিথুনের বেদনাকে কাব্যরূপ দিতে গিয়া রামায়ণের আদি কবি কালোত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন, কৃত্তিবাসও এই ভাবেই কালজয়ী হইয়াছেন। অতএব, বেহুলার বেদনাকে সর্বপ্রথম যিনি কাব্যরূপ দিয়াছিলেন, তাঁহার স্থানও কেবলমাত্র সাহিত্যের ইতিহাসেরই এক প্রান্তে সীমাবদ্ধ হইয়া নাই। তাঁহার পরবর্তী কাল হইতে পাঁচশত বৎসর ব্যাপিয়া শত শত বাঙ্গালী কবি যে এই বেদনার সঙ্গীত গাহিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে ইহার আদি কবির প্রেরণা যেমন অনুভূত হইয়াছিল, তেমনই পাঁচ শতাব্দী ব্যাপিয়া লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে সেই কাহিনী শুনিয়া অশ্রুপাত করিয়াছে, তাহাদেরও হৃদয়ে তাঁহারই বেদনার সুর অনুরণিত হইয়াছে। মনসামঙ্গল বাঙ্গালীর রামায়ণ। বেহুলা ইহার সীতা, চাঁদ সদাগর ইহার রাবণ। সেই জন্যই ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য। অতএব বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্যের যিনি আদি কবি, কেবল মাত্র ইতিহাসের মধ্যেই তাঁহার স্থান নহে, সমগ্র জাতির হৃদয়-পদ্মের উপর তাঁহার অধিষ্ঠান-তাহা লক্ষ্যগোচর নহে বলিয়া উপেক্ষণীয়ও নহে।''[৫২]

কানা হরিদত্ত বাঙালীকে যে অমিয় সুধারূপ চাঁদ সদাগর-বেহুলার কাহিনী উপহার দিয়ে গেলেন খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের দিকে, তা তাঁর দেহান্তরের সঙ্গে লুপ্ত না হয়ে গিয়ে চিরন্তননত্ব লাভ করল। এ কাহিনীকে ভেলা করে শত শত বাঙালী কবি সুদীর্ঘ প্রায় অর্ধ-সহস্র বছর কাল ব্যাপী মনসার ভাসানে যাত্রা করলেন। এই কবিশ্রেণীর মধ্যে পূর্ববঙ্গের, রাঢ় অঞ্চলের, উত্তরবঙ্গের, আসামের প্রভৃতি সকল স্থানের কবিরাই রয়েছেন। ফলে একই বিষয়- বস্তুকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন কবিরা নিত্য নতুন কাব্য রচনা করতে থাকায় দেখতে দেখতে বাংলার জল-স্থল- আকাশ বেহুলার করুণ সঙ্গীতের মূর্ছনায় বিষাদিত হয়ে পড়ল।

এখানে, উত্তর বিহারের অন্তর্গত মিথিলার বিদ্যাপতি (আদি মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবি)-এর রচিত মনসার পূজাপদ্ধতির গ্রন্থ ' ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী' প্রসঙ্গে কিছুটা আলোকপাত করা দরকার। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অত্র গ্রন্থের একমাত্র পুঁথিটি (১৪৫৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রচিত) পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলা থেকে আবিস্কৃত হয়েছে।[৫৩] বিদ্যাপতির 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'র নামের অনুরূপ ' ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী' পুঁথিখানি তার সর্বশেষ রচনা হিসেবে বিবেচিত হয়। '' পুঁথিখানিতে বেহুলা-লখিন্দরেরও উল্লেখ আছে,

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং খ্রীস্টীয় পন্ধদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বেই যে বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী মিথিলায় প্রচলিত ছিল, ইহা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।[৫৪] ব্যাড়ী শব্দের অর্থ সর্পিণী, সংস্কৃত ব্যাল শব্দের অর্থ সর্প, উচ্চারণ-বিকৃতির ফলে সেটিই ব্যাড় এবং স্ত্রীলিঙ্গে ব্যাড়ী পরিগ্রহ করেছে। ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিণীতে সর্পদেবী মনসার নামান্তর হিসেবে ব্যাড়ী ছাড়াও বিষহরী এবং সুরসা উল্লেখিত হয়েছে। এতে মনসাপূজাকে ' রয়হানি' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা যথেষ্ট তাৎপর্যবহ। আহমদ শরীফ সম্পাদিত (এবং পত্রিকায় প্রকাশিত) অত্র গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষায় বর্ণিত মসনাদেবীর পূজার পদ্ধতি প্রভৃতি প্রসঙ্গে সম্পাদক বলেছেন, '' পূজা- পার্বণ সম্পদ সাপেক্ষ বলেই মনসাপূজা কেবল ঘট বসিয়ে করার বিধান যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে ঘটা করে মহোৎসব করার বিধানও । চৌদ্দ থেকে শত হাত লম্বা নৌকায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, পার্বতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, কালীয় নাগ, অষ্ট নাগ, জরৎকারু, আস্তীক, অষ্ট পদাতিক, ভাণ্ডারী, দুর্গা প্রভৃতি দেবতার সবাহন মূর্তি এবং চাঁদ থেকে নেতা ধোপানী অবধি সব সংশ্লিষ্ট মানুষের প্রতিমা গড়ে মহাড়ম্বরে সবলি মনসাপূজা করাই বিত্তবানদের কর্তব্য। এ পূজা বৈশাখে, আষাঢ়ে ও শ্রাবণে করা বিধেয় । প্রতিমা হত পটে, মণ্ডণে ও ঘটে, বিচিত্রাও সম্ভবত বিচিত্র পট। মূর্তি হত সোনার, রূপার, তামার কিংবা মাটির। নির্বলি পূজার যেমন ব্যবস্থা আছে, তেমনি রয়েছে ছাগাদি পশু বলির বিধানও । দ্বিজে - দরিদ্রে দানও করতে হয় সাধ্যমত।''[৫৫] ব্যাড়ী ভক্তিতরঙ্গিণীতে বর্ণিত মনসাপূজার পদ্ধতি ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় - এদেশে প্রচলিত মনসাপূজার নিয়ম-কানুন মোটামুটিভাবে এটিই । বরিশাল অন্চলে মনসাপূজার বিশেষ অনুষ্ঠানকে যে রয়ানি বলা হয়ে থাকে, এতে তারও বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। তাহলে প্রমাণিত হচ্ছে, '' পনেরো শতকের প্রথমার্ধেও চাঁদ - বেহুলার কাহিনী পূর্ণাঙ্গ পরিণতি লাভ করেছিল, কাজেই তেরো শতকের শেষার্ধে অন্ততঃ এটি জনপ্রিয় কথকতার অবলম্বন ছিল।''[৫৬] সে হিসেবে বাংলার মনসাপূজার ইতিহাসে তথা মনসা-চাঁদ সদাগর - বেহুলা-লখিন্দর কাহিনীর পরিপুষ্টি বিধানে ' ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী'র বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

পৃথিবীর নামকরা গ্রন্থগুলোর পাত্র-পাত্রীরা যেমন বাস্তব মানুষের চেয়েও বাস্তব এবং বিখ্যাত হয়, মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগর, বেহুলা, লখিন্দর, চম্পকনগর, উজানিনগর প্রভৃতি ও তেমনি বাস্তব এবং সুপ্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। তাই বৃহত্তর প্রাচীন বঙ্গের (বাংলা-বিহার-আসাম-উড়িষ্যার) বিভিন্ন স্থানে চাঁদ সদাগরের ভিটে, বেহুলা-লখিন্দরের বাসরঘর, নেতার ঘাট প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। ইট পোড়ানো স্থান যেমন ইটখোলা, বারোয়ারী অনুষ্ঠানের স্থান যেমন বারোয়ারী তলা, ঈদের জামাতের ময়দান যেমন

Dhaka University Institutional Repository

ঈদগাহ্ তেমনি মনসামঙ্গলের কাহিনীর প্রবহমানকারী স্থানসমূহে এরূপ স্মারক-চিহ্ন নির্দিষ্ট হয়েছে। মনসাপূজার সাথে মনসামঙ্গল তথা মনসার ভাসান গাওয়া অত্যাবশ্যক অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হত। এ বিশাল ভূখন্ডের শত শত কবি (যাদের অধিকাংশই বাঙালী) শত শত বছর ব্যাপী চাঁদ সদাগর-বেহুলা -লখিন্দরের কাহিনী অবলম্বনের মাধ্যমে তত্ত্বে, তথ্যে, বিন্যাসে, ঘটনার ও বর্ণনার সংকোচন - প্রসারণ করত স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যানুযায়ী তাদের কাব্যসমূহকে (যেগুলোর অধিকাংশ বাংলা ভাষায় রচিত) সাজিয়েছেন। অবশ্য '' এ ধরনের প্রাচীন, জনপ্রিয় ও সর্বলোকশ্রুত কাহিনী বা বৃত্তান্ত মুখ থেকে মুখে, কান থেকে কানে, কাল থেকে কালে , স্থান থেকে স্থানে এবং এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত, সঞ্চিত ও পুনরাবৃত্ত হয় বটে। বাক্যে-বক্তব্যে, লক্ষ্যে-প্রতিপাদ্যে, রূপে-রসে, তত্ত্বে - তথ্যে লঘু - গুরু পরিবর্তনও হয় বটে, কিন্তু গল্পের মূল ভিত্তি ও অবয়ব তেমন বদলায় না।''[৫৭]

কাহিনী এবং কালগত দিক থেকে মনসামঙ্গল কাব্যধারার শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে ইতোপূর্বেই কিঞ্চিত আলোকপাত করা হয়েছে। সুকুমার সেন মনে করেন - '' মনসামঙ্গলের তিনটি মুখ্য রচনা বাংলাদেশের তিনটি অঞ্চলে একদা প্রতিনিধির মতো প্রচলিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গে বিপ্রদাসের ' মনসাবিজয়', উত্তরবঙ্গে তন্ত্রবিভূতির ' মনসাপুরাণ' আর পূর্ববঙ্গে নারায়ণ দেবের ' পদ্মাপুরাণ''।[৫৮] তাঁর আরো অভিমত হচ্ছে - আসামের পশ্চিম অঞ্চলে, গোয়ালপাড়া ও কামরূপে যে সমস্ত মনসামঙ্গল দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো হয় নারায়ণ দেবের কাব্যের রূপান্তর , না হয় তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ; এবং প্রাচীনতর দু'কবি-মনোহর কর (মনকর) ও দুর্গাবরকে কামতা-কামরূপের বিশিষ্ট মনসামঙ্গলকার হিসেবে ধরা যায়।[৫৯] মুদ্রণ -সৌভাগ্যের দিক থেকে দেখতে গেলে বলতে হয় পশ্চিমবঙ্গ তথা রাঢ়ের ধারার মনসামঙ্গলের তো বটেই, সমগ্র মনসামঙ্গল কাব্যধারায় কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলই প্রথম মুদ্রিত হয়। পূর্ববঙ্গের ধারার মনসামঙ্গলসমূহের মধ্যে বিজয় গুপ্তের এবং তুলনামূলক দেরীতে হলেও উত্তরবঙ্গের ধারার মনসামঙ্গলসমূহের মধ্যে জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল প্রথম মুদ্রিত হয়। এদের কাব্যসমূহের জনপ্রিয়তার কারণেই যে এরূপ ঘটেছে সেটি বলাই বাহুল্য। পূর্বেই বলা হয়েছে, বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনায় সংকোচন-প্রসারণ - গ্রহণ-বর্জন- সংযোজন প্রভৃতি ঘটেছে বিভিন্ন মনসামঙ্গল কাব্যে। এটা যেমন স্থূল ভাবে বিভাজিত তিনটি ধারার মধ্যে রয়েছে আবার তদ্রূপ একই ধারার বিভিন্ন কবিদের কাব্যসমূহের মধ্যেও রয়েছে। ধারাগত দিক থেকে উত্তরবঙ্গ (ও কামরূপ) এর ধারাটা একটু ভিন্ন ধরনের, এতে ধর্মমঙ্গলের প্রভাব সহ স্থানীয় বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পক্ষান্তরে, অল্প-স্বল্প বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও রাঢ়ের (পশ্চিমবঙ্গের) ধারা এবং পূর্ববঙ্গের ধারার

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে খুব একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কোন কোন দিক থেকে পূর্ববঙ্গের ধারার সাথে উত্তরবঙ্গের ধারার যথেষ্ট মিল রয়েছে। রাঢ়ের ধারার কোন কবিই তাঁদের কাব্যকে কখনো ' পদ্মাপুরাণ ' নামে অভিহিত করেননি, যা অন্য দু'ধারার অনেক কবিই করেছেন। পূর্ববঙ্গ (এবং উত্তরবঙ্গ)-এর কবিদের মনসাদেবীর নামান্তর হিসেবে 'পদ্মা' -কে গ্রহণ করার মধ্যে অনেক গবেষক পূর্ববঙ্গকে মনসাপূজার বিশেষ পীঠস্থান হিসেবে দেখার পাশাপাশি বাঙালী চিত্তে মনসা তথা পদ্মাদেবীর প্রভাব প্রতিপত্তির ফলেই যে গঙ্গা নদী বাংলাদেশে (পূর্ববঙ্গে) প্রবেশ করে পদ্মা নামধারণ করেছে - সেটা মনে করেন।[৬০] এ প্রসঙ্গে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন, '' প্রাচীন কালে পূর্ববঙ্গে সাপের দেবীকে নদীর সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হইয়াছিল। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। প্রাচীন আর্যেরাও বিদ্যার দেবীকে সরস্বতী নদীর সঙ্গে অভিন্ন মনে করিতেন। সংস্কৃত পুরাণের কশ্যপকন্যা মনসা কিরূপে বাংলায় পার্বতীর সপত্নী কন্যা হইলেন, তাহা এই পদ্মা নাম হইতে বুঝিতে পারা যায়। গঙ্গা হইতেছে পার্বতীর সপত্নী আর পদ্মা নদী হইতেছে এই গঙ্গার কন্যাস্বরূপা শাখা নদী। কাজেই পদ্মা মনসা শিবের কন্যা এবং দুর্গার সতীন - ঝি। কিন্তু পদ্মাপুরাণের কবিরা এই ভৌগলিক ব্যাখ্যা ভুলিয়া গিয়া পদ্মার এক নূতন ব্যাখ্যা দিলেন এই যে পদ্মবনে শিবের বীর্যে মনসার জন্ম হইয়াছিল, তাই তাঁহার নাম পদ্মা বা পদ্মাবতী। আসলে ইহা একটি লোক ব্যুৎপত্তি (Folk Etymology)[৬১] পূর্ববঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গ উভয় ধারার মনসামঙ্গল (পদ্মাপুরাণ) কাব্যসমূহে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যতরী (ডিঙ্গা) - র সংখ্যা চৌদ্দ, পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গের (রাঢ়ের) ধারার কাব্যসমূহে সাত। পশ্চিমবঙ্গের অনেক কবিই তাঁদের কাব্যে পূর্ববঙ্গীয়দের ' বাঙ্গাল' বলে ব্যঙ্গ করেছেন।

মনসামঙ্গলে যে সমস্ত উপাদানের সমন্বয়ে মনসাদেবীর বিচিত্র রূপটি প্রকটিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন লৌকিক বাস্তু-দেবতা- সিজ গাছে যাঁর অধিষ্ঠান।[৬২] সুকুমার সেন বিভিন্ন বঙ্গে প্রচলিত বাস্তুপূজা তথা মনসাপূজার তথ্যাদি দিয়েছেন এভাবে - '' পশ্চিমবঙ্গের বাস্তুপূজার দেবতা হইল সিজ গাছ ও অষ্টনাগ (অথবা অষ্টনাগের প্রতিনিধি স্থানীয় অনন্ত বা বাসুকি যিনি মাথায় পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন) । উত্তরবঙ্গে বাস্তুপূজার দেবতা সিজ গাছ ও মনসা । পূর্ববঙ্গে বাস্তুপূজা কিভাবে আছে তাহা অবগত নই। সম্ভবত জলপ্লাবিত ভূভাগে স্থায়ী আবাসের সম্ভাবনা কম থাকাতেই ওখানে বাস্তুপূজা লুপ্ত অথবা লুপ্তপ্রায়, এবং তাহার স্থানে ঘরে ঘরে ঘটে অথবা মূর্তিতে মনসা পূজার রীতি বহু প্রচলিত । ..... পূর্ববঙ্গের মতো ঘরে ঘরে ব্রত-অনুষ্ঠান রূপে মনসা-পূজা পশ্চিম বঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

অজ্ঞাত। বৈশাখ মাসে দশহরার দিনে সিজ গাছের তলায় নাগ (ও মনসা) পূজা পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র অনাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।''৬৩

উত্তরবঙ্গ-আসামের মনসামঙ্গলের কবিদের কাব্যের প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে - যথা সম্ভব সংক্ষেপে সৃষ্টিকথা শেষ করে শিব-গঙ্গা - দুর্গার প্রণয় তথা বিবাহের কাহিনী দিয়ে কাহিনীর শুভারম্ভ (স্মাতর্ব্য, নারায়ণ দেবের রচনার এই অংশটুকু স্বতন্ত্র পুথি ' কালিকাপুরাণ' নামে পরিচিত)। এ ধারার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে - লখিন্দরের মাতুলানী হরণ প্রসঙ্গ। বিভিন্ন অঞ্চলের মনসার কাহিনীর বৈচিত্র্য আলোচনা কালে সঙ্গত কারণেই ভিন্ন একটি প্রসঙ্গ এসে পড়ছে । মনসা-বিষয়ক প্রাচীন একটি সংস্কার থেকে উদ্ভূত চাঁদ সদাগর-বেহুলা - লখিন্দরের কাহিনীর সাথে সংশ্রবহীন মনসার মাহাত্ম্য বিষয়ক স্বতন্ত্র এক কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠা মেয়েলী ব্রতকথাটির উল্লেখ এখানে বিশেষভাবে করতে হচ্ছে কারণ, কাহিনীগত ঐক্য অক্ষুন্ন রেখে সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর বঙ্গের সর্বত্র ইহা সমান ভাবে প্রচার লাভ করেছে। সংক্ষেপে কাহিনীটি৬৪ নিম্নরূপ ঃ

এক সদাগরের সাত পুত্র , সাত জনেই বিবাহিত। পুত্রবধূদের সকলের বাপের বাড়ি থেকেই তত্ত্ব আসে, শুধু ছোট বৌয়ের বাড়ি থেকে কিছু আসে না দেখে শাশুড়ী তার প্রতি ক্ষুব্ধ এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। এক বর্ষার দিনে সকল বৌ যার যার পছন্দনীয় জিনিস খাওয়ার আগ্রহ দেখাল। গর্ভবতী ছোট বৌ পান্তা ভাত দিয়ে মাছের টক খেতে চাইল। ছয় জায়ের সাথে ছোট বৌও সন্ধ্যার সময় পুকুরে গা ধুতে গেল। সে সময় জলের উপর ছোট বৌ এক ঝাঁক মাছ দেখতে পেল। প্রকৃত পক্ষে সেগুলো মাছ ছিল না, নিকটবর্তী বলে বসবাসকারী অষ্টনাগ দাবানল সৃষ্টি হওয়ায় মাছরূপে তারা পুকুরে লুকিয়েছিল। ছোট বৌ গামছা ছেঁকে মাছগুলো ধরল। জায়েরা দেখে ভাবল, ছোট বৌয়ের সাধ পূর্ণ হল। ছোট বৌ মাছগুলো বাড়িতে নিয়ে এল। সে পরদিন সেগুলোকে দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করল , তারা সকলে সাপ হয়ে রয়েছে। তখন ছোট বৌ দুধ আর কলা দিয়ে সাপগুলোকে পুষতে লাগল। এভাবে কিছু দিন অতিক্রান্ত হলে সাপগুলো স্বর্গে তাদের মাতা মনসাদেবীর কাছে চলে গেল। ছেলেরা মায়ের কাছে ছোট বৌয়ের উপকারিতার কথা বলল। মনসা ছেলেদের কথা শুনে ছোট বৌকে তাঁর কাছে আনার জন্যে গমন করলেন। শাঁখা, সিঁদুর-চুপড়ি, নোয়া , নথ লাগিয়ে মনসা সদাগরের বাড়ী এসে উপস্থিত হলেন। ছোট বৌয়ের শাশুড়ীর কাছে তিনি নিজেকে তার মাসী হিসেবে পরিচয় দিয়ে তাকে কিছু দিনের জন্যে নিয়ে যাবার অভিলাষ ব্যক্ত করলেন। শাশুড়ী সম্মতি জানালে মনসা ছোট বৌকে নিয়ে রথে চড়ে

Dhaka University Institutional Repository

রওনা হলেন । রথে তুলেই মনসা ছোট বৌকে চোখ বুজে থাকতে বললেন। মনসা নিজের পুরীতে পৌঁছে ছোট বৌকে চোখ খুলতে বললেন। চোখ খুলে ছোট বৌ দেখল - মস্ত বড় বাড়ি, সেখানে অষ্টনাগও রয়েছে। মনসা তখন ছোট বৌকে বললেন, '' তুমি রোজ আমার পূজার আয়োজন করিবে, তোমার এই আট ভাইয়ের জন্য গরম দুধ রাখিবে, আর কখনও দক্ষিণ দিকে চাহিবে না।'' মনসার নির্দেশমত ছোট বৌ কাজ করে যাচ্ছিল । একদিন সে দক্ষিণ দিকে তাকানোর কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারল না। দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে দেখে, মনসা নাচছেন। দেখতে দেখতে সে তন্ময় হয়ে গেল। ভাইদের দুধ গরম করে রাখার কথা ভুলে গেল। তারপর মা মনসার নাচ শেষ হলে ছোট বৌ তাড়াতাড়ি এসে দুধ গরম করল ; গরম দুধে মুখ দিতেই অষ্টনাগের মুখ পুড়ে গেল। এতে ক্রোধান্বিত হয়ে অষ্টনাগ ছোট বৌকে দংশন করতে উদ্যত হলে মনসা তাদেরকে বাধা দিয়ে বললেন, '' এখানে আমার বাড়িতে তাহাকে কামড়াইবার প্রয়োজন নাই, বরং তাহাকে আমি মর্ত্যলোকে তাহার বাড়ীতে রাখিয়া আসি, সেখানে গিয়াই তাহাকে কামড়াইও।'' অষ্টনাগকে নিবৃত্ত করে মনসা ছোট বৌকে মর্ত্যলোকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে যাত্রা করলেন। পথে মনসা তাকে বললেন, '' তোমার ভাইয়েরা তোমার উপর খুব রাগিয়াছে, মর্ত্যলোকে গিয়া তুমি তাহাদের খুব সুখ্যাতি করিও, তবেই তাহারা তোমার উপর খুশি হইবে।'' অর্ধেক গায়ে গয়না দিয়ে মনসা ছোট বৌকে তার শ্বশুর বাড়িতে রেখে গেলেন। ছোট বৌকে দেখে শ্বশুর বাড়ির সকলে নিন্দে করে বলতে লাগল, '' এ আবার কি ঢং, অর্ধেক গায়ে গয়না, বাকি অর্ধেক গায়ে কিছু নাই ? '' তাদের কথা শুনে ছোট বৌ বলল, '' আমার অষ্টনাগ ভাইয়েরা বাঁচিয়া থাকুক , আমার গয়নার অভাব কি ? অর্ধেকে গায়ে গয়না দিয়াছে, বাকি অর্ধেক গায়েও তাহারাই গয়না দিয়া ভরাইয়া দিবে। '' সে সময় অষ্টনাগ বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরছিল। ছোট বৌয়ের মুখে তাদের প্রশংসা শুনে তারা অত্যন্ত খুশি হল এবং তাকে দংশন করার ইচ্ছে পরিত্যাগ করে স্বর্গে ফিরে এসে মা মনসার কাছেও তারা ছোট বৌয়ের প্রশংসা করতে লাগল। এরপর অষ্টনাগের অভিপ্রায় হওয়ায় মনসা ছোট বৌয়ের বাকি অর্ধেক গায়েও গয়না দিয়ে ভরিয়ে দিলেন। মনসা তখন স্বরূপে আবির্ভূত হয়ে ছোট বৌকে বললেন , '' আমি তোমার মাসী নই, আমি মনসা, আমি সিজ মনসা গাছে থাকি , তুমি আমার পূজা পৃথিবীতে প্রচার করিও । দশহরা, নাগপঞ্চমীর দিনে ঐ গাছ আনিয়া পূজা করিও, আর ভাদ্রমাসে অরন্ধনের দিন শুদ্ধাচারে পূজা করিয়া আমাকে পান্তা ভাতের সাধ দিও ! তাহা হইলে আর কখনও সাপের ভয় থাকিবে না।'' এই বলে মনসা অন্তর্হিত হয়ে গেলেন । ছোট বৌ তখন সকলকে সব কথা খুলে বলল। তখন থেকেই সকলে

Dhaka University Institutional Repository

পরম শ্রদ্ধা এবং ভক্তিভরে মনসার পূজা করতে আরম্ভ করল। এভাবে মর্ত্যলোকে মনসার পূজার প্রচলন ঘটল।

কাহিনীটি পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে এইভাবে প্রচলিত রয়েছে, রাঢ়ে তথা পশ্চিমবঙ্গে এর সামান্য কিছু ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায় । কিভাবে নাগশিশুর সাথে ছোট বৌয়ের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটল, কেবলমাত্র এই অংশটুকুর মধ্যেই রাঢ়ের প্রচলিত কাহিনীর কিছুটা ব্যতিক্রম রয়েছে। পার্থক্যটা হচ্ছে - সদাগরের বাড়িতে এক রাখাল বালক ছিল, সে মাঠে মাঠে গরু চরাত। একদিন সে গরু চরানোর সময় এক গাছের নীচে দুটি ডিম কুড়িয়ে পেল। ডিম দুটি তার পুড়িয়ে খাবার ইচ্ছে জাগায় সে বাড়িতে এসে সদাগরের ছোট বৌকে ডিম দুটি পুড়ানোর জন্যে দিল। ডিম দুটি দেখে ছোট বৌয়ের ভীষণ মায়া হল। সে চিন্তা করতে লাগল, '' আহা কোন জীবের ডিম !'' এই চিন্তা করে সে ডিম দুটিকে এক কোণে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিল এবং রাখাল বালকটিকে দুটি কাঁঠাল- বীচি পুড়িয়ে ডিম বলে খেতে দিল। এরপর একদিন ছোট বৌ খেয়াল করল, ঢাকনার ভিতরে কি যেন নড়া-চড়া করছে । সে তৎক্ষণাৎ ঢাকনা খুলে দেখল, দুটি নাগশিশু । তখন সে এদেরকে ভয় না করে পরম স্নেহ-যত্নে প্রতিপালন করতে লাগল। এরপর থেকে কাহিনীর মধ্যে আর তেমন কোনও পার্থক্য নেই।

মনসামঙ্গল কাব্যধারার অন্যতম প্রধান কবি বিপ্রদাসের কাব্যে যে সংস্কার থেকে মনসার '' জাগিয়া জাগুলী নাম সিজ - বৃক্ষে স্থিতি ''৬৫ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, বলা যায়- এই ব্রতকথার সংস্কারও সেখান থেকেই এসেছে। এই ব্রতকথার কাহিনীটি চাঁদসদাগর - বেহুলা - লখিন্দরের কাহিনীর পূর্ববর্তী বলেই মনে হয়। বিশেষভাবে লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে - সমগ্র বাংলা এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলসমূহে চাঁদ সদাগর - বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীর ব্যাপক প্রচার সত্ত্বেও মেয়েলী এই ব্রতকথাটিতে তার কোনই প্রভাব অনুভব করা যায় না। পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে - উপরোক্ত ব্রতকথাটি মনসা বিষয়ক দু' একটি অতি প্রাচীন সংস্কারকে অবলম্বন করত অন্তঃপুরের নিভৃত কোণে কোন সে প্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি তার শুচিতা এবং আব্রু অক্ষুণ্ন রেখে চলছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এই যে, মনসামঙ্গলের বহুল প্রচলিত চাঁদ সদাগর - বেহুলার কাহিনীর কোনও প্রভাব বাংলা এবং বিহার ছাড়িয়ে উত্তর প্রদেশে দেখা না গেলেও , বাংলার নিভৃত অন্তঃপুরের মনসাপূজার উক্ত মেয়েলী ব্রতকথার সাথে সেখানকার (উত্তর প্রদেশের) ' করওয়ার ' পূজার একটি ব্রতাকাহিনীর অদ্ভুত মিল পরিলক্ষিত হয়। তাহলে কি অনুমান করা যায় - কাহিনীটি সেখান থেকে বাংলাদেশে এসেছে? কার্তিকী কৃষ্ণা চতুর্দশীতে

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠিত স্বামীর মঙ্গল কামনায় সধবা নারীদের কর্তৃক অনুষ্ঠিত করওয়ার-এর ব্রতকথাটি[৬৬] নিম্নে উদ্ধৃত হল।

একটি মেয়ের বিয়ের পর তার বাপের বাড়ীর সকলেই একে একে মারা যায় এবং তারা পুনর্জন্মে সর্পরূপে আসে।

এদিকে শ্বশুর বাড়িতে মেয়েটির জা'দের বাপ - ভাইয়েরা আসে, তত্ত্ব আসে, কিন্তু তার জন্যে কেউ কিছু নিয়ে আসে না। এজন্যে শ্বশুর বাড়িতে তাকে সীমাহীন গঞ্জনা সহ্য করতে হয়।

একবার ' করওয়ার' পূজার আগের দিন মেয়েটি মনমরা হয়ে বসে আছে - সবার বাড়ি থেকেই তত্ত্ব আসবে, তাকে কেউই কিছু পাঠাবে না। এমন সময় নর্দমার এক গর্তের ভিতর দিয়ে তার সর্পরূপী বড় ভাই এসে হাজির হল এবং তাকে সান্ত্বনা দিয়ে রাতের মধ্যেই তত্ত্বের সকল জিনিস সংগ্রহ করে আনল।

পরদিন সকলে ছোট বৌয়ের তত্ত্ব দেখে ভীষণ খুশি হল এবং ব্রত শেষে ভাইয়ের অনুরোধে তাকে পিত্রালয়ে যেতে দিল। বহু মাঠ-ঘাট, ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে তারা একটি অশ্বত্থগাছের তলায় এসে থামল এবং এক সুড়ঙ্গ পথ বেয়ে মাটির নীচে মায়ের তথা মা মনসার কাছে গিয়ে হাজির হল। মনসার অনেক বড় বাড়ি, ঘর-দরজার শেষ নেই।

মায়ের কাছে মেয়ে যথেষ্ট আদর-যত্ন পেতে লাগল। মা মনসা মেয়েকে (ছোট বৌকে) সাবধান করে দিলেন যে, তার আট ভাই (অষ্ট নাগ) একটু রাগী প্রকৃতির, সেজন্যে সে যেন তাদের যত্নসহকারে সেবাশুশ্রূষা করে, আর দক্ষিণ দিককার নির্দিষ্ট একটা ঘরে যেন না যায়।

মা মনসা অষ্টনাগকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিদিন সকালে বেরিয়ে যান এবং সন্ধ্যায় ফিরে আসেন। ছোট বৌ বাড়ির সব স্থানে ঘুরে বেড়ায়, তার আনন্দের শেষ নেই। এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল । একদিন কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে মা মনসা তাকে যে ঘরে যেতে নিষেধ করেছিলেন, সেই ঘরে গিয়ে হাজির হল। সেখানে সে শত শত সাপকে কিলবিল করতে দেখে ভয়ে তাড়াতাড়ি করে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে একটা বাচ্চা সাপের লেজ কেটে ফেলল।

এদিকে সন্ধ্যার সময় অষ্ট নাগ মায়ের সাথে বাড়ি ফিরে ছোট বৌয়ের দেওয়া দুধ খেয়ে দক্ষিণের ঐ নির্দিষ্ট ঘরে শুতে গেল। সেখানে তারা বাচ্চা সাপের অবস্থা দেখে ক্রোধভরে ঘর থেকে বের হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

এল - আজ তারা ছোট বৌকে খেয়েই ফেলবে, সে বারণ না শুনে দক্ষিণের ঘরটিতে গিয়েছে এবং একটা বাচ্চা সাপের লেজ কেটে দিয়েছে। এত বড় সাহস !

তখন মনসা অষ্টনাগকে সান্তনা দিলেন, মর্ত্যলোকের কন্যা, তার তো দোষ হবেই ; তাকে এখানে এনে কামড়ালে বদনাম হবে। তাই পরদিন তাকে তিনি শ্বশুর বাড়ি দিয়ে আসবেন । নাগমাতা মনসা পরদিন ছোট বৌকে শ্বশুর বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্যে রওয়না হলেন। পথে মনসা মেয়েকে বললেন, '' তুমি আমার কথা না শুনিয়া দক্ষিণের ঘরে গিয়াছিলে এবং একটা বাচ্চার লেজ কাটা পড়িয়াছে ; এই জন্য তোমার ভাইয়েরা খুব রাগিয়া গিয়াছে এবং সুযোগ পাইলেই তোমাকে কামড়াইবে। যদি বাঁচিতে চাও, রোজ যখন সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিবে, খুব জোরে জোরে চীৎকার করিয়া তোমার ভাই ও ভাইপোদের কল্যাণ চাহিবে, তাহা হইলে ওরা তোমাকে নাও মারিতে পারে।''

মনসা মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলেন। এদিকে ছোট বৌ মায়ের কথা মত প্রতিদিন সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালার সময় উঠোনে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে নাগ-নাগিনী , নাগশিশু, নাগপরিবার সকলের শ্রীবৃদ্ধি এবং কল্যাণ কামনা করতে থাকে।

অষ্টনাগ বোনের শ্বশুর বাড়ির আনাচে কানাচে থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় তার মুখে নাগেদের শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনার কথা শুনে শান্ত হল এবং তাকে দংশন করার ইচ্ছে চিরতরে পরিত্যাগ করে মা মনসার কাছে চলে গেল।

আপাতদৃষ্টে ব্রতকথার কাহিনীটি উত্তর প্রদেশ থেকে বাংলাদেশে আসার কথা মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক । স্থান ভেদে মনসাপূজার মধ্যে বেশ বৈপরীত্য দেখা যায়। যেমন-পূর্ববঙ্গে সাধারণত শ্রাবণ - সংক্রান্তিতে এই পূজার ব্যাপক প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। কেউ আষাঢ়-সংক্রান্তিতে ' ঘট' বসিয়ে সম্পূর্ণ শ্রাবণ মাস পূজা করেন। শেষ দিনে মূর্তির্তে জাঁক-জমকের সাথে তা উদযাপিত হয়। কোথাও কোথাও শুধু নাগ - পঞ্চমীতে মনসাদেবীর পূজা এবং অষ্টনাগের পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কেউ কেউ আবার এই তিথি থেকে আরম্ভ করে প্রতি মঙ্গলবার পূজা করে থাকেন এবং শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে তার সমাপ্তি ঘটে। পশ্চিমবঙ্গে দশহরা দিবসে, পহেলা ভাদ্র তারিখে কিংবা সৌর ভাদ্রের যে কোন শনিবারে বা মঙ্গলবারে বা নাগপঞ্চমী থেকে আরম্ভ করে প্রতি পঞ্চমী তিথিতে এবং ভাদ্র-সংক্রান্তিতে মনসাপূজা উদযাপনের

Dhaka University Institutional Repository

রীতি পরিলক্ষিত হয়। বিবাহাদি সংস্কারেও বাংলার বহু এলাকায় কেউ কেউ মনসাপূজা করে থাকেন। ময়মনসিংহে এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মনসাপূজা 'ডরাই বিষহরী'র পূজা নামে কথিত হয়ে থাকে। উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের মধ্যেও বিবাহ উপলক্ষে ' বিষহরী ' তথা মনসার পূজা হতে দেখা যায়।

মনসাপূজার দিন-তারিখের বিভিন্নতার ন্যায় মূর্তি ও প্রতীকের মধ্যেও বিভিন্নতা দেখা যায় । অনেক গবেষক মত প্রকাশ করেছেন যে, সর্পভয় থেকে এককালে জীবিত সর্পকেই পূজা করা হত।[৬৭] অষ্টনাগমূর্তি এবং এইরূপ আরও সর্পমূর্তি স্থাপন করত পূজার মধ্যে সেই জীবিত সর্পপূজার ধারাটিই ক্ষীণভাবে চলে আসছে। দাক্ষিণাত্যে এখনও অনেক মন্দিরে জীবিত সর্প পালনের কথা শোনা যায়।[৬৮] পূর্ববঙ্গ , পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ প্রভৃতি এলাকা গৃহস্থবাড়ি গুলোতে ' বাস্তু সাপ' - এর প্রতি ভক্তিভাব পরিলক্ষিত হয়। ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোর এবং পশ্চিমবঙ্গের বহু এলাকাতেই অষ্টনাগ মূর্তিতে মনসাপূজা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে এই মূর্তিতে পূজার প্রচলনই সবচেয়ে বেশি। চতুর্ভুজা, সর্পধৃতা, সর্পশোভিত, পদ্মাসীনা, হংসারূঢ়া মৃন্ময়ী মনসামূর্তি স্থাপনের মাধ্যমে ময়মনসিংহ প্রভৃতি এলাকায় পূজা হতে দেখা যায়। মহীশূরে[৬৯] 'মুদামা' নামক এক সর্পদেবীর পূজার প্রচলন আছে। এই মূর্তিটা মৎস্যকন্যা সদৃশ, মনে হয় সর্পের ভিতর থেকে এক নারী বের হয়ে আসছে। দাক্ষিণাত্যে[৭০] কানাড়া প্রদেশের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে 'মনে মন্যুমা' নামক এক সর্পের তথা সর্পদেবীর পূজার প্রচলন আছে। এই দেবীর কোন মূর্তি নেই, একটি ঢিবিতে অদৃশ্য 'মন্যুাম্মা'র উদ্দেশ্যে বছরে একদিন পূজা দেওয়া হয়। রাঢ় অঞ্চলে বীরভূমে ব্রাহ্মণেতর জাতির বেশির ভাগের বাড়িতেই স্থায়ী মনসার মন্দির আছে। মাটির দেয়াল এবং খড়ের চালযুক্ত মণ্ডপে স্থাপিত মাটির একটি ঘট, ঘটের গায়ে কয়েকটি সর্প ফণা ও মুখে একটি সিজ মনসার ডাল- ইহাই মনসামূর্তি, এরই সামনে রোজ পূজা হয়। রাঢ় অঞ্চলে মনসার ঘটের লোকপ্রসিদ্ধ নাম ' বারা ' 'বারি' । গ্রামের মনসাতলায় মনসাদেবীর যে পূজা হয়, সেখানে কোন মূর্তি স্থাপন করা হয় না। মনসাবৃক্ষে দেবীর অধিষ্ঠান কল্পনা করে ভক্তি কামনা জানানো হয়। নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে মনসার বার্ষিক পূজাও অনেক সময় কোনও রূপ মূর্তি ছাড়া বাস্তুতলায় মনসা বৃক্ষমূলে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রচলিত অনেক অষ্টনাগের মূর্তির নিচের ভাগ ঘটের মত এবং উপরের ভাগ সর্পাকৃতি, মনে হয় যেন একটি ঘটের ভেতর থেকে আটটি সাপ একত্রে মাথাগুলো বের করত ফণা উদ্যত করে আছে। কোনও মূর্তির তিনটি সাপ থাকে ঘটের বাইরের দিকে, বাকি পাঁচটি থাকে ঘটের মুখে ঢাকনি হিসেবে একত্রে ফণা উদ্যত করার মাধ্যমে। কেউ কেউ আবার অষ্টনাগের পরিবর্তে ঐরূপ উদ্যত ফণা বিয়াল্লিশ

Dhaka University Institutional Repository

নাগমূর্তিরও পূজা করে থাকেন। কেউ আবার দু'টি সর্পফণারও পূজা করেন। সর্পমূর্তি স্থাপন করা হলেও ভক্তি-কামনা কিন্তু জানানো হয় সর্পাধিষ্ঠাত্রী মনসাদেবীকেই। ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে মনসাপূজায় শোলার চালের অঙ্কিত মনসাদেবীর চিত্রমূর্তি, যার আঞ্চলিক নাম ' করণ্ডী ' ব্যবহৃত হয়। এই ' করণ্ডী ' তে শুধু সর্পধৃতা মনসাদেবীর মূর্তিই থাকে না, দেবীর নিচে রং-তুলির সাহায্যে হেঁতালধারী চাঁদ সদাগর, সনকা , বেহুলা-লখিন্দর, কাল নাগিনী ইত্যাদি অঙ্কনের মাধ্যমে মনসামঙ্গলের কাহিনীকে জীবন্ত করে তোলা হয়। কেউ কেউ মনসাদেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি এবং চিত্রমূর্তি (করণ্ডী) ছাড়াও ' কৈতরিঘট ' নামে একটি মূর্তি স্থাপন করেন, যার নিচের ভাগ একটি ঘটের ন্যায় এবং উপরের ভাগ নরমুন্ডের আকৃতি। মনসাপূজার দিন-তারিখ এবং দেবীর মূর্তাদি স্থাপন সম্পর্কে বিভিন্ন বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে নানা মত থাকলেও প্রায় সকল স্থানেই সকলে দু'টি নিয়ম বাধ্যতামূলক ভাবে পালন করে থাকেন - (১) মনসাপূজায় সিজমনসার ডালের ব্যবহার এবং (২) পূজার দিনে সাপের উদ্দেশ্যে দুধ-কলার একটি ভোগ দেওয়া।

রাঢ়ের বীরভূমের সমস্ত লৌকিক সংস্কারের মধ্যে মনসাদেবীর ব্যাপক প্রভাব থাকার প্রেক্ষাপটে ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মনসামঙ্গলের কাহিনীটি বীরভূম থেকে পরিপুষ্টি লাভ করত পূর্ববঙ্গে বিস্তারিত হয়েছিল। মনসামঙ্গলের অন্যতম প্রধান কবি নারায়ণ দেব আত্মপরিচয়ে উল্লেখ করেছেন ঃ

''পূর্ব পুরুষ মোর অতি শুদ্ধ মতি।
রাঢ় ত্যজিয়া মোর বোর গ্রামে বসতি।।''[৭১]

বোর গ্রাম হচ্ছে পূর্ববঙ্গের বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায়। সুকুমার সেন মনে করেন যে, নারায়ণ দেবের পূর্ব পুরুষ রাঢ় থেকে গিয়ে যখন ব্রহ্মপুত্রের তীরে বসবাস করছিলেন তখনই তাঁদের দ্বারা মনসামঙ্গলের কাহিনী পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে আনীত হয় এবং সেখানে কতকটা নতুনভাবে পুনর্গঠিত হয়। এছাড়া, উত্তরবঙ্গে পূর্বে যে মনসার কাহিনী চালু ছিল তার সাথে মিথিলার কাহিনীর বেশি মিল পরিলক্ষিত হয়।[৭২] মনসামঙ্গলের উত্তরবঙ্গ-কামরূপ ধারার দিক্‌পাল কবি তন্ত্রবিভূতির কাব্য সম্পাদনাকালে সম্পাদক ড. আশুতোষ দাস ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন - '' কবি মনকর ও দুর্গাবরের বাণীবয়ন প্রচেষ্টায় যদি উত্তর বঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের সূত্রপাত হইয়া থাকে তবে তন্ত্রবিভূতির বাণীকর্মে তাহার অপূর্ব বিস্তার এবং জগজ্জীবন ও জীবনে তাহার পরিসমাপ্তি।''[৭৩] কামরূপ-কামতা অঞ্চলের বিশিষ্ট মঙ্গলকাব্যকার, প্রাচীনতর দু'কবি মনকর ও দুর্গাবরকে সুকুমার সেন[৭৪] একই কবি মনে করেন এভাবে

Dhaka University Institutional Repository

- নাম মনোহর কর, উপাধি দুর্গাবর (?) ; তা না হলে সম্ভবত দুর্গাবর মনকরের অনুকরণকারী। কেননা উভয়ের রচনার মধ্যে বেশ মিল রয়েছে। যেমন, উভয়ের রচনাতেই মনসাকে বলা হয়েছে - ' পোঞা ' (পদ্মা শব্দের তদ্ভব রূপ যা বিষ্ণু পালের কাব্য ভিন্ন অন্য কোথাও পাওয়া যায় না), ' বাহুড়া (বাহুরা) ব্রাহ্মণী', ' তোতোলা ' (তন্ত্রবিভূতির রচনায় ' তোতলা' পাওয়া যায়), ' দিগম্বরী', 'মানসাই' ইত্যাদি। মনকরের '' পৌঞার পান্থালি'' এবং দুর্গাবরের '' পোঞা বেহুলী মঙ্গল'' উভয়টিরই অংশবিশষ আবিষ্কৃত হয়েছে যার (যেগুলোর) রচনাকাল মোটামুটি খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতক।[৭৫] মনসামঙ্গলকাব্যধারার কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্যধর্মী এর (এদের) কাহিনী (সমূহ)[৭৬] নিম্নে উদ্ধৃত হল ঃ

প্রথমে মনকর-অংশ। সর্ব প্রথমে বন্দনা, এর পরে মণ্ডপ-জাগানো, অর্থাৎ কল্পনায় মন্দির তৈরি এবং পূজার আয়োজনাদি।

প্রথমে জাগোক সে মণ্ডপ চারি পায়া
তিনি গোট মাণ্ডলি জাগোক সারি সারি করা।
চৌচাল চাটনি জাগোক জাগোক চায়নি
আঁড়ে গজ মাটি জাগোক পূজিবো ব্রাহ্মণী।

* * * * *

গীতালোর কণ্ঠে হাতে জাগোক এ তাল চামর
পোঞা সুপ্রসন্নে গীত গায় মনকর।

অতঃপর সৃষ্টিকথা। সংসার-পত্তনের উদ্দেশ্যে গোঁসাই একজোড়া পাখি সৃষ্টি করে তাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করার নির্দেশ দিলেন। বেঙ্গমা-বেঙ্গমী নামক পাখিজোড়া একথা শুনে ইতস্তত করতে লাগল। (অনেকটা ঋগবেদের সূক্তের যমের মতো) বেঙ্গমা কানে হাত দিয়ে বলল, '' এ কথা শুনিতেও পাপ হয়, - কে কোথায় শুনিয়াছে যে ভাই বোনকে বিবাহ করে ?'' তখন গোঁসাই বেঙ্গমা - বেঙ্গমীকে উড়িয়ে দিলেন। দু'জনে সাগরে দু'দিকে চলে গেল - বেঙ্গমা উজানে , বেঙ্গমী ভাটিতে । উজানে গিয়ে বেঙ্গমা প্রচুর শামুক-শেওলা দেখতে পেয়ে ভক্ষণ করতে লাগল, কিন্তু ভাটিতে বেঙ্গমী কোন '' আধার'' পেল না। এদিকে প্রচুর শামুক-শেওলা খাওয়ার ফলে বেঙ্গমার কাম-ভাব জাগায় তার বিন্দুপাত হল। সে বিন্দু সাগরে পড়ে ভেসে চলল। বেঙ্গমী সেটাকে আধার মনে করে খেয়ে ফেলল। এতে তার গর্ভসঞ্চার হল। অতঃপর দু'জনেই গোঁসাইয়ের কাছে ফিরে এল। গোঁসাই তাদেরকে স্বাগত

Dhaka University Institutional Repository

জানিয়ে বললেন, '' বাছা, তখন বিবাহ করিতে চাহ নাই, এখন কেন গর্ভসঞ্চার দেখিতেছি।'' এখন দু'জনেই বিবাহে রাজি হল। কালে কালে বেঙ্গমী তিনটি ডিম প্রসব করল । গোঁসাই একে একে তিনটি ডিমই ভেঙ্গে ফেললেন।

প্রথম ডিমা গোঁসাই ভাঙ্গিয়া যে চাইলা
জীবজন্তু গোঁসাই তাত লাগ না পাইলা।
দোয়াজের ডিমা গোট ভাঙ্গিয়া জে চাইল
হিরিণ তিরিণ গোঁসাই তাত লাগ পাইল।
ত্রিতরয় ডিমা গোট ভাঙ্গিয়া যে চাইল।
জতেক পৃথিবীর শস্য তাত লাগ পাইল।
বারে বারে শস্য উপজিল আর দুর্বা ধান
এহি মতে পাতিলেক সৃষ্টির পত্তন।

সন্দেহ নেই, কাহিনীটি অভিনব, যা কেবল মনকরের কাব্যেই পাওয়া যাচ্ছে ।

এরপর অনেকটা ধর্মঠাকুরের আখ্যায়িকার ন্যায় ত্রিদেবার তপস্যা-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে । জলে ভাসমান ধর্মের মৃতদেহকে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু চিনতে ব্যর্থ হলেন। শিবই পিতা অনাদি ধর্মের মৃতদেহকে চিনতে পেরে জল থেকে তুলে শবের মুখে শাঁখের জল দিলেন। তখন অনাদি চেতন পেয়ে শিবকে বললেন, ''বাছা, হাঁ কর, তোমার পেটে ঢুকি।''

মুখ মেল পুতা তোর গর্ভে লঞো বাস।

অনাদি ধর্ম পুত্র শিবের গর্ভে স্থান নেওয়ার সময় তাঁর হাতে গঙ্গা ও দুর্গাকে তুলে দিয়ে তাদের প্রতিপালন করতে বললেন। গঙ্গাকে বিয়ে করে শিব শিরোধার্য করলেন এবং দুর্গাকে লোহার মঞ্জুষায় ভরে সাগরের জলে ভাসিয়ে দিলেন। এদিকে সাগরের তীরে তপস্যারত হেমন্ত ঋষির কোলে এসে ঠেকল সেই লোহার মঞ্জুষাখানি। তিনি সেটা খুলে দেখলেন একটি নবজাত কন্যা রয়েছে। রামায়ণের জনক রাজার সীতা-প্রাপ্তির মতো কন্যা পেয়ে হেমন্ত ঋষি বাড়ি এসে স্ত্রীর কাছে দিলেন। যথাসময়ে প্রচার করা হল হেমন্তের স্ত্রী কন্যা প্রসব করেছেন। কন্যার নাম দুর্গা।

ইতোমধ্যে শিব বিশ্বকর্মাকে দিয়ে ' বাসুয়া ' বা বৃষভ নির্মাণ করিয়ে তাতে প্রাণসঞ্চার করলেন । তারপর সোনার লাঙ্গল গড়িয়ে সুন্দরভাবে জমি প্রস্তুত করত গঙ্গার সাহায্যে পুষ্পোদ্যান রচনা

Dhaka University Institutional Repository

করলেন। এই পুষ্পোদ্যান তথা মালঞ্চে দুর্গাকে আনিয়ে তাঁকে হরণ করার ইচ্ছে জাগল শিবের মনে। নারদকে দিয়ে খড়ি পাতিয়ে শিব দুর্গার সন্ধান জেনে নিলেন। ওদিকে দেবতারাও দুর্গাকে শিবের মালঞ্চে ফুল তোলার জন্য যেতে অনুরোধ করলেন । দুর্গার বাবা-মায়ের সম্মতি না থাকলেও জেদের বশেই তিনি বিচিত্র বেশে শিবের মালঞ্চে গিয়ে পৌঁছলেন। ক্লান্তি জনিত নিদ্রাকালে অশোক গাছের তলায় শিব দুর্গা দেবীকে আলিঙ্গন করলেন। নিদ্রাভঙ্গে দেবী কেঁদে উঠলে শিব তাকে আশ্বাসের সুরে বাড়ি গিয়ে ফুল তোলার কারণে বেশ-বাস বিপর্যস্ত হওয়ার কথা বলতে বললেন। এ দিকে নারদ গিয়ে গঙ্গাকে খবর জানালেন,

হেমন্তর ঝিউ দুর্গা গেল ফুল-ধাড়ি
তার সঙ্গে মমাই যে খেলায়ে ধেমালি।

এ খবর শুনে দুঃখিত হয়ে গঙ্গা বেশ কিছুক্ষণ কাঁদলেন। এরপর তাঁর দু'পুত্র-ভাঙ্গুর ও মহানন্দকে ডেকে বললেন, " বাছা, তোমরা নৌকা লইয়া নদীতীরে যাও আর ফুল লইয়া যে মালিনী আসিতেছে তাহাকে ডুবাইয়া মার।" দু'ভাই মায়ের কথা রাখতে মাঝ-নদীতে ঢেউ জাগিয়ে তারা জলে ঝাঁপ দিল এই ভেবে যে, নৌকাসহ দুর্গা ডুবে মরবেন। কিন্তু তা হ'ল না।

পান্ধ হাতে বাহে নায় পান্ধে সিন্ধে পানি
আপুনি কাণ্ডার ভৈলা হেমন্তনন্দিনী।
বায়ুবেগে দেবীয়ে নদীয়ে ভৈলা পার
আঙ্গুলি দেখায় পুতা মোচারিবো ঘার।

কাঁদতে কাঁদতে দু'ভাই ঘরে ফিরে এল এবং গঙ্গামাকে দুর্গাকে ডুবানোর ব্যর্থতার কথা জানাল। এ কথা শুনে গঙ্গার স্থির প্রত্যয় হল যে তার সতীনের আগমন অবশ্যম্ভাবী।

এ দিকে দুর্গা পিতৃগৃহে ফিরে এলেন। হেমন্ত ঋষি মেয়ের সাফাই না মেনে তার সতীত্বের পরীক্ষা নিয়ে ঘরে তুললেন । এরপর একদিন শিব হেমন্তের ঘরে ভিক্ষা করতে এসে দুর্গাকে যাচঞা করলেন। নিঃস্ব কাবাড়ির কাছে কন্যাদানে হেমন্ত রাজি হলেন না। শিব তখন গঙ্গাকে নাছোড়বান্দার ন্যায় ধরে বসলেন। গঙ্গা উপায়ন্তর না দেখে ভার দিলেন নারদের উপর । অতঃপর যথারীতি শিব-দুর্গার বিবাহ সুস্পন্ন হল।

Dhaka University Institutional Repository

গঙ্গা ও দুর্গাকে নিয়ে শিব ঘর করছেন । একদিন ' ফুলধাড়ি ' যেতে অর্থাৎ পূরবনে গিয়ে ফুল তোলার ইচ্ছে জাগল শিবের মনে। একথা শুনে গঙ্গা দুর্গা উভয়েই নিষেধ করলেন এবং বললেন, ''যত ফুল চাও এখানে আনিয়া দিব।'' কিন্তু শিব তাঁদের বাধা না মেনে ফুল তুলতে রওয়ানা হলেন। পথে দুর্গা কোঁচনী-বেশে তাঁকে ছলনা করলেন। ফুলের বনে মনসার জন্ম হল। যথাসময়ে পিতা শিবের সঙ্গে মনসার পরিচয় হল। মনসা শিবের সঙ্গে বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলে শিব প্রথমে রাজি না হলেও পরে মনসার পীড়াপীড়িতে তাঁকে রাজি হতে হল। মনসা মাছি রূপে ফুলের সাজির মধ্যে লুকিয়ে রইলেন। এদিকে ফুলের সাজি দেখে দুর্গার সন্দেহ হল।

এখান থেকে মনকরের অংশ খণ্ডিত। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য মনসামঙ্গলে যেমন এখানেও তেমনি সৃষ্টিকথার পরে শিব-পার্বতীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে (নারায়ণ দেব প্রভৃতির কাব্যে এটি ' কালিকা পুরাণ ' নামে পৃথক ভাবে পাওয়া যায়)। এরপর দুর্গাবরের অংশ। গঙ্গার পূর্বতীরস্থ চম্পায়লী নগরীতে চাঁদো সদাগর ও তার পত্নী সোনেকার মনে সুখ নেই সংসারে কোন সন্তান না থাকায়। একদিন বর্ষাকালে উত্তর দেশ থেকে ধন্বন্তরি ওঝা এসে চাঁদোর বাড়ি এলে সংবাদ শুনে সোনেকা বের হয়ে এলেন। ধন্বন্তরি তাকে দেবী মনসার পূজা করার কথা বললেন। এ মনসা সলিলদেবী, যেন গঙ্গাই । ধন্বন্তরির উপদেশ মত সোনেকা ঘটপূজা করে গঙ্গাজলে নামলেন। দু'ছাগল বলি এবং সোনার ফুল ফেলে দেওয়ার পর তিনি তিন ডুব দিলেন - প্রথম ডুব ধর্মের নামে, দ্বিতীয় ডুব কূর্মের নামে এবং তৃতীয় ডুব মনসার নামে। কিন্তু

সাতঘটি বেলা ভৈলা দেয়াজ প্রহর
তথাপি তো সাধুয়ানী না পাইলন্ত বর।

বর না পেয়ে হতাশায় সোনেকা ভগিনী সুগন্ধিকে ডেকে কাটারি আনতে বললেন - গঙ্গার উপরে তিনি স্ত্রীহত্যার পাপ অর্জন করবেন। একথা শুনে ডাঙ্গুর ও মহানন্দ ত্বড়িৎগতিতে মাকে (গঙ্গাকে) খবর দিল। তখন গঙ্গা চৌষট্টি যোগিনী সহ মকরে আরোহণ করে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং সোনেকাকে ছয়টি আমলকি দিয়ে বললেন, '' এই ছয়টি খাইলে তোমার ছয় পুত্র হইবে।''

গঙ্গার নির্দেশমত সোনেকা কাজ করলে যথাসময়ে একে একে ছয় পুত্র জন্ম নিল - নীলপাণি, শূলপাণি, গদাপাণি, চক্রপাণি, হলধর ও সূর্যাই। যৌবনে পদার্পণ করলে ছ'পুত্রকে বিবাহ দেওয়া হল ; পুত্রবধূরা হল - সুরক্ষা , তিলোত্তমা, সত্যবতী, ধনমালা, হৃদয়া ও জয়ন্তাই। পুত্রদের বিবাহে অনেক খরচ হয়েছে বিধায় চাঁদ সদাগর বাণিজ্যে যাওয়ার উদ্যোগী হলেন। পুরনো নৌকাসমূহ ভেঙ্গে যাওয়ায় নূতন নৌকা

Dhaka University Institutional Repository

গড়ানো হল। দ্রব্যাদি ভরে যাত্রার আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। 'বুহিত' (নৌকা) পূজা করতে মাগুর মাছের দরকার। মাছ আনতে সোনেকা কেওটনী সরদাইয়ের বাড়িতে গিয়ে দেখতে পেলেন সরদাই ছয় বউকে নিয়ে -

পদুমাইকে পূজে পূর্ণ এ ঘন্ট পাতিয়া ।

জিজ্ঞেস করে এ পূজার ফল জানা গেল - অন্ধ চক্ষু পায়, ঘরে ধন ভরে, অপুত্রার পুত্র জন্মে, বন্দী মুক্ত হয় ।

বরিষেক অন্তরে বরিষা সময়ত
চারিদিন পূজিবেক শ্রাবণ মাসত।
দুই সংক্রান্তির দুই পঞ্চমী পূজিবা
পুদুসাই সুপ্রসন্নে সুখত থাকিবা।

সোনেকা পদুমা (পদ্মা) পূজা করতে এতটাই আগ্রহী হয়ে উঠলেন যে, চাঁদো সদাগরের নৌকা বন্দর ত্যাগ করার সাথে সাথেই তিনি বিষহরী পদুমা পূজায় বসে পড়লেন, ছয় বধূ মঙ্গল গাইতে লাগল। ইতোমধ্যে চাঁদো নৌকা থামিয়ে ধনাই ভাণ্ডারিকে দুটো জিনিস আনতে বাড়িতে পাঠিয়েছেন। ধনাই গিয়ে চাঁদোর কাছে পূজার সংবাদ জানাল। এ কথা শুনে চাঁদো তৎক্ষণাৎ এসে পূজার আয়োজন নষ্ট করে দিয়ে পরে তিনি নৌকায় যাত্রা করেন।

এরপর কাহিনী মোটামুটি প্রচলিত ভাবেই অগ্রসর হয়েছে।

মনসা মঙ্গলের উত্তরবঙ্গীয় ধারার আদর্শরূপ হচ্ছে তন্ত্রবিভূতির কাব্যখানি। তাই তন্ত্রবিভূতি-বর্ণিত কাহিনীর[৭৭] বিবরণ দেওয়াটা অত্যাবশ্যক।

যথারীতি বন্দনা দিয়ে কাব্যের শুরু। একসময় ধর্মপূজার কথা শিব ভুলে গিয়েছিলেন। একদিন হঠাৎ সে কথা মনে পড়ায় তিনি মানসসরোবরে গেলেন ফুল তুলতে। একে উপলক্ষ করেই ফুলের বনে মনসার উৎপত্তি ঘটে । শিবের বিন্দু মাংসপিণ্ড হয়ে পাতালের রাজা বাসুকির মাথায় গিয়ে পড়ল। বাসুকি তাতে জল ছিটিয়ে দিলে মাংসপিণ্ড মনসার আকৃতি পেল। চতুর্ভুজ শরীর , সর্পভূষণ, হংস-বাহন দেখে বাসুকি মনসাকে স্তব করত আগমন পথ (পদ্মনাল পথ) দিয়েই পুনরায় উপরে গিয়ে পিতার সাথে সাক্ষাৎ করতে বলল। মানসসরোবরে ভেসে উঠে দেবী পদ্মপত্রে আসন গ্রহণ করলেন । পিতা শিবের

Dhaka University Institutional Repository

সাথে তাঁর সাক্ষাৎ তথা পরিচয় ঘটল। মনসা তাঁর সাথে যেতে চাইলে শিব নিষেধ করলেন । কিন্তু মনসা নিষেধ না শোনায় শিব তাঁকে ফুলের সাজির মধ্যে এনে লুকিয়ে রাখলেন। এতে দুর্গার সন্দেহ হল। শিবের অগোচরে তিনি ফুলের সাজি খুঁজে বের করলেন এবং একটি একটি করে ফুল নিক্তিতে ওজন করে দেখতে লাগলেন। হালকা হলে তুলে রাখতে লাগলেন এবং ভারি হলে আগুনে ফেলে দিতে লাগলেন। ফলে মনসার পক্ষে আর লুকিয়ে থাকা সম্ভব হল না। তাই মনসা পাঁচ বছরের মেয়ে হয়ে মা মা বলে দুর্গা (পার্বতী)-কে সম্বোধন করলেন। এরপর শুরু হল ঝগড়া ও মারামারি। মনসার সাপ দুর্গাকে দংশন করল। শিব এসে ব্রহ্মজ্ঞান জপে দুর্গাকে বাঁচালেন। মনসাকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে দুর্গা জেদ করতে থাকলে শিব মনসাকে কোলে নিয়ে নির্বাসন দিতে চললেন। তাঁর চিন্তা - কোথায় কন্যা মনসাকে রাখা যায়। প্রথমে তিনি গেলেন ব্রাহ্মণের ঘরে, সেখানে দেখলেন দেবী (দুর্গা) গন্ধেশ্বরী রূপে আছেন। অন্য ঘরে গিয়েও দেখলেন দুর্গার প্রতিবন্ধকতা । অবশেষে উপায়ন্তর না দেখে শিব মনসাকে নিদ্রিতাবস্থায় বনে রেখে এলেন।

ঘুম ভাঙ্গার পর মনসা দেখলেন - পিতা পলাতক। গাছের তলায় বসে মনসা কাঁদছেন, এমন সময় একদল রাখাল গরু তাড়িয়ে ঘরে ফিরছিল। তারা মনসাকে আক্রমণ করার পর মনসার সাপের তাড়া খেয়ে সকলে পালাল, কিন্তু কুব্জ একজন পালাতে ব্যর্থ হল। মনসার কথায় কুব্জ বটপাতায় দুধ দোহন করে দিল। দুধ খেয়ে মনসা তাকে বর দিলেন। ফলে তার কুঁজ ভালো হয়ে গেল। তখন অন্য সব রাখাল ছুটে এসে মনসার কাছে রাজা চাইল। মনসা তাদেরকে উপদেশ দিলেন অম্বুবাচীতে তাঁর পূজা করার। মনসার উপদেশমত রাখালরা তাঁকে পূজা করে ধন্য হল।

চন্দন গাছের তলায় মনসা বসে আছেন। তপস্যার্থে গমনরত ব্রহ্মা সেখানে উপস্থিত হলেন। মনসাও তখনি তাঁর সঙ্গ ধরলেন। সাগরতীরে পৌঁছে ব্রহ্মা সাগরকে পার হবার উপায় করে দিতে বললেন। তখন সাগর আধ হাঁটু জল করে দিল। সাগর পার হবার জন্যে ব্রহ্মা ও মনসা জলে নামলেন। হাঁটুর উপর কাপড় তুলে চলার সময় হঠাৎ ঝড়ে মনসার বস্ত্র স্থানচ্যুত হল। পিছনে তাকাতেই ব্রহ্মার দৃষ্টি মনসার শরীরে পড়ায় তাঁর বিন্দুপাত হল। সেই বিন্দু ভেসে গিয়ে মনসা বা পদ্মার উদরে ঢুকল। মনসা তা সহ্য করতে না পেরে -

জাঙ্গ চিরিঞা দেবী করিল বিন্দুপাত
বিষের জন্ম হইল ব্রহ্মার সাক্ষাৎ ।

Dhaka University Institutional Repository

বিষের জন্ম হবার পর তা ব্যাপ্ত হয়ে গাছপালা শস্যাদি নষ্ট করার উপক্রম করছে দেখে ব্রহ্মা -

কুম্ভারের রূপে মাটির নান্দিয়া গড়িল
নান্দিয়ার মধ্যে ব্রহ্মা বিষ সম্বরিল।
নান্দিয়াতে ভরাইল বিষ যে সকল
তন্ত্রবিভূতি গায় মনসামঙ্গল।

ঢাকন দিয়ে এঁটে সে নাদা (নান্দিয়া) সপ্তসাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হল। একটি বোয়াল মাছ তা গলাধঃকরণ করে বিপদে পড়ল। তখন সাগর ব্রহ্মার কাছে মাছকে এনে উপস্থিত করল। ব্রহ্মা মাছের পেট থেকে নাদা বের করে নিয়ে তাকে বললেন -

তোর জন্ম হউক গিঞা ধুবির পাটের তল।
ধরার পাটের তলে থাকব পড়িঞা
গিরস্তের বহু বেটী লঞা যাইবে ধরিয়া ।

এরপর ব্রহ্মা সপ্তপাতালে বিষ পাঠিয়ে দিলেন ।

ইন্দ্রের মালিনী ব্রহ্মার শাপে কপিলা গাভী হয়ে মর্তে জন্ম নিয়েছে। তার বৎস মনোরথ। কপিলা-মনোরথের কাহিনী গতানুগতিক। সাগর-মন্থন কাহিনীও অনেকটা তাই । শেষ-মন্থনে পূর্বোক্ত বিষের নাদা উঠে এলে শিব তা থেকে এক বিন্দু পান করে মৃতবৎ পড়ে রইলেন। তখন গঙ্গার কথায় দুর্গা নারদকে পদ্মার কাছে পাঠালেন। ইতোমধ্যে পদ্মা ' সিয়লি' পর্বতে 'মেঢ' নির্মাণ করে বসতি স্থাপন করেছেন। নারদ এসে পদ্মাকে বললেন, '' সত্তরে চলহ বহিন ডঙ্কদন্ড লইয়া।'' মনসা সব কথা শুনে বললেন, '' আমি সাধ করিয়াছি দুর্গার কোলে চাপিয়া যাইব।'' অগত্যা দুর্গাকে রাজি হতে হল। যেতে খেতে মনসা দুর্গার কোলে একবার ভর দিলেন, তাতে '' দুর্গার কাঁকালি হইল বেঁকা।'' এরপর সাগরতীরে পৌঁছে মনসা শিবকে ঝাড়তে লাগলেন।

শঙ্খ জল দিয়া দেবী চিয়ায় শঙ্কর।
মূলমন্ত্র পঢ়ে দেবী ধিয়ান করিয়া
অষ্ট মন্ত্রে অষ্ট গরুড় দিল সমর্পিয়া।
বাজে শঙ্খধ্বনি আর ফুকারে কাহাল
দক্ষিণে বিশাল কাঢ়া বামে করতাল।

Dhaka University Institutional Repository

বিষ নাহিক গায়ে সমাধি করিয়া
আদি মন্ত্র পাঞা শিব উঠিল বসিঞা।

শিব উঠে বসে কন্যা মনসাকে বিরস বদনে দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন , '' কি চাই ? '' মনসা তখন বললেন, '' দেবতারূপে গণ্য হইবার জন্য আমার কিছু সাজসরঞ্জাম চাই।''

ঘটক ডম্বুর চাহে (আর) লাউয়া লাঠি
দশ সারা সিন্দূর চাহে আর ঘট দুটি।
শিব কন্যার কাঙ্ক্ষিত সব দিলেন ।

এরপর মনসা যখন বেশ-বাস পরিধান করছেন তখন তিনি কিছুক্ষণের জন্যে উলঙ্গ হয়েছিলেন। তা দেখে দুর্গা ও নারদ অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে মনসাকে গালমন্দ করতে লাগলেন। এতে মনসা কোপ করে পিতা শিবের উপর বিষ চড়িয়ে দিলে শিব আবার ঢলে পড়লেন। দেবতাদের সম্মিলিত অনুরোধে মনসাকে আবার শিবকে বাঁচাতে হল। নারদ বুঝতে পারলেন, এ মেয়েকে অবিবাহিত রাখা উচিত হচ্ছে না । তাই মানসসরোবরে তপস্যানিরত 'জরৎকার' মুনির সঙ্গে ধরে-বেঁধে মনসাকে বিয়ে দেওয়া হল। নেতো মনসার 'সখী' হিসেবে তাঁর সঙ্গে গেল। এদিকে বর্ষাকালে নালার জলে মনসাকে চেঙ্গ - বেঙ্গ খেতে দেখে মুনির ভয় হল। মনসার পেটে হাত বুলিয়ে পুত্রলাভের বর দিয়ে মুনি স্বস্থানে চলে গেলেন। পুত্র আস্তীকের জন্ম হল যথাসময়ে। স্বামীপরিত্যক্তা কন্যা মনসাকে শিব সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, '' তোমার পূজা মর্ত্যলোকে সবাই করিবে।''

জ্যৈষ্ঠমাস দশহরা অম্বুবাচী দিনে
মনসা পঞ্চমী লোকে করিবে পূজনে।

দেবীরূপে মনসার প্রথম ' পাত্র' (দ্ব্যর্থে পূজাপাত্র এবং পুরোহিত) হলেন আসন -বাসন।

বাসনের বোলে তুষ্ট ব্রাহ্মণী তোতল।
প্রথম পাত্র আইল দেবীর আসন - বাসন।

আসন - বাসনের পরামর্শে দেবী কলিতে পূজা প্রচারার্থে চাম্পালির চন্দ্রপতি সদাগরকে বেছে নিলেন। আবাল্য শিবের ভক্ত চন্দ্রপতি শিবের বরে '' ধনে বংশে বাড়ে বালা চাম্পালি ভুবনে।'' শিব মনসাকে সঙ্গে নিয়ে কৈলাস থেকে চন্দ্রপতি ওরফে চাঁদোর দ্বারে এসে বললেন, '' ডাক মোর বড় পুত্র চান্দো সদাগরে''। শিবের কথাতেও চাঁদো বা চাঁদ মনসাকে পূজিতে সম্মত হলেন না । শিব চলে যাবার পর মনসা এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকলেন।

Dhaka University Institutional Repository

জালুমালু দুই ভাই বিলে মৎস্য মারে
বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী - রূপে মাতা গেলা নদী তীরে।

* * * * *

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী রূপ দূরে তিয়াগিয়া
ষোড়শ্যা কুমারী রূপ ধারণ করিয়া ।

জালু-মালু দু'ভাইকে মাছ মারতে দেখে ষোড়শীর রূপে মনসাদেবী তাদের কাছে গিয়ে বললেন, '' আমাকে পার করিয়া দাও।'' জালু-মালু শুনে বলল, '' খালি হাতে তোমাকে আমি পার না করিব''। পার হতে হলে নয় বুড়ি কড়ি পারানি লাগবে । দেবী তখন বললেন, '' আমি বামুনের মেয়ে টাকাকড়ি কোথায় পাইব।''

ওষ্ঠ লাঙ্গল ব্রাহ্মণের জিহ্বা গোট্ট ফাল
ভিক্ষা করিয়া আমরা খাই সর্বকাল।

মনসাদেবী তাদের দু'ভাইকে ধনী করে দেওয়ার আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তারা রাজি হলেন। নদীতে সোনার ঘট মিলল, তা পুজে তারা ধনী হল।

চাঁদোর ভৃত্য লেঙ্গার সাথে একদিন হাটে জালুর স্ত্রী হীরার ঝগড়া বাধল। হীরা অপমানিত হয়ে ঘরে ফিরে এসে মনসার কাছে দুঃখের কথা জানাল। ইতোমধ্যে চাঁদোর পত্নী সোনেকা হীরাদের ধন-সম্পদ পাওয়ার কথা শুনে তিনি হীরার কাছ থেকে 'ব্রাহ্মণী তোতল'-এর পূজা শিখে নিলেন। লেঙ্গার '' কাছে সোনেকার মনসা-পূজার কথা ছাপা থাকল না। সে গিয়ে চাঁদোকে জানাল, '' সোনেকা ডাইনপনা শিখিছে বসিয়া ''। একথা শুনে চাঁদো এসে মনসার ঘট লাথি মেরে ফেলে দিলেন। মনসা তখন শাঙ্খিনী সর্পরূপ ধরে দংশন করতে চাইলে নেতোই সাবধান করে দিলেন, '' চান্দোকে সহায় আছে কুলের গন্ধেশ্বরী''। নেতোর কথা উপেক্ষা করত মনসা তাঁর সর্পবাহিনী নিয়ে চাঁদোর ক্ষতি করতে উদ্যত হলে ''হাতে হেমতাল করি'' চাঁদো তাঁদের তাড়িয়ে দিলেন। এরপর নেতো বা নেতার পরামর্শে মনসা চাঁদোর সাথে দাদা' সম্বোধনে আপোষরফা করতে গিয়েও ব্যর্থ হলেন। তখন মনসা জালু,মালু ও সর্পদল নিয়ে চাঁদোর 'লক্ষের বাগান' ধ্বংস করতে গেলেন। চাঁদোর সেনাপতি বাঘা সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাদের পরাজিত করলে মনসা কাতর হয়ে পড়লেন। পরে মনসা মেঘ থেকে বিষবৃষ্টি করানোর ফলে চাঁদোর সৈন্যরা মারা গেল।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু চাঁদোর প্রার্থনায় শিব ধন্বন্তরিকে পাঠিয়ে তাদের বাঁচিয়ে তুললেন। এতে বিষাদিত হয়ে মনসা এসে পিতা শিবকে ধরে বসলেন, চাঁদোকে মানিয়ে দিতে হবে। শিব রাজি হলেন না। তখন বিমাতা চণ্ডী মনসার পক্ষ নিলেন।

এরপর ধন্বন্তরি-বধ আখ্যায়িকা । অতঃপর একে একে চাঁদোর পাঁচ পুত্রের সর্প-দংশনে দেহত্যাগ । মনসার আদেশে তাড়কা রাক্ষসী মৃতদেহগুলো নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে দিল। একমাত্র জীবিত পুত্র কুলপাণিকে সঙ্গে নিয়ে চাঁদো দক্ষিণ-পাটনে বাণিজ্য যাত্রা করলেন। চৌদ্দ ' বুহিত' (ডিঙ্গা) ত্রিবেণীতে পৌঁছলে সেখানে সর্পদংশনে কুলপাণির মৃত্যু হল। তার মৃতদেহ জলে ফেলে দেওয়ার পরে মনসা এটিকেও তাড়কা রাক্ষসীর কাছে জমা রাখলেন।

চাঁদো মনসার ত্রিবেণী-নগর লুট করতে গেলেন। তখন মনসা ভয় পেয়ে জলের তলায় ময়নানগরে পালাতে চাইলে নেতো বাধা দিলেন। নেতোর পরামর্শে মনসা ঝঞ্ঝাবৃষ্টিকে ডাকলেন, নদীতেও বান ডাকালেন। ফলে চাঁদোর চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবে গেল। কৃপাপরবশ হয়ে মনসা চাঁদোর কাছে ফুলের ভেলা পাঠালেও চাঁদো তা প্রত্যাখ্যান করেন। নানা রকম নিগ্রহ ও দুর্গতি ভোগ করে অবশেষে চাঁদোর গৃহে প্রত্যাবর্তন । (উল্লেখ্য , চাঁদোর ডিঙ্গাসমূহ ডুবার সময় থেকে গৃহে পৌঁছানো পর্যন্ত আখ্যান-ভাগটা বিপ্রদাসের বর্ণনার সাথে বহুলাংশে মিলে যায়)।

এরপর লখিন্দর-বেহুলার জন্মবৃত্তান্ত । দেবসভায় সাবিত্রী-সত্যবান (প্রচলিত উষা-অনিরুদ্ধের পরিবর্তে যদিও জগজ্জীবন ঘোষাল ও জীবন মৈত্রে প্রচলিত ধারাই বিদ্যমান) নাচ জুড়ে দিয়েছেন।

সরস্বতী গায়েন হৈলা গণেশ মান্দুলি।
আপনে পার্বতী হৈলা নাট নাট্যেশ্বরী ।

মনসাও নাচ-গান দেখতে শুনতে এসেছেন, কিন্তু দেবসভায় ঠাঁই পাননি ; তাই মনসা " বসিল সিজের ডালে লঞা পাত্র গণে "। এরপর যথারীতি তালভ্রংশ, অভিশাপ ও নরলোকে জন্মগ্রহণ।

লখিন্দরের বিবাহ বয়স হল কিন্তু মা বিবাহ দিতে নারাজ। নেতোর কাছে মনসা লখিন্দরের মায়ের মনোভাব শুনতে পেলেন।

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকার কৈল পুত্রে বিভা নাহি দিব
অবিবাহ থাকিলে বালা নাগে কি করিব।

উপায়ন্তর না দেখে মনসা লখিন্দরের মনে কাম - উদ্দীপনা বিস্তার করলেন। একদিন দেখা গেল লখিন্দর (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যোক্ত কৃষ্ণের অনুকরণে) মামী কৌশল্যাকে ধর্ষণ করল। শুনে চাঁদো লজ্জিত হয়ে পুত্রের বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। ভাবলেন -

মেঢ়-ঘর বান্ধি তাতে রাখিব প্রহরী
ঘরের ভিতরে থুব নেউল -মোউরী।
এইমত একরাত্র জাগিব প্রহরী
কেমনে সাধিবে বাদ কানি বিষহরি।

এরপর থেকে তন্ত্রবিভূতির কাব্যে তেমন উল্লেখযোগ্য স্বতন্ত্রতা পরিলক্ষিত হয়না।

দেখা যাচ্ছে, বিপ্রদাসের মনসাবিজয় কাব্যের মতো ধর্মপূজা প্রসঙ্গ তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। " যাঁহারা মনে করিয়াছেন যে (মনসামঙ্গল) কাব্যে ধর্মঠাকুরের আগমন সমাজের খিড়কী পথ দিয়া হইয়াছে তাঁহারা মনসাপুরাণের ধ্রুব আলোকে নিজেদের পূর্বচিন্ত্য মত পুনর্বিবেচনার পথ - নির্দেশ পাইবেন বলিয়া মনে হয়।"[৭৮] চণ্ডী মঙ্গলের অন্তর্গত শিবদুর্গার কাহিনী অবলম্বনে যেমন পরবর্তী কালের কবিগণ শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যধারার প্রচলন ঘটিয়েছিলেন তেমনি তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণোর অঙ্গীভূত শিব ব্রহ্মাদির ধর্মপূজার প্রসঙ্গ উত্তরকালে ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার উদ্ভাবনে সহায়ক হয়েছিল কিনা সঙ্গত কারণেই এ প্রশ্ন মনে জাগে।[৭৯] শিবের ধর্মপূজা, ব্রহ্মা কর্তৃক ধর্মের আরাধনা, বিশ্বকর্মার ধর্মস্মরণে বহিত্র-নির্মাণ, ধর্মকে স্মরণ করত হবু শ্বশুর চাঁদ সদাগরের ঈপ্সিত লোহার কলাই সিদ্ধকরণ - সঙ্কটে বেহুলার উত্তরণ তন্ত্রবিভূতির কাব্যের প্রভৃতি ধর্মস্মরণ বন্দন প্রসঙ্গ পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় কবি জগজ্জীবন ঘোষালকে তাঁর কাব্যে ধর্মের পল্লবিত কাহিনী সৃষ্টির প্রেরণা জুগিয়েছিল সেটা বলাই বাহুল্য। অবশ্য, জগজ্জীবন মনকরের কাব্য দ্বারাও যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে মনসার বিশেষ সম্পর্কটাই জগজ্জীবন বিশেষ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সুকুমার সেনের মতে - " ঋগ্বেদের যম ও যমী বাংলার লৌকিক পুরাণে ধর্ম ও মনসা।"[৮০] পূর্বেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে-মনসার কাহিনী আদিতে ধর্মঠাকুরের কাহিনীর সাথে জড়িত ছিল। আদাদেব ধর্মঠাকুরের শরীরাংশ

Dhaka University Institutional Repository

থেকে আদ্যদেবী কেতকার উদ্ভব, যেমন হিব্রু পুরানে আদম থেকে হবার উৎপত্তি।[৮১] মনসারই নামান্তর হচ্ছে ' কেতকা' যার স্বীকৃতি মনসামঙ্গল কাহিনীতেও আছে। রাঢ় তথা পশ্চিমবঙ্গীয় ধারার মনসামঙ্গলের তো বটেই সমগ্র মনসামঙ্গল কাব্যধারার উল্লেখযোগ্য কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে উক্ত হয়েছে -

"পদ্মবনে জন্ম হৈল পদুমা কুমারী।
বনের ভিতরে নাম মনসা কুমারী।।
কিআ পাতে জন্ম হৈল কেতুকা সুন্দরী।
উন কোটী নাগের মাতা জয় বিষহরি।।"[৮২]

রাঢ়ের ধারার আরেক তাৎপর্যপূর্ণ কবি বিষ্ণু পালের কাব্যেও মনসার নামান্তর হিসেবে 'কেতকা' (কেউতুকি, কেতুকি, কেতুকা ইত্যাদি) রয়েছে ।

"কেউতুকি চরণ শিরে বন্দে গীত
কবি বিষ্ণু পালে গায় ।।"[৮৩]

বাংলার লৌকিক পুরাণে দেখা যায়-ধর্মঠাকুর ও কেতকার বিয়ে হয়েছিল কিন্তু সংসার করা হয়নি। বিয়ের পর ধর্ম ঠাকুরের বৈরাগ্য উদয় হওয়ায় তিনি সংসার বিরাগী হয়ে তপস্যা করতে চলে যান। এছাড়া ধর্মঠাকুরের কাহিনীতে পাওয়া যায় যে, ধর্মের সন্তান হচ্ছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর।[৮৪] জগজ্জীবন ঘোষাল পৌরাণিক, লৌকিক কাহিনী প্রভৃতি অনুসরণের পরেও নিজের মৌলিকত্ব তথা কবিত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন।

"সৃষ্টিতে মন তবে করিল ধর্ম্ম জ্ঞান।।
* * * * *
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ সৃজিল তিনজন।
তিন পুরুষে করিবে পৃথিবী পালন।[৮৫]

ব্রহ্মা - বিষ্ণু-মহেশ্বরকে সৃজনের পর ধর্মঠাকুর তথা গোসাঞি মনসাকে সৃষ্টি করত পরে তাঁকে বিবাহ করলেন ।

"না দেখি পুত্রের মুখ ধর্ম্ম হৈলা মনদুখ
তেজিলন্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাসে।

Dhaka University Institutional Repository

নিঃশ্বাসত নিঃসরিল মনসার জন্ম হৈল
বসিলা উঠিয়া বামপাশে।।"[৮৬]

"গোসাঞি মনসায়ে বিভা ত্রিভুবনে জানি।
দেবাসুর নর তবে করে জয়ধ্বনি।"[৮৭]

এরপর ধর্মঠাকুরের সংসার বৈরাগ্য আসায় স্ত্রী মনসাকে ত্যাগ করার পাশাপাশি মরণের উপায় খুঁজতে থাকেন।

"তেজিয়া মনসা সতী সৃষ্টির অধিপতি
করে প্রভু মরণ উপায়।।"[৮৮]

ধর্ম দেহত্যাগ করে কনিষ্ঠ পুত্র শিবের দেহে আশ্রয় নিলেন।

"ধর্ম্ম বোলে শুন বাপু মিথ্যা কথা নয়।।
তুমি আমি অর্দ্ধ অঙ্গ হইব শূলপাণি।
মনসা - কামিনী হবে তোমার ঘরণী।।"[৮৯]

এদিকে শিবের কাছে ধর্মের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে মনসাদেবী বিলাপ সহকারে কান্না জুড়ে দিলেন। অতঃপর শিবের প্রবোধ বাক্যে মনসা শোক সংবরণ করত স্বামীর অনুমৃতা হওয়ার অভিলাষ জ্ঞাপন করে তিনি শিবকে চিতা সাজাতে বললেন। স্নানশেষে ধর্মের স্তুতি করে মনসা ব্রহ্মা -বিষ্ণু-মহেশ্বর রচিত চিতাগ্নি শয্যায় শ্যায় নিজেকে আহুতি দিলেন। কিন্তু চিতাগ্নি মধ্যে এক শিশুকন্যার উদ্ভব হল। অগ্নিসম্ভবা শিশুকন্যা মৃত ধর্মের অনুমৃতা নবজন্ম লাভকারী মনসা।

" স্নান করি মনসা সুন্দরী মহামতী ।
জোড় হস্ত করিয়া ধর্ম্মকে করে স্তুতি।।
চিতা প্রদক্ষিণ দেবী করে সাত বার।
চিতাত শুতিলা মনে ভাবিয়া অসার।।
চারিদিগে তিন ভাই ভেজায় আগুনি।
আনলে পুড়িয়া মরে মনসা-কামিনী।।

Dhaka University Institutional Repository

আনলের মধ্যে হইল শিশু কন্যা খানি।
জনম হইল কন্যা শিবের গৃহিণী।।
* * * * *
আনলের মধ্যে মনসা পাইল জন্ম।।''[৯০]

অতঃপর ব্রহ্মার যুক্তি অনুসারে লোহার পিঞ্জরে শিশুকন্যাকে আবদ্ধ করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হল। লৌহ পিঞ্জরাবদ্ধ কন্যা ভাসতে ভাসতে সাগর তীরে তপস্যারত হেমন্তঋষির কাছে এসে পৌঁছল। এরপরের ঘটনা অনেকটা কবি মনকরের কাহিনীর মতো। উত্তরবঙ্গ-কামরূপ ধারার মনসামঙ্গল এদিক থেকে পূর্ববঙ্গ তো বটেই এমনকি পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ়ের ধারা থেকেও বৈচিত্র্য ধর্মী সেটা সহজেই চোখে পড়ে।

ধর্মের স্ত্রী মনসা - এই পৌরাণিক তথা লৌকিক পরিকল্পনা রাঢ়ের জনজীবনে দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই তো সেখানে প্রায় ক্ষেত্রেই ধর্মঠাকুর ও মনসাকে পাশাপাশি বিরাজ করতে দেখা যায়। প্রাচীন মিশরের শস্যদেবতা ওসাইরিস (Osiris) এবং তাঁর ভগিনী ও স্ত্রী আইসিস (Isis) এর পূজানুষ্ঠানের সাথে ধর্মঠাকুর ও মনসার যথেষ্ট মিল রয়েছে।[৯১] ধর্মের কামিন্যা (পত্নী) মনসা হওয়ার কারণে রাঢ় অঞ্চলে অন্যান্য দেবীদেরও ধর্মকামিন্যায় রূপান্তরিত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু ''উত্তরবঙ্গের ধর্ম্মঠাকুরের কাহিনীর সঙ্গে রাঢ়ের কাব্য-কাহিনীর সংযোগ সাধন পুথিপ্রমাণ অভাবে দুঃসাধ্য।''[৯২] অবশ্য একথা সত্য যে, '' রাঢ়ে প্রচলিত মনসামঙ্গলের সঙ্গে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত মনসামঙ্গলের যে ঐক্য আছে, উত্তরবঙ্গের সঙ্গে তাহাদের কাহারও সেই ঐক্য নাই।''[৯৩]

মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে - মনসামঙ্গল কাব্যধারার আদি কবিদের মধ্যে বিশেষ করে চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে বিপ্রদাস পিপলাই অন্যতম। সে হিসেবে অখন্ডিত ও অচ্ছিন্ন রূপে প্রাপ্ত রচনা তাঁরটাই হচ্ছে প্রাচীনতম। তাছাড়া রাঢ় তথা পশ্চিমবঙ্গের ধারার প্রাচীনতম কাব্য হিসেবেও বিপ্রদাসের কাব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সংক্ষেপে কাহিনীটি[৯৪] নিম্নরূপঃ

যথারীতি বন্দনা (গণেশ, ধর্ম, নারায়ণ ইত্যাদি)-পর্ব শেষে সৃষ্টিকথা দিয়ে গ্রন্থের আরম্ভ। দেবতারা জন্ম নিল, অসুরেরা জন্ম নিল, তারা শিবের উপাসক হল।

Dhaka University Institutional Repository

চণ্ডীরূপা হইলা ক্রোধে দেব নারায়ণ
মায়াযুদ্ধে দুষ্ট দৈত্য কৈলা নিবারণ।

দৈত্যবধে আনন্দিত হয়ে দেবগণ 'দৈত্যসুই ' (দৈত্যসূয়) মহাযজ্ঞ আরম্ভ করলেন। যজ্ঞে রন্ধন-কার্যের জন্যে দেবতারা গঙ্গাকে নিযুক্ত করলেন। স্বামী শান্তনুর কাছ থেকে শিব গঙ্গাকে নিয়ে এলেন এই শর্তে যে, যজ্ঞশালায় গঙ্গার রাত কাটানো চলবে না। কাজে - কর্মে দেরি হওয়াতে গঙ্গা আর সে রাত্রে স্বামীর আশ্রয়ে ফিরে যেতে পারলেন না। সকালে শিব গঙ্গাকে নিয়ে শান্তনুর কাছে গেলে তিনি স্ত্রীকে ঘরে স্থান দিলেন না। উপায়ন্তর না দেখে শিব নিজের ঘরেই গঙ্গাকে উঠালেন। শিব সে সময় পিতা ধর্মের দেখা পাবার জন্যে বল্লুকার তীরে বারো বছর যাবৎ কঠোর তপস্যা করে যাচ্ছিলেন।
অতঃপর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ধর্ম একদিন পুত্র শিবকে দেখা দিতে চললেন,

ধবল ছত্র ধরি শিরে দণ্ড কমণ্ডলু করে
উলূকে করিয়া আরোহণ।

ঘরের কাছে এসে ধর্ম শিবকে ডাক দিলেন । শিব তখন ঘরে ছিলেন না। মধুর ডাক শুনে গঙ্গা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ধর্মকে ক্ষণিকের জন্যে দেখতে পেলেন। গঙ্গাকে দেখেই ধর্ম অদৃশ্য হয়ে রথে ভর করলেন। কেবল তার মুখের উপর ধর্মের দৃষ্টি পড়েছিল, ফলে গঙ্গা ধবলমুখী হয়ে গেলেন। গঙ্গার স্তবে প্রীত হয়ে অন্তরীক্ষে থেকে ধর্ম স্বীয় পরিচয় প্রদান পূর্বক বললেন, '' শিবকে বলিও আমি তাহাকে দেখা দিতে আসিয়াছিলাম।'' শিবের পক্ষ থেকে গঙ্গা অনুনয় করতে থাকলে ধর্ম বললেন -

তোমারে দেখিলে হর সেই দেখা মোরে
শিরে জটা মেলি যেন লয়ে তোমা শিরে।
তবে যদি অতি খেদ করে দেবরায়
কালিদহে কমল তুলিতে যেন যায়।

একথা বলেই ধর্ম অন্তর্হিত হলেন । শিব আসার পর কি বলা যায় এই কথা চিন্তা করতে করতে গঙ্গা ''বসিল ধবল খাটে হৈয়া শ্বেতকায়'' । ইতোমধ্যে শিব বাড়ি এসে গঙ্গাকে ধবলকায় দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে গঙ্গা বিস্তারিত খুলে বললেন। তখন -

গঙ্গার বদনে বানী শুনি শূলপাণি
হস্ত পদ আছাড়িয়া পড়িলা ধরণী।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে দেবতাদের মধ্যে খবর প্রচারিত হয়েছে, ''গঙ্গারে পরম ব্রহ্ম দিলা দরশন''। এ কথা শুনে ত্বড়িৎ গতিতে দেবতারা ছুটে এসে গঙ্গাকে বন্দনা শুরু করলেন। ব্রহ্মা চারমুখে গঙ্গার স্তব করতে লাগলেন। শিব চিন্তা-ভাবনা করত সম্ভ্রমে পুলকে ভক্তিভরে গঙ্গাকে মাথায় স্থান দিলেন।

গঙ্গা শিবের মস্তকে স্থান পাওয়ায় তাঁর গৃহে নতুন গৃহিণী এলেন গৌরী বা চণ্ডী । কাব্যে একথা পরিষ্কার ভাবে উল্লেখিত না হলেও কাহিনীর ধারাবাহিকতা থেকে এটা বুঝা যায়।

পিতা ধর্মের আদেশ অনুসারে শিব এখন প্রতিদিন কালিদহে কমল বা পদ্মফুল তুলতে যান । তখন তিনি যোগীবেশ ধরেন। গৌরী কৌতূহলী হয়ে উঠলেন আসল ঘটনা জানার জন্যে। তিনি শিবের সঙ্গে যাওয়ার বায়না ধরলেন। শিব গৌরীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ''কালিদহে সাপের মেলা। তাহাদের বিষে গাছপালা সব পুড়িয়া গিয়াছে। ভয়ে দেবাসুর কেহ ঘেঁষে না । তুমি কি করিয়া যাইবে।'' একথা শুনে চণ্ডী মনে মনে হেসে মুখে বললেন, '' যাও আমি যাইব না।''

এদিকে সেদিনই দেবী আগেভাগে গিয়ে কালিদহে যাওয়ার পথের নদীতে যুবতী ডোমনীর বেশে খেয়া-নৌকা নিয়ে ঘাটে বসে রইলেন। খেয়াপারের সময় নৌকায় চড়ে শিব ডোমনীর রূপ দেখে ভুলে গেলেন। দেবী তাঁকে যথেষ্ট গালমন্দ করত মনোরঞ্জন করার পর আত্মপরিচয় দিলেন। শিব তখন দারুণ লজ্জায় পড়লেন এবং এর প্রতিশোধ গ্রহণের বুদ্ধি আটতে লাগলেন। অনেক ভেবে-চিন্তে শেষে ইঁদুর হয়ে তিনি গৌরীর কাঁচলি কেটে দিলেন এবং বৃদ্ধ ' কুশলী ' (রিপুকর্মকারী) সেজে দরজায় হাঁক দিলেন। ইতোমধ্যে কাঁচলির অবস্থা চণ্ডীর নজরে পড়েছে। সখী কুশলীকে ডেকে আনার পর গৌরী বললেন, '' কাঁচলি সারাইয়া দাও, তোমাকে খুশি করিব (' করিব সম্মান ') ।'' কুশলী বললেন, '' সত্য কর ।'' দেবী সত্য করলেন। সত্য রাখতে গিয়ে গৌরীকে ডোমনীগিরির শোধ দিতে হল।

একদিন কালিদহে ফুল তোলার সময় শিবের অকস্মাৎ মদনজ্বালার কারণে বিন্দুপাত হল। সেই বিন্দু পড়ল ' বিচিত্র পদ্মপাতে' । তা এক কাকের নজরে পড়ায় সে ছোঁ মারল কিন্তু শিবের উগ্র বীর্য উদরস্থ করতে ব্যর্থ হয়ে যেখানে ছিল সেখানেই সে তা উগরিয়ে ফেলল। পদ্মপত্রে বিন্দু টলমল করতে করতে জলে পড়ল এবং পাতাল ভেদ করে বাসুকির মাতা নির্মাণির মাথায় পড়ল। ক্ষীরের মতো দ্রব্যটি নিয়ে নির্মাণি একটি মেয়ে গড়ে তাতে জীবন্যাস করে পুত্রের কাছে এনে হাজির করল।

Dhaka University Institutional Repository

বাসুকি মেয়েটিকে তথা পদ্মাকে নাগেদের বিষ ভাণ্ডারী করে তাকে কালিদহে রেখে গেল। কালিদহে পদ্ম (মনসা) মনের ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

পরদিন সকালে শিব কালিদহে এসে দেখেন পদ্মবন বিধ্বস্ত হয়ে আছে। নাগেদের কাজ মনে করে তিনি গরুড়কে স্মরণ করলেন । গরুড় এসে টপাটপ সাপ গিলতে থাকায় কালনাগিনী মনসাকে এ দুঃসংবাদ জানাল। মনসা তখন কালিদহ থেকে উঠে এসে শিবের সামনে দাঁড়ালে '' দেখিয়া লোভিত হর চাহে কাম-চীতে''। শিবের কুদৃষ্টিতে ভয় পেয়ে মনসা স্বীয় পরিচয় প্রদান করলেন - '' আমি যে তোমার সুতা তুমি মোর পিতা ''। তখন শিব ধ্যানযোগে কন্যার কথা পরীক্ষা করলেন এবং এই মানসকর্মের জন্যে মনসা নাম দিয়ে তাকে ব্রহ্মজ্ঞানে দীক্ষিত করলেন। এরপর শিবের আদেশে গরুড় মনসার সকল নাগকে উগড়িয়ে বের করে দিলেন।

শিব ফুল তুলে ঘরে যেতে উদ্যত হলে মনসাও বাপের সঙ্গে যাওয়ার জেদ ধরলেন। চণ্ডীর ভয়ে শিব প্রথমে রাজী না থাকলেও শেষে ফুলের সাজির মধ্যে মনসাকে লুকিয়ে শিব বাড়ি এলেন। তবে মুখরা চণ্ডীর কাছে মনসা বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারলেন না। মনসাকে সাজি থেকে বের করে পেটাতে থাকলে মনসা কাতর ভাবে চণ্ডীর কাছে আত্মপরিচয় দিলেও চণ্ডী তা বিশ্বাস করলেন না। বরং কুৎসিৎ অভিযোগে চণ্ডী মনসাকে অভিযুক্ত করলেন। এতে মনসা ক্রুদ্ধভরে বললেন, '' আপন প্রকৃতি যেন দেখিস আমায়''। এতে চণ্ডী আরও ক্ষিপ্ত হয়ে কুশের বাণ দিয়ে মনসার এক চোখ কানা করে দিলেন। তৎক্ষণাৎ মনসার অপর চোখ থেকে বিষ নির্গত হয়ে চণ্ডীকে অচেতন করে ফেলল। দু'পুত্র কার্তিক-গণেশ এ অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে শিবকে ডেকে আনলেন। শিবও পত্নী-বিরহে কাঁদতে লাগলেন। অবশেষে বাপের সন্তুষ্টির জন্যে মনসা বিমাতা চণ্ডীকে জীয়ালেন। চেতন পেয়েই চণ্ডী মনসার ঝুঁটি ধরলেন। শিব ঘটনার গভীরতা আঁচ করে তখনি মনসাকে অন্য স্থানে রেখে আসতে চললেন। যাবার সময় গৌরীকে নিজের পঞ্চরত্ন নিদর্শন দিয়ে মনসা বললেন, '' বাবার যদি কখনো বিপদ-আপদ হয় তবে আমাকে অবশ্য খবর দিও।''

পিতা-কন্যা ঘুরতে ঘুরতে সিজুয়া পর্বতে পৌঁছলেন। পাহাড়ের উপরে সিজ গাছ দেখে শ্রান্ত ক্লান্ত মনসা সেই গাছতলের ছায়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এই সুযোগে শিব কন্যাকে ফেলে রেখে পালালেন। যাবার আগে একবার ঘুমন্ত কন্যার দিকে তাকালেন, তাঁর চোখের এক ফোঁটা জল পড়ল, সেই জল মানবী

Dhaka University Institutional Repository

মূর্তি ধরল ; তার নাম হল নেতা। শিব তাকে মহাজ্ঞানে দীক্ষিত করে বললেন, '' পদ্মার সহিত থাক অনুচরী হৈয়া ''। চলে আসার পথে একটু এসে শিবের চিন্তা হল, বনের মধ্যে মেয়ে দুটোকে অসহায় অবস্থায় রেখে যাওয়া অনুচিত। চিন্তা করতে করতে তাঁর কপাল ঘেমে উঠল, সেই ঘাম থেকে ধামাই উৎপন্ন হল। তাকে শিব মেয়ে দুটির কাছে তাদের ভাই এবং রক্ষক করে পাঠিয়ে দিলেন। এখানেই কাব্যের প্রথম পালা সাঙ্গ।

বিশ্বকর্মা সিজুয়া পর্বতে মনসার পুরী ও রাজপাট গড়ে দিলে তাড়াতাড়ি সেখানে প্রজা বসানোর উদ্দেশ্যে '' পাষন্ডির দেশে বিশাই নিয়োজি বান ''। বানভাসি প্রজারা দলে দলে এসে মনসার রাজ্যে বসতি স্থাপন করল। মনসা প্রতিদিন লাসবেশ করে নেতার সঙ্গে প্রজাদের ঘরদুয়ার দেখে সরোবরতীরে এসে জলকেলি করতে নামতেন। ইতোমধ্যে একদিন গন্ধর্বকন্যা বীণালতা ব্রহ্মার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল । তাকে দেখে ব্রহ্মা মদনবাণে আহত হওয়ায় তাঁর বীর্যস্খলন হল। তাহা থেকে প্রথমে সাতশ' অঙ্গুষ্ঠ প্রামাণ বালখিল্য ঋষিকুমার জন্ম নিল এবং পরিশেষে দু'কুমার উৎপন্ন হল, - '' দেবকায় সপ্তমুখ পুচ্ছ পদভাগে''। ব্রহ্মা তাদের দীক্ষা দিয়ে ও বেদ পড়িয়ে সিজুয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। তারা মনসার সভায় পুরোহিত পন্ডিত হল। যে জায়গায় ব্রহ্মবীর্য পতিত হয়েছিল সেখানে জল ঢালায় এক বিশালাকৃতির ব্যাঘ্র জন্ম নিল। সে ক্ষীরোদ সাগরের তীরে বাস করতে লাগল। কিছুদিন পরে ব্রহ্মার বীর্যে দেবগাভী কপিলার গর্ভে মহাতেজা মনুরথের জন্ম হল। একদিন কপিলা চোরা গাইয়ের দলে মিশে জনৈক ব্রাহ্মণের বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল ফসল খাওয়ার উদ্দেশ্যে। তখন বাড়ির লোকজন কপিলাকে ধরে বাঁধলেও পরে কপিলার মাহাত্ম্য বুঝে ব্রাহ্মণ তাকে ছেড়ে দিল। ঘরে ফেরার পথে কপিলা সেই ভীমাকৃতি বাঘের কবলে পড়ল। কপিলা তার উপবাসী বৎসকে দুধ খাওয়িয়ে ফিরে আসার শর্তে বাঘের কাছ থেকে সাময়িকভাবে ছাড়া পেল। ইতোমধ্যে তৃষ্ণার্ত মনুরথ ক্ষীরোদ সাগর শুষে পান করত সাগর শুকিয়ে ফেলেছে। এদিকে সে মা কপিলার কাছে থেকে বিস্তারিত শুনে বাঘকে মারতে ছুটল এবং তুমুল সংঘর্ষের পর বাঘকে মারতে সক্ষম হল। বাঘের ভয় দূর হওয়ায় মুনিরা এখন আনন্দিত মনে ক্ষীরোদসাগরের তীরে উপস্থিত হলেন। কিন্তু গিয়ে দেখেন সমুদ্র শুষ্ক। দেবঋষিদের দুর্গতি মোচন করতে কপিলা দুগ্ধধারায় ক্ষীরসাগর ভরিয়ে দিল।

একদিন এক টিয়া পাখি ব্রহ্মার জন্যে তেঁতুল আনতে গিয়ে দুর্বাসার অভিশাপ কুড়ানোর ফলে তার ঠোঁটের তেঁতুল ক্ষীরসাগরে পতিত হল। সঙ্গে সঙ্গে দুধ জমে যাওয়ায় ক্ষীরোদ ভরাট হয়ে গেল।

Dhaka University Institutional Repository

ইতোমধ্যে দুর্বাসার অভিশাপে ইন্দ্র লক্ষ্মীভ্রষ্ট হয়েছেন এবং লক্ষ্মী সাগরে আশ্রয় নিয়েছেন। এ দিকে জলের অভাবে দেবসংসার অচল, লক্ষ্মীহীন দেবসমাজও অচল।

দেবত্ব নাহি পাপপুণ্যের বিচার
দিবারাত্রি নাহি সব হৈল একাকার।

দেবতারা মিলে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, ক্ষীরোদসাগর মন্থন করতে হবে। সংস্কৃত পুরাণাদিতে যেমন, বিপ্রদাসের মনসা-কাহিনীতেও তেমনি ভাবে মন্থনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ব্যতিক্রম হচ্ছে, মনসা-কাহিনীতে দেবাসুরের সহযোগিতার অভাব এবং দেবতাদের পৃথকভাবে দু'দফা মন্থন। প্রথমবারে লক্ষ্মী চন্দ্র ইত্যাদি একে একে উঠেছিল ; শেষে জয়নেত ও সিদ্ধিঝুলি সহ কমণ্ডলুতে অমৃত ভরে বিষ্ণুতেজোধারী ধন্বন্তরি উঠল। দেবতাদের কাছে ধন্বন্তরি অমরত্ব প্রার্থনা করলে দেবতারা তাকে অমরত্বের পরিবর্তে তার জীবন মরণের রহস্য জানিয়ে তাকে দিগবিজয়ী গুণী করে দিলেন।

বিষ্ণু মোহিনী কন্যা সেজে দেবতাদের মধ্যে অমৃত ভাগ করে দিলেন, অসুরেরা ভাগ না পেয়ে অভিমান করে চলে গেল। শিব বললেন, '' আমি ভাগ লইব না। আবার মন্থন করা হোক, যাহা উঠিবে আমি লইব।'' ব্রহ্মা শিবকে বুঝিয়েও তাঁকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে ব্যর্থ হলেন। দ্বিতীয় পালা সাঙ্গ।

এরপর অসুরদের ডেকে শিব বললেন, '' যাহা উঠিয়াছিল সবই দেবতারা লইয়াছে শুধু তোমরা আর আমি বাদ পড়িয়াছি। এস আমরা মন্থন করি। আবার মন্থন শুরু হল। এবারে উঠল মহাবিষ- এ বিষ ধ্বংস না করলে সৃষ্টি নষ্ট হয়ে যাবে। দেবতারা তখন শিবকে দোষ দেওয়ার প্রয়াস চালালেন। অগত্যা সত্য রক্ষার্থে শিবকে বিষ পান করতেই হল। কিন্তু বিষ পান করা মাত্রই তিনি মৃতবৎ ঢলে পড়লেন। দেবসমাজে হাহাকার পড়ে গেল। সংবাদ শুনে চণ্ডী ছুটে এলেন। তিনি অনুমৃতা 'সতী' হবার উদ্যোগ নিচ্ছেন এমন সময় তাঁর মনসার বিদায়বাণী ও অভিজ্ঞান মনে পড়ল। তখন দেবতারা নারদের হাতে অভিজ্ঞান দিয়ে মনসাকে আনতে পাঠালেন। নারদের আগমনের অপেক্ষায় মনসা রাজবেশ লুকিয়ে দীনবেশে বসে রইলেন।

পত্রের ছাউনি গৃহ অঙ্গিনা জঞ্জাল
তথি বসে রহে পদ্মা পরি বাঘছাল।

Dhaka University Institutional Repository

পিতার অবস্থার কথা শুনে মনসা কাঁদতে লাগলেন। এরপর নারদকে বললেন, " এমন দীনবেশে দেবপুরে যাইতে পারি না। সৎমা ঠাকুরানী যদি একটি ভালো কাপড় আনেন তবে তাহা পরিয়া বাবাকে বাঁচাইতে যাইতে পারি।" এ কথা শুনে চণ্ডী একটি পাঁচহাতি আট পৌরে (' কাচা ') ধুতি নিয়ে মনসার সন্নিধানে এসে দেখেন, তিনি রাজরানী সেজে বসে আছেন । অতঃপর চণ্ডীর সঙ্গে দেবপুরে এসে মনসা সকলকে দেখালেন - "যত্নে এই বস্ত্র মোরে দান কৈল সতা " । দেবতারা তখন বললেন, যা হবার হয়ে গিয়েছে। এখন -

মন-দুঃখ ঘুচায়্যা জীয়াও তব পিতা
সভে মিলি সুসম্মান করিব সর্বথা।

দেবতাদের অনুরোধে মনসা পিতা শিবকে বাঁচানোর জন্যে ' মন্ত্রজাত' পড়তে লাগলেন।

কেন ত্রিভুবন নাথ আপনা বিসর
মন-পবনেতে জীব পরিচয় কর।
চিন্তা সূক্ষ্ম ব্রহ্ম সেই অচিন্তা অমল
নহে ছোট বড় দৃঢ় নির্মল কেবল।

বিষ উগরিয়ে ফেলে শিব সুস্থ হয়ে উঠলেন। অবশ্য একটু খানি বিষ গলায় লেগে রইল, সেজন্যে তাঁর নাম হল নীলকণ্ঠ। উদ্গীরিত বিষ মনসা নাগগণের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে ভাগ করে দিলেন। এখন থেকে মনসা দেবসমাজে সম্মানের আসন পেলেন।

এরপর মনসার বিবাহ-প্রসঙ্গ । বহু সন্ধানের পর পাওয়া গেল জরৎকারু মুনিকে, যার তিন কুলে কেউ নেই। ফুলশয্যার রাতে চণ্ডীর কুমন্ত্রণা বুঝতে ব্যর্থ হয়ে তাঁর অনুরোধে মনসা নাগাভরণ পরে স্বামীসম্ভাষণে গিয়ে ছিলেন। এ অদ্ভুত ব্যাপার দেখে স্বামী রাত্রেই ভাগলেন। মনসার সাপের ভয়ে জরৎকারু সমুদ্রে গিয়ে শাঁখের মধ্যে নিজেকে আড়াল করে রাখলেন। সকালে শিব কন্যার দুরবস্থা হৃদয়ঙ্গম করে জামাতার খোঁজে সমুদ্রতীরে বেরিয়ে পড়লেন এবং কোড়া পাখি হয়ে ডাক দিতেই শাঁখ জলের উপর ভেসে উঠল। তৎক্ষণাৎ শাঁখ তীরে উঠিয়ে সেখান থেকে জামাইকে বের করে নিয়ে শিব ঘরে ফিরলেন। এরপর দু'এক দিন থেকে জরৎকারু বানপ্রস্থে চলে গেলেন। বিদায় বেলায় স্ত্রী মনসাকে আশ্বাস দিয়ে গেলেন, " তোমার গর্ভে সুসন্তান জন্মিবে।" সেই সন্তান আস্তীক। নেতোর

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহ হয়েছিল বশিষ্ঠ মুনির সঙ্গে। বলিষ্ঠও স্ত্রীকে পুত্রলাভের বর দিয়ে তপস্যায় চলে গিয়েছিলেন। নেতোর পুত্রের কোন উল্লেখ বিপ্রদাসের কাব্যে নেই। বাসুকির কাছে লেখা-পড়া শিখে আস্তীক পরে মায়ের কাছে এসে রইল সিজুয়ায় । তৃতীয় পালা সাঙ্গ।

এরপর পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, জনমেজয়ের সর্পসত্র ও আস্তীক কর্তৃক সর্পসত্র নিবারণ - এই পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণনা রয়েছে। আস্তীক জয়ী হয়ে সিজুয়ায় ফিরে আসার পর বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ে তার আর দেখা পাওয়া যায় না। মনসাকাহিনীর পৌরাণিক পর্বেরও এখানে সমাপ্তি।

এখান থেকে মূল লৌকিক আখ্যায়িকার শুরু । চম্পক (চাঁপাই) নগরে চাঁদো সম্পত্তিশালী ব্যক্তি, রাজার মতো থাকেন। চাঁদো সদাগর শিবের মহাভক্ত । শিব তাকে পুত্রসম জ্ঞানে মহাজ্ঞানে দীক্ষিত করেছেন এবং জয়-নেত আর সিদ্ধি-জটা দিয়ে তাকে অজর-অমর করেছেন।

চণ্ডী এসে চাঁদোকে কুবুদ্ধি দিলেন যেন তিনি নতুন দেবতা মনসাকে পূজা না করেন। '' দেবপুর মাঝে তার বড় অপমান'' তাই মনসা সিজুয়া পর্বতে আস্তানা বানিয়েছেন - এই হচ্ছে চণ্ডীর অভিমত। মূল আখ্যায়িকার বীজটুকু এভাবেই সুপ্ত হল। তারপর পূর্ব প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি - মনসা দেবসমাজে স্বীকৃতি পাওয়া সত্ত্বেও দেবপুরে ঠাঁই পাননি। সে অধিকার লাভ করতে হলে মানুষের সাহায্যের দরকার - মানুষের ভক্তি অর্জনের মাধ্যমেই দেবত্বে পূর্ণ অভিষেক হয়। মনসার মনে অনুক্ষণ এখন সেই চিন্তা কাজ করছে। তিনি নেতোকে বললেন -

যতেক অমরগণ দিকপাল মুনিজন
পৃথিবী সভার অধিকার
আমি দেবী বিষহরি এ তিন ভুবন ভরি
সবে পূজা নাহিক আমার।

নেতো খড়ি পেতে গুণে বললেন, '' একজনের পূজা পাইলেই তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। চম্পক-নগরে চাঁদো রাজা আছে। সে মহাজ্ঞানের অধিকারী , সিদ্ধবিদ্যা জানে, কাহাকেও সে ডরে না''।

পূজে সব দেবতায় তোমা নিন্দা করে রায়
হরগৌরী দম্ভের কারণ

Dhaka University Institutional Repository

বুঝাইয়া সেই রাজা মর্তপুরে লহ পূজা
দ্বিজ বিপ্রদাস সুরচন।।

একদিন মনসা নেতোকে সহ রথে চড়ে ভ্রমণে বহির্গত হয়ে একদল রাখাল ছেলেকে অসংখ্য গরু নিয়ে আনন্দে মাঠে চরানোরত দেখতে পেলেন। নেতো বললেন, '' তুমি এক কাজ কর, প্রথমে এই রাখালদের পূজা নাও।'' '' শিশু বলি না করিহ হেলা ''. নেতোর পরস্পর্শে মনসা ডাইনী বুড়ীর ছদ্মবেশে কাঁখে চুপড়ি হাতে বাঁকা লাঠি নিয়ে ছেলেদের কাছে গিয়ে হাজির হলেন।

মনসা ওদের কাছে গিয়ে বললেন, '' কাল একাদশী গিয়াছে। একটু দুধ দাও, পারনা করি।'' ছেলেরা মনসাকে ডাইনী মনে করে তাকে প্রহারান্তে তাড়িয়ে দিল। এতে মনসা ক্রুদ্ধ হয়ে তাদেরকে মনে মনে অভিশাপ দিলেন। ফলে বেলা তিন প্রহরের সময় গরু সকল পাঁকে আটক পড়ে গেল। তখন মনসা আবির্ভূত হয়ে হাসতে থাকলে রাখালেরা তাঁর মায়া বুঝে তাঁকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করলেন। মনসার আদেশে তারা দুষ্ট বাঁঝা গাই দোহন করে চুপড়িতে ভরে দুধ এনে দিলেন। সে দুধ মনসাদেবী '' আনন্দে করিল পান হৈয়া অধোমুখ''। এতে প্রীত হয়ে মনসা রাখাল বালকদের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে জলভরা ঘটে দশ ফল দিয়ে দশহরা ব্রত করার উপদেশ দিলেন।

মনসার ' বারি ' (ঘট) পূজা করে রাখালদের সব চাষী ধনী হল। তাদের গ্রাম রাখালগাছি নামে প্রসিদ্ধ হল।

কিছুদিন পর সেখানকার খ্যাতনামা ' তুড়ুক ' (অর্থাৎ মুসলমান) চাষী -জমিদার দু'ভাই হাসন-হুসেনের সাথে রাখালদের বিরোধ দেখা দিল। একদিন গোরা মিঞা নামক জনৈক কৃষাণ চাষ করতে যাওয়ার পথে রাখালদের মনসার পূজা করতে দেখল। তার লোক কাছে গেলে তারা তাকে তাড়িয়ে দেয়। সে এসে নালিশ জানালে গোরা মিঞা গিয়ে মনসার ঘট ভেঙ্গে দিল। তখন মনসার সাপ তাকে কামড়ায়। এই ভাবে মনসার সাথে তুড়ুকদের বিবাদ বেঁধে গেল। নাগ দংশনে সকল তুড়ুক এবং হুসেন কাবু হয়ে পড়লে হাসন একলা হয়ে গেল। চতুর্থ পালা সাঙ্গ ।

হাসনের পত্নী প্রথম থেকেই স্বামীকে মনসার সাথে বিবাদ করতে মানা করেছিল। সেই কথা এখন তার মনে উদিত হওয়ায় সে চুপিসারে বাড়ি ফিরে এল। কিন্তু মনসার মায়ায় হাসনের অনেক দুর্গতি ঘটল।

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে হাসনের দুরবস্থা দর্শনে মনসার দয়ার উদ্রেক হল। তিনি আবির্ভূত হয়ে হাসনকে পূজা দিতে বললেন। হাসন স্বীকৃত হলে মনসা সকলকে বাঁচিয়ে তোলেন। কৃতজ্ঞ হাসন ' গুণবন্ত , শিল্পকার ' দিয়ে মনসার পাষাণ মন্দির স্থাপন করালেন। বিচিত্র কারু-কার্যের মন্দির নির্মিত হওয়ার পর পূজা চালানোর জন্যে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করলেন। তুড়ুক আখ্যান বা হাসন - হুসেন পালাব এখানেই সমাপ্তি।

চাঁদোর রাজধানীতে জালু ও মালু দু'ভাই জেলে থাকে। মাছের দরকার হওয়ায় তারা গুঙ্গড়ি নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছে। মনসার মায়ায় তাদের জালে মাছের সাথে মনসার দুটি ঘট উঠে এল। মনসার আদেশে তারা সেই দুটি ঘট গৃহে নিয়ে গেল। তাদের মা বাজনাবাদ্য করে সেই ঘট পূজা করতে লাগলেন। মনসার করুণায় জালু - মালুর অবস্থা ফিরে গেল। চাঁদোর স্ত্রী সনকা একদিন ছয় পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে নদীতে স্নান করতে যাবার কালে জালু - মালুদের বাড়িতে পূজার বাজনা শুনলেন। সেখানে গিয়ে জালু - মালুর মায়ের কাছে সনসা পূজার কথা জানিয়ে তাদের ঘট দু'টি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পূজা করতে শুরু করলেন। একদিন মনকা বধূদের নিয়ে মনসার পূজা করছেন এবং মঙ্গলগীতি গাচ্ছেন - এমন সময় চাঁদোর খাস চাকর নেড়া গিয়ে মনিবকে খবর দিল। খবর পেয়ে চাঁদো এসে দেখে রাগে জ্বলে গেলেন আর মনসার ঘটে হেঁতালের বাড়ি মারলেন। চাঁদোর প্রতাপ দেখে মনসা চিন্তায় পড়ছিলেন। নেতোর পরামর্শে মনসা চাঁদোর অত্যন্ত প্রিয় নাখরার বন (সুরম্য উদ্যান) তাঁর নাগেদের দিয়ে ধ্বংস করালেন। কিন্তু চাঁদো এসে -

মহাজ্ঞান জপে মনে জয়নেত আচ্ছাদনে
নিমিষে নখরা জীয়াইল
দম্ভময় অহঙ্কারে গালি পাড়ে মনসারে
দেখি পদ্মা ত্রাসযুক্ত হৈল।

এরপর নেতো মনসাকে পরামর্শ দিলেন , '' তুমি যদি মানুষের সঙ্গে মানুষ হইয়া মিশিয়া চাঁদোর শক্তি অপহরণ করিয়া লও তবেই তাহার যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারবে।'' তখন নেতোর পরামর্শ অনুযায়ী সুন্দরী তরুণীর বেশে মনসা ছলনার আশ্রয় নিয়ে চাঁদোর মহাজ্ঞান জেনে নিল এবং সিদ্ধিজটা ও জয়নেত আঁচল ছিনিয়ে নিয়ে অন্তর্ধান করলেন। এখন প্রথমেই মনসা চাঁদোর নাখরা বন ধ্বংস করলেন। নাখরা পালা তথা পঞ্চম পালা সাঙ্গ।

Dhaka University Institutional Repository

মহাজ্ঞান-বঞ্চিত চাঁদো নাখরা আর জীয়ায়ে পারলেন না। মন্ত্রীর পরামর্শে চাঁদো শঙ্খ ধন্বন্তরি ওঝাকে আনিয়ে নাখরা বন জীয়ালেন। মনসা ওঝার প্রতাপ দেখে প্রমাদ গণলেন। নেতোর পরামর্শে মনসা ওঝাকে ছলতে মালিনীর বেশে বিষাক্ত পুষ্প নিয়ে ওঝা শিষ্যদের ধ্বংস করলেন। ওঝা তাদের-পুনর্জীবিত করলে মনসা হার মানলেন। তখন নেতো পরামর্শ দিলেন -

গোয়লিনী রূপ ধর নামেতে কমলা
শঙ্খের রমণী সঙ্গে পাতহ সহেলা।
খুড়ি রূপ হৈয়া আমি লইব পসারে
মহাজ্ঞান হরি শঙ্খে বধহ প্রকারে।

সেই মতই কাজ হল। ওঝার পত্নী কমল ছদ্মবেশী গোয়ালিনী কমলার সঙ্গে সই পাতাল। কমলার অনুরোধে মনসা তার বাড়িতে গিয়ে সে রাত্রি কাটালেন এবং কমলাকে উস্কিয়ে দিয়ে তার স্বামীর জীবন-রহস্যের গুপ্ত তথ্য জেনে নিলেন । অবশেষে মনসার চক্রান্তে ওঝা মারা গেল। ছদ্মবেশিনী মনসার কথায় ওঝার মৃতদেহ জলে ভাসিয়ে দিলে মনসা সেটা পাতালে লুকিয়ে রাখলেন। ধন্বন্তরি পালা তথা ষষ্ঠ পালা সাঙ্গ।

এরপর ধনা-মনা পালার শুরু । মৃত গাছকে জীয়ানোর ক্ষমতাধারী ধনা-মনা দু'ভাইকে চাঁদো যাতে কোন কাজে লাগতে না পারেন সে জন্যে অনেক কৌশল করে মনসা তাদেরকে সেবক করে রাখলেন।

সিজুয়া শিখরে পদ্ম ধনা-মনা লইয়া
দুই ভাই রাখিলেন সেবক করিয়া।

সপ্তম পালা সাঙ্গ ।

এখন থেকে চাঁদোর বিরুদ্ধে মনসার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হল। কালিনাগিণীকে দিয়ে মনসা বাসি ভাতে বিষ ঢেলে চাঁদোর ছয় ছেলেকে মেরে ফেললেন। মৃত দেহ অগ্নিসংস্কার না করে মাজসে (মঞ্জুষায়) ভরে গুঙ্গড়ির জলে ভাসিয়ে দেওয়া হল।

কিছুদিন পরে মনসা শিবের বেশ ধরে স্বপ্নে দেখা দিয়ে চাঁদোকে বললেন, '' নৌকা সাজাইয়া অনুপান - পাটনে বাণিজ্যযাত্রা কর, সেখানে আমি আবার তোমাকে মহাজ্ঞান শিখাইব।'' সকালে গাত্রোত্থান করে

Dhaka University Institutional Repository

চাঁদো বাণিজ্যযাত্রার উদ্যোগ গ্রহণ করলে পাত্রমিত্রবর্গ এবং সনকা বাধা দিলেন। কিন্তু চাঁদো তার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।

মনসা ইন্দ্রকে ধরে তাঁর সভাসদ নর্তকদম্পতি অনিরুদ্ধ উষাকে মর্ত্যলোকে জন্ম নিতে পাঠালেন। চাঁদো যখন বাণিজ্যে গিয়েছেন তখন সনকার গর্ভে অনিরুদ্ধের জন্ম হল, তাদের সপ্তম পুত্র হিসেবে লখিন্দর নামে। ওদিকে উজানীনগরে সাধু বণিকের ঘরে বহু পুত্রের পরে একমাত্র কন্যা উষার জন্ম হল সুমিত্রার গর্ভে বেহুলা নামে। সপ্ততরী (ডিঙ্গা) সাজিয়ে চাঁদোর বাণিজ্য যাত্রার সময় সনকা পাঁচ মাসের গর্ভবতী ছিলেন। উষা - অনিরুদ্ধ পালা তথা অষ্টম পালা সাঙ্গ।

চাঁপাই নগরের ঘাট ছেড়ে চাঁদোর সপ্ত ডিঙ্গা বিভিন্ন ঘাট, গ্রাম পেরিয়ে কালিদহে এসে পৌঁছল। কূলে মনসার বিচিত্র ও বিরাট মন্দির। চাঁদোর ডিঙ্গাসমূহ এসে পড়ার আগেই মনসা তাঁর নাগসেনা সজ্জিত করে রেখেছেন চাঁদোর ভয় ভক্তি আদায় করতে। সেখানে পৌঁছার পর মনসাকে পূজা দেওয়ার কথা উঠলে চাঁদো পূজা তো দিলেনই না উপরন্তু তিনি মনসার মন্দির ভেঙ্গে লুটে মহানন্দে ডিঙ্গাসমূহ নিয়ে যাত্রা করলেন। অবশেষে সপ্ত ডিঙ্গা উদ্দিষ্ট অনুপাম পাটনে পৌঁছল।
সেখানকার রাজা চাঁদোর থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন । বিভিন্ন দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমে সাত ডিঙ্গায় ভরে চাঁদো দেশে প্রত্যাগমনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। বাণিজ্য পালা তথা নবম পালা সাঙ্গ ।

চাঁদো পাটনে গিয়েছেন। ইতোমধ্যে লখিন্দরের জন্ম হয়েছে। ক্রমে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে ; পড়াশোনা শেষ হলে লখিন্দরকে সনকার সম্মতি নিয়ে পাত্রামিত্ররা শূন্য রাজপাটে অভিষিক্ত করল।

ওদিকে মনসা একদিন রাতে সনকার রূপ ধরে চাঁদোকে স্বপ্নে দেখা দেওয়ায় চাঁদোর মন চঞ্চল হয়ে উঠল দেশে ফেরার জন্যে। চাঁদোর ফেরার পথে মনসা কালিদহে হনুমানের সাহায্যে ঝড় বাতাস উঠায়ে সাত ডিঙ্গা ডুবিয়ে দিলেন। কোন ক্রমে প্রাণে বেঁচে চাঁদো মিতা চন্দ্রকেতুর দেশে পৌঁছলেন অনেক দুঃখ- কষ্ট সহ্য করে। কিন্তু চন্দ্রকেতু মনসাপূজা করে শুনে সেখানে না থেকে পরদিনই দেশের দিকে যাওয়ার মনস্থ করলেন। ডিঙ্গাডুবি তথা দশম পালা সাঙ্গ।

Dhaka University Institutional Repository

সকালে চাঁদো দেশের দিকে যাত্রা করলেন। এবারও মনসার মায়ায় নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে চাঁদো-বাড়ি এসে পৌঁছলেন। স্নানাহার শেষে চাঁদো শয়নঘরে গেলেন। তখন লখিন্দর এসে পিতাকে প্রণাম করল। সনকা পিতাপুত্রের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এরপর লখিন্দরের বিবাহের উদ্যোগ । নানাস্থানে কন্যার সন্ধান শেষে অবশেষে উজানিনগরের সাধুর কন্যা বেহুলাকে চাঁদো পছন্দ করলেন পুত্রবধূ হিসেবে। চাঁদো বেহুলার স্নানকালীন দৃপ্ত ভূমিকা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। বৃদ্ধব্রাহ্মণীরূপী মনসার গায়ে জল ছিটে যাওয়ায় দেবী বেহুলাকে অভিশাপ দিলেন, '' বিভা রাতে খাইবা ভাতার ''।

ভাবী পুত্রবধূ কর্তৃক লোহার কলাই সিদ্ধ হতে দেখে চাঁদো খুশি হয়ে লগ্নপত্র করে দেশে ফিরলেন। '' বিভা-রাত্রে পুত্রের নাগের আছে ডর'' দেখে সনকা বিবাহ বন্ধ করার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু চাঁদো বললেন,

নর হইয়া সিদ্ধ করে লোহার কলাই
তাহা হৈতে তরিবেক কুমার লখাই।

* * * * *

চিন্তা না করিহ কহি তোমার অগ্রেতে
বান্ধিব লোহার ঘর সাতালি পর্বতে।
পুত্রবধূ থোব লৈয়া তাহার ভিতরে
তবেত কানির নাগ কি করিতে পারে।

এখানে চাঁদোর প্রত্যাগমন ও বেহুলার সম্বন্ধ পালা তথা একাদশ পালা সাঙ্গ ।

সাতালি পর্বতে লোহার ঘর গড়ানো হল। মনসার ভয়ে কামিলা সূতার মতো ক্ষীণ একটু ছিদ্র রেখে দিল। এরপর বিবাহ । বিপ্রদাসের কাব্যে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। বর যাত্রাপথে এবং বিবাহ-কর্মস্থলে মনসা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। লখিন্দরের কোন দোষ না পেয়ে তাকে দংশন করা গেল না। জাঁক-জমক সহকারে বিবাহ সুসম্পন্ন হল। সকালে দম্পতির বিদায়। বরকন্যা চাঁদোর ঘরে এল। রাত্রে লৌহ-মন্দিরে ঢুকে বেহুলা স্বামীকে বলল, '' আজ রাত্রিতে ঘুমাইও না, তোমার সর্পভয় আছে। '' কিন্তু দৈবের লিখন অন্যথা করবে কে। লখিন্দরের ক্ষুদা পাওয়ায় যথেষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

পরিশ্রম ও কৌশল করে বেহুলাকে ভাত রান্না করতে হল । ভাত খেয়ে লখাই ঘুমিয়ে পড়ল। তখন সূত্রপথে এসে কালনাগিনী তাকে দংশন করল। বেহুলার ক্রন্দনে সকলে ছুটে এল। শোকাকুল মনকা চাঁদোকে দোষ দিয়ে বলতে লাগলেন, '' তুমি মনসাকে মানিলে এমন হইত না। '' বেহুলা শ্বশুরকে বলল, '' আপনি ব্যবস্থা করিয়া দিন, আমি স্বামীর মৃত দেহ সনসার কাছে লইয়া তাহাকে বাঁচাইয়া আনি।'' চাঁদো মালাকার ডেকে রামকলার মাজস গড়তে বললেন। লখিন্দরের মৃতদেহ নিয়ে বেহুলা মাজসে উঠল। মাজস গুঙ্গড়ির জলে ভাসিয়ে দেওয়া হল।

মাজস ভাসার পর মনসা কাকরূপে উঠে এসে বসলেন। বেহুলার কথায় কাক তার আংটি নিদর্শন নিয়ে উজানিনগরে মায়ের কাছে খবর দিলেন। ছয় ভাই নদীর কূলে ছুটে এল । বেহুলা নিজের দুঃখ জানিয়ে আবার ভেসে চলল। নানাবিধ প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে মনসার কৃপায় বেহুলা অবশেষে নেতো ধোপানী বা ধোবানীর ঘাটে পৌঁছল মাজসসহ । মাজস (ভেলা) থেকে বেহুলা দেখল, ধোবানী কোলের ছেলেকে মেরে ফেলে নির্ঝঞ্ঝাটে কাপড় কেচে তারপর ছেলেকে জীয়ায়ে বাড়ি চলছেন। তৎক্ষণাৎ বেহুলা গিয়ে তার পায়ে পড়ল এবং তার আগমনের উদ্দেশ্য জানাল। বেহুলার অবস্থা দেখে নেতো বা নেতা বললেন, '' আমার সঙ্গে এস।'' নেতোর সঙ্গে বেহুলা তখন দেবপুরে চলে গেল।

বেহুলা সেখানে দেবকন্যাদের সাথে মিশে গিয়ে নর্তকীর বেশ ধারণ করল। পূর্বজন্মের সংস্কার , তাই সহজেই তার সব আয়োজন জুটে গেল। বেহুলার নাচে শিব মুগ্ধ হয়ে প্রণয় প্রস্তাব করলে বেহুলা ক্ষুব্ধ হয়ে আত্মপরিচয় দিলেন, ''মনসার বরদাসী তোমার নাতিনি''। শিব তখন হেসে নারদকে দিয়ে মনসাকে ডেকে পাঠালেন। মনসা এসে লখিন্দরের মৃত্যু সম্বন্ধে নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করলে বেহুলা কালনাগিনীর কাটা লেজটুকু দেখাল। তখন মনসা চাঁদোর সম্পর্কে নিজের বার মাসিয়া দুঃখের ফিরিস্তি দিলেন। সব শুনে বেহুলা হাত জোড় করে বলল, '' আমার স্বামীকে জীয়াইয়া দাও, শ্বশুরকে দিয়া তোমার পূজা করাইব।'' দেবতারাও সকলেই বেহুলাকে সমর্থন করলেন। তখন বাধ্য হয়েই মনসাকে লখিন্দরকে জীয়াতে তৎপর হতে হল, তার মৃতদেহের হাড়গুলো নিয়ে।

মন্ত্র পড়ি চাপড় মারিল তার পিঠে
ত্রস্ত হইয়া লখিন্দর আস্তে বেস্তে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

লখিন্দরের মতো তার ছয় ভাইকেও মনস-জীয়ায়ে দিলেন। এখানে দ্বাদশ পালা ' জাগরণ' সমাপ্ত ।

লখিন্দরকে বেহুলা তার মৃত্যু ও পুনর্জীবনের সব কথা বলল। সকলে দেশে ফেরার উদ্যোগী হলে বেহুলার অনুরোধে মনসা কালিদহ থেকে চাঁদোর সপ্ত ডিঙ্গা উদ্ধার করে দিলেন। এবার দেশে ফেরার পালা। চাঁপাইনগরে পৌঁছে বেহুলা ডোমনী সেজে অন্তঃপুরের অবস্থা পর্যবেক্ষণে গেল। সে সনকার হৃদয়ে পুত্র-পুত্রবধূর চাপাপড়া শোককে উথলিয়ে দিল।

বাজনা বাজাতে বাজাতে ডিঙ্গাসমূহ এসে চাঁদোর খাশ বন্দর রামেশ্বর ঘাটে লাগল। যদি রাজা চাঁদো মনসার পূজা মানে তবেই তাকে ডিঙ্গার দ্রব্যসমূহ দেওয়া হবে।

যদি বা না পূজে রাজা মনসাচরণ
নেউটিয়া যাব সঙে পদ্মার সদন।

সকলেই চাঁদোকে মনসার পূজা করতে বলছে, চাঁদোর মনও নরম হয়েছে, তবুও জেদের রেশটুকু যাচ্ছে না। বেহুলা শ্বশুরকে অনুরোধ করলে চাঁদো বললেন, ''তুমি পতিব্রতা সতী । তোমার কথায় আমি মনসাকে পূজিতে পারি, যদি প্রত্যক্ষ দেখি যে তোমার মহিমায় সাত ডিঙ্গা ঘাট থেকে ডাঙ্গায় উঠিয়া আমার বাড়ির দরজায় আসিয়া লাগিয়াছে।'' তখন বেহুলা মনসাকে স্মরণ করল। মনসা শেষ নাগকে স্মরণ করলেন। শেষ নাগ সাত নাগকে হুকুম করল। তখন -

সাত ডিঙ্গা পৃষ্ঠে করি চলিল সাত নাগ
এড়িল চাঁদোর দ্বারে সাত ভাগে ভাগ।

এখন আর চাঁদোর পক্ষে মনসাকে পূজা করতে কোন আপত্তি রইল না। চাঁদোর পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে মনসা তাকে দেখা দিলেন।

দুই ঘট শিরে দুই পদাঙ্গুলি দিয়া
নৃপতিরে দেখা দিল ঈষৎ হাসিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

চাঁদোর পূজা গ্রহণান্তে যাবার কালে মানসা শাপমুক্ত বেহুলা-লখিন্দরকে রথে তুলে নিলেন। রথে যেতে যেতে উজানিনগরে কিছুক্ষণের জন্যে যাত্রা বিরতি করে বেহুলা - লখিন্দর যোগিনী - যোগীর বেশে নামল। তাদের দেখে সুমিত্রার কন্যা-জামাতার শোক উথলে উঠল -

সুবর্ণের থাল ভরি অন্ন দিব নিত্য
থাকহ হেথায় দুহে হইয়া হরষিত।
ঝি-জামাই ছিল মোর সর্পাঘাতে মৈল
তোমা দুহা দেখি সেই শোক উপজিল।

বেহুলা তখন আত্মপরিচয় প্রদান পূর্বক সব কথা খুলে বলল। অতঃপর তারা সকল মমতা ত্যাগ করে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রথে ফিরলে রথ ইন্দ্রের ভুবনে চলে গেল। সেখানে পৌঁছে মর্ত্যবাসের পাপ ক্ষালনের জন্যে অনিরুদ্ধ-উষাকে পরীক্ষা দিতে হল। মনসার কৃপায় দু'জনেই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হল। অতঃপর তারা ইন্দ্রের সভায় পূর্বস্থান অধিকার করল। তারপর ইন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে মনসা তাঁর কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলেন । এখানে ত্রয়োদশ পালা তথা মনসাবিজয় সমাপ্ত।

মনসামঙ্গলের পূর্ববঙ্গীয় ধারার আদিকবি বিশেষ করে চৈতন্য পূর্ববর্তী কবিগণ হচ্ছেন নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্ত। নারায়ণ দেব[৯৫] এবং বিজয় গুপ্ত[৯৬] উভয়ের কাব্যেই রাঢ়ের প্রচলিত ধারাটি অনুসরিত হতে দেখা যায়। মনসামঙ্গল গান গাওয়ার সুবিধার্থে গায়েনগণ যে অঞ্চলে গান করতেন, সেই অঞ্চলের বিভিন্ন কবির রচনা সংগ্রহ করত সংকলনাকারে সম্পাদন করে নিতেন। সম্পাদিত অংশে কবিদের সর্বোৎকৃষ্ট রচনাংশসমূহ স্থান পেত। এভাবে বহু কবির রচনাংশসমূহ একত্র করে এক একটি গ্রন্থ গ্রথিত হওয়ার কারণেই '' নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত প্রভৃতি প্রাচীনতর কবির পদসমূহ অন্যান্য বিভিন্ন কবির পদের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়।''[৯৭] নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্ত - এ দু'কবির একক ভণিতাযুক্ত কাব্য না পাওয়া গেলেও সম্প্রতি আবিষ্কৃত পূর্ববঙ্গের দিকপাল কবি শ্রীরায় বিনোদ এর 'পদ্মাপুরাণ ' কাব্য '' প্রায় অখন্ডিত ও অচ্ছিন্নরূপেই''[৯৮] পাওয়া গিয়েছে। কবির বসত ভূমি[৯৯] বর্তমান বাংলাদেশের টাংগাইল (বৃহত্তর ময়মনসিংহ) জেলান্তর্গত। কবির আবির্ভাবকাল তথা কাব্য রচনাকাল খ্রীস্টীয় ষোল শতক।[১০০] তাহলে দেখা যাচ্ছে-পূর্ববঙ্গীয় ধারার মনসামঙ্গলসমূহের মধ্যে প্রাপ্ত অখন্ড কাব্য হিসেবে শ্রীরায় বিনোদেরটাই প্রাচীনতম। তাঁর কাব্যেও রাঢ়ের কাব্যধারার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। মনসামঙ্গলের তিন আদিকবি বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও বিপ্রদাসের সাথে সম্প্রতি আবিষ্কৃত

Dhaka University Institutional Repository

চৈতন্যদেবের সময়কালীন অথচ তাঁর প্রভাবমুক্ত[১০১] কবি শ্রীরায় বিনোদের একটা তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে।

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণের যতগুলো সংস্করণ বেরিয়েছে সেগুলোর মধ্যে সুকুমার সেনের[১০২] মতে সেনগুপ্ত-সংস্করণই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। সেজন্যে উক্ত সংস্করণ অবলম্বনে সংক্ষেপে নিম্নে বিজয় গুপ্তের কাহিনীর[১০৩] আলোকপাত করা হয়েছে ।

বন্দনাদির পর কাব্যের কাহিনী শুরু হয়েছে। বিজয় গুপ্তের কাব্যে পুষ্পবাড়ির কথা আছে, কিন্তু তা শিবের নয় চণ্ডীর। শিব ও চণ্ডীর বিবাহকান্ড নেই । চন্ডীর ডোমনী-বেশ ধারণ মনসা (পদ্মা)-র জন্মের পরে। চণ্ডীর বিরহে শিবের ঘাম হয়েছিল। সেই ঘাম শিব কাপড়ে মুছেছিলেন, তাতে নেতার জন্ম হয়। বস্ত্রমধ্যে জন্ম বলে '' শিব-বাক্যে নেতা স্বর্গরজকিনী হৈল'' । আর '' পদ্মার দাসী হৈল নেতা অষ্টাবক্র শাপেতে'' । ফুলের যে সাজিতে পদ্ম- লুকিয়েছিলেন পিতা শিব তা সরাসরি নিজ গৃহে নিয়ে যাওয়ার সাহস পাননি। বচাইয়ের ঘরে সাজি রেখে তিনি মণিকার্ণিকায় স্নান করতে গিয়েছিলেন। বচাই সাজি হাতড়িয়ে মনসাকে পেয়েছিল এবং ভেবেছিল তার পিতা বোধ হয় তার জন্যে পাত্রী এনেছে। তাই বচাই মনসাকে বিবাহের জন্যে উদ্যোগী হল। তখন মনসা স্বমূর্তি ধরে বচাইকে বিষমূর্ছিত করে ফেললেন। শিব এসে বচাইকে বাঁচিয়ে দিলেন, তবে শর্ত হল -বচাইদেরকে মনসার পূজা করতে হবে। অতঃপর মনসার বরে বচাই চাষা - রাজা হল।

মনসা পুনরায় ফুলের সাজিতে ঢুকলে শিব তা নিয়ে বাড়ি এলেন। তারপরের ঘটনা অনেকটা গতানুগতিক চণ্ড মনসাকে ধরে মারতে লাগলেন। এমন সময় গঙ্গা এসে বললেন, ' মা বলে যে তাকে তারে মার কি কারণ''। তখন গঙ্গার সাথে চণ্ডীর ঝগড়া বাধল। ওদিকে চণ্ডী মনসার বামচক্ষু কানা করে দিলে মনসা বিষদৃষ্টিতে চণ্ডীকে অচৈতন্য করে ফেললেন, অবশ্য শেষে মনসাই বিমাতাকে সুস্থ করে তুললেন পিতার কথা চিন্তা করে। মনসা কৈলাসে বাপের গৃহে থাকতে লাগলেন। কন্যাকে যৌবনবতী দেখে শিব তাকে বিবাহ দিলেন জরৎকারু মুনির সঙ্গে। কিন্তু চণ্ডীর চক্রান্তে বিয়ের রাত্রেই পতি-পত্নীর মনান্তর সৃষ্টি হল। মনসা মুনিকে মেরে ফেলে পরে জীয়াইলেন। পত্নীকে ত্যাগ করে তপস্যায় যাওয়ার সময় জরৎকারু পত্নীকে আট পুত্র লাভের বর দিলেন। এরপরও মনসা কাঁদতে থাকায় জরৎকারু মুনি মনসার নাভিতে হাত দিয়ে মন্ত্র জপ করে বললেন, '' তোমার গর্ভে এখনি পুত্র

Dhaka University Institutional Repository

জন্মাইবে''। এবং '' এই পুত্র হতে হবে বিপদ উদ্ধার '' । এইভাবে অষ্ট নাগের ও আস্তীক মুনির উৎপত্তি হল। ভূমিষ্ট হয়েই আস্তীক তপস্যায় চলে গেল মাতাকে প্রবোধ দিয়ে - '' তখনই আসিব যখন করিবে স্মরণ ''।

অষ্ট নাগ প্রসব করার পর মনসার আরেক বিপদ হল, সন্তানদের খাওয়ানোর মতো স্তনে এত দুধ কোথায়। শিব তখন কন্যাকে অভয়বাণী শুনালেন - অষ্ট নাগের তরে সাগর ভরিয়া দিব দুধে'' । এরপর অষ্ট নাগ দুধ খেয়ে বাঁচল সত্য কিন্তু তাদের মুখের বিষে সাগর বিষাক্ত হয়ে পড়ল। সে বিষ পান করে শিব অচেতন হলে মনসা তাঁকে বাঁচালেন।

এদিকে চণ্ডীর পরিত্যক্ত গর্ভপিণ্ড জলের সঙ্গে উদরস্থ করে সুরভি গাভী গর্ভবতী হয়ে বৎস মনোরথকে প্রসব করেছে। সুরভি বৎসের জন্যে সাগর দুধে ভরে দিল। টিয়া পাখির মুখ থেকে তেঁতুল পড়ে সেই দুধ জমে উঠল। তখন দেবাসুর মিলে সমুদ্র-মন্থন করলেন। মন্থনের ফলে যে সুধা উঠল তা দেবতারাই ভাগ করে নিলেন। মন্থনে উত্থিত বিষ পান করে শিব নীলকণ্ঠ হলেন ।

এর মধ্যে শক্তিমান অষ্ট নাগ - পুত্র নিয়ে মনসা কৈলাসে শান্তিমত বাস করতে সক্ষম হলেন না। চণ্ডীর বিবাদের কারণে শিব কর্তৃক মনসাকে বনবাসে পাঠাতে হল। তাঁর সঙ্গে নেতাকেও দেওয়া হল। বনবাসস্থলে বিশ্বকর্মা পুরী নির্মাণ করে দিলেন। সেখানে -

অপার মহিমা দেবী জগতের মাতা
সম্মুখে দাঁড়ায় ধামু বাম পাশে নেতা ।

উল্লেখ্য, এই ধামু বিপ্রদাসের কাব্যে ধামাই[১০৪]

তারপর রাখালদের পূজার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। এ কাহিনী বিপ্রদাসে যেমন, তেমনিভাবে বর্ণিত । অতঃপর '' হাসানহাটি - সংবাদ '' বা হাসন - হোসেন পালা । ইহাও বিপ্রদাসের কাব্যানুযায়ী । পরবর্তী কাহিনীগুলোও যথাসম্ভব বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ের কাহিনী অনুসারে অগ্রসর হয়েছে।

পূর্বেই উক্ত হয়েছে - নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণের বহুল প্রচারের কারণে তাঁর একটি অকৃত্রিম প্রাচীন পুঁথি বর্তমানে সত্যি দুর্লভ হয়ে উঠেছে।[১০৫] যা হোক, নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণ'[১০৬] তিনি খণ্ডে বিভক্ত । প্রথম খণ্ডে কবির আত্মপরিচয় ও দেব - বন্দনা ইত্যাদি, দ্বিতীয়

Dhaka University Institutional Repository

খণ্ডে পৌরাণিক আখ্যানসমূহ এবং তৃতীয় খণ্ডে চাঁদ সদাগরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের পৌরাণিক আখ্যান সমূহই নারায়ণ দেবের কাব্যে প্রধান স্থান অধিকার করে রয়েছে, যার ভিত্তি হচ্ছে মহাভারতের আস্তিক পর্ব, বিবিধ শৈব পুরাণ , কালিদাসের ' কুমারসম্ভবম' কাব্য প্রভৃতি। এই সকল পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত চাঁদ সদাগরের লৌকিক কাহিনীর সঙ্গত কারণেই কোনও সহজ সংযোগ স্থাপিত হতে পারেনি। তবে, '' বিজয় গুপ্ত - বিপ্রদাস - নারায়ণ দেবের কাহিনীতে স্থূল ঐক্য মেলে ।''[১০৭]

মনসাকাহিনীর প্রায় সম্পূর্ণটুকুই শ্রীরায় বিনোদের কাব্যে রক্ষিত হওয়ার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এখন অতি সংক্ষেপে তাঁর মনসামঙ্গল (পদ্মাপুরাণ) এর কাহিনী[১০৮] আলোচিত হচ্ছে :

দেবদেবীর বন্দনা, আত্মপরিচয়, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ প্রভৃতির বর্ণনা শেষে সুবিস্তৃতভাবে সৃষ্টিপত্তন কথা কাব্যে বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে গঙ্গাদেবীর জন্ম প্রসঙ্গ । ব্রহ্মা বিষ্ণুর কাছে কাল জলপ্লাবনের কারণ জিজ্ঞেস করায় বিষ্ণু বললেন, '' জগতের ত্রাণহেতু গঙ্গাদেবীর জন্ম হয়েছে ; কিন্তু ত্রিভুবন গঙ্গার বেগ ধারণ করতে সক্ষম হচ্ছে না বিধায় এ জলপ্লাবন। তবে শীঘ্রই এ সমস্যার সমাধান হবে। শিব গঙ্গাকে শিরে ধারণ করবেন । ফলে শিবের জটায় গঙ্গার সকল বেগ লুকাবে এবং গঙ্গা কালক্রমে শিবের পত্নীতে রূপান্তরিত হবেন।''

বিষ্ণুর এ ভবিষ্যদ্বাণী শীঘ্রই সফলতায় পর্যবসিত হল। গঙ্গা শিবের স্ত্রীতে পরিণত হওয়ায় সপত্নী গঙ্গাকে নিয়ে শিবের সাথে চণ্ডীর দাম্পত্য-কলহ দেখা দিল। নারদের কুটিলতার কারণে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেল। মনোদুঃখে শিব কালিদহে যাচ্ছেন, এতে চণ্ডীর সন্দেহ ঘনীভূত হতে থাকে। এরপরের কাহিনী অনেকটা গতানুগতিক পথে অগ্রসর হয়েছে।

শ্রীরায় বিনোদের কাব্যে মনসার প্রধান নামসমূহ হচ্ছে - মনসা, পাতালনাগিনী, ব্রহ্মাণী, জরৎকারু, পদ্মাবতী, বিষহরী, কমলৌষ্ঠা, জগদগৌরী ইত্যাদি। বিপ্রদাসের কাব্যে - পাতালকুমারী , নাগেশ্বরী, পদ্মাবতী, মনসা , ব্রহ্মাণী, পার্বতী, পর্বতবাসিনী, জরৎকার-পত্নী, জগদগৌরী, পতি মন্দদরী, জাগিয়া, জাগুলী ইত্যাদি। বিজয় গুপ্তের কাব্যে - পদ্মাবতী, পদ্মা, মনসা, বিষহরী, জগদগৌরী ইত্যাদি । নারায়ণ দেবের কাব্যে - পদ্মাবতী, পদ্মা, মনসা, বিষহরি ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

'নেতা ' ব্যতীত মনসার অন্য সহচরীর নাম, শ্রীরায় বিনোদে - ' গন্ধা'; বিজয় গুপ্তে ' সুগন্ধা ' ; বিপ্রদাসে ' গন্ধেশ্বরী ' । উল্লেখ্য, বিদ্যাপতি-রচিত ' ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী' তে উক্ত সহচরীর নাম বিজয় গুপ্তের অনুরূপ ' সুগন্ধা ' মনসাপূজার সুনির্দিষ্ট মাস-পক্ষ-তিথি - শ্রীরায় বিনোদে ' আষাঢ়ী পঞ্চমী", নারায়ণ দেবে - ' শ্রাবণের কৃষ্ণা পঞ্চমী' ; বিজয়গুপ্তে - ' শ্রাবণ মাসের রবিবার কিংবা মনসা পঞ্চমী ; বিপ্রদাসে ' জ্যৈষ্ঠ মাসের দশমী দশহরা' ।

মনসাদেবীর আকৃতি - শ্রীরায় বিনোদে - চার হাত, তিন চোখ ; নারায়ণ দেবে - চার হাত, তিন চোখ ; বিপ্রদাসে দুই হাত।

কাব্যের শুরুতে বন্দনাকৃত দেবদেবীসমূহ - শ্রীরায় বিনোদে - গণেশ, চণ্ডী, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, গঙ্গ, পুরন্দর, অনল, বরুণ, দিবাকর, রোহিণী, বাশধর, ধর্ম - অধিপতি, জয়ন্তকুমার, হিমালয়গিরি, কুবের, রতি, মদন, ব্রহ্মাণী ইন্দ্রাণী প্রভৃতি। বিজয় গুপ্তে - গণপতি, অষ্টলোকগণ, ব্রহ্মা, হরি, হর, ইন্দ্র, শচী, বারাহী, চামুণ্ডা, মহামায়া, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বিষহরি ইত্যাদি। বিপ্রদাসে-গণেশ, ব্রহ্মা, নারায়ণ, মহাদেব, কার্তিক , ডাকিনী - জুগিনী, ইন্দ্র, অগ্নি , যব, নৈরি, বরুণ, আনল, কুবের , ঈশান (দিক পাল), নবগ্রহ, নারদ, জরুৎকার, আস্তিক, নেতো, বিষহরি ইত্যাদি।

বাণিজ্য যাত্রাকালে চাঁদ সদাগরের পূজিত দেবদেবীসমূহ - শ্রীরায় বিনোদে হরগৌরী ; বিজয়গুপ্তে - বিষ্ণু, বাড়াহী, যমুনা, গঙ্গা, ভাগীরথী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, উমা-মহেশ্বর, অষ্টলোকপাল, দেব দিবাকর ইত্যাদি ; বিপ্রদাসে-গন্ধেশ্বরী।

লখিন্দরকে কালিনাগিনী দংশনের পূর্বে অন্যান্যের পাশাপাশি যে সমস্ত দেবতাকে সাক্ষী রেখেছিল - শ্রীরায় বিনোদে - ধর্ম ; নারায়ণদেবে - দেবগণ, বিজয় গুপ্তে - ব্রহ্মা - বিষ্ণু - আদি দেবগণ ; বিপ্রদাসে - তিন লোক।

বেহুলার কাঁচুলিতে চিত্রিত অন্যান্যের পাশাপাশি দেবদেবীসমূহ - শ্রীরায় বিনোদে - ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, মনসা, দশ লোকপাল, জয়ন্তকুমার, দশাবতার, কৃষ্ণ - বলরাম, কার্তিক - গণেশ, নারদ,জরৎকার, আস্তীক, রতি-কাম, ডাকিনী-যোগিনী প্রভৃতি। নারায়ণ দেবে - বিষ্ণুর দশাবতার রূপ (নরসিংহ, বামন

Dhaka University Institutional Repository

, কূর্ম, রাম, রাম-কানু, বুদ্ধ প্রভৃতি), লক্ষ্মী-সরস্বতী, অনল, পবন, রবি, শশী, রাহু, শনি ইত্যাদি । বিজয় গুপ্তে - মনসার আদেশে বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত - ব্রহ্মা, হর, নারায়ণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ। বিপ্রদাসে - মনসার আদেশে বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত কাঁচুলিতে দেবদেবী না দিয়ে শুধু বিভিন্ন পশু-পাখির চিত্র অংকিত হয়।

সমুদ্র-মন্থনে উত্থিত বিষপানে মৃত শিবের সংবাদ মনসার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন - শ্রীরায় বিনোদে ও বিপ্রদাসে - নারদ, বিজয় গুপ্তে - কার্তিক ।

চণ্ডীর চোখে ঘুম আনাতে শিব যার শরণ নিয়েছিলেন - শ্রীরায় বিনোদে, নারায়ণ দেবে ও বিজয় গুপ্তে ' নিদ্রালি ' ; বিপ্রদাসে - ' নিদ্রালি - ঘুমালি ' । শ্রীরায় বিনোদের কাব্যে মনসা যখন হনুমানকে দিয়ে কালিদহে চাঁদ সদাগরের ডিঙ্গাসমূহ ডুবানোর চেষ্টা করছিলেন চণ্ডী তখন হনুমানের প্রতিপক্ষ হিসেবে অন্যতম লৌকিক দেবতা ক্ষেত্রপালকে দিয়ে ডিঙ্গাগুলো রক্ষা করছিলেন । অবশ্য পরে শিবকে বলে মনসা চণ্ডীকে নিষ্ক্রিয় করেছেন। এছাড়া , ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী ' - তে বর্ণিত ' বিচিত্রা ' (' বিচনী','ব্যাজনী') তৈরীর বিস্তৃত বর্ণনা শ্রীরায় বিনোদের কাব্যে রয়েছে। এই ' বিচিত্রা ' -য় অন্যান্য দেবতার সাথে চন্দ্রধর, বেহুলা (বিপুলা), লখিন্দর, মনসা, নেতা (নেতো রজকী), সুগন্ধা (গন্ধা) , অষ্টনাগ প্রভৃতির প্রতিকৃতি অংকিত আছে। বিপ্রদাস, নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্তের কাব্যে এগুলোর উল্লেখ নেই। বিপ্রদাসের কাব্যে মনসার নির্দেশে হনুমান চান্দোর (চাঁদ সদাগরের) সপ্ত ডিঙ্গা ডুবিয়ে দেয় ; এক্ষেত্রে চণ্ডী কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করেননি। বিজয় গুপ্তের কাব্যে - তের খানি ডিঙ্গা ডুবে যাবার পরে প্রধান ডিঙ্গা (চাঁদ সদাগর যেটাতে রয়েছেন) 'মধুকর' এর কাণ্ডারী হয়ে স্বয়ং চণ্ডী বসে আছেন। মনসা তখন শিবকে এ তথ্য জানালে শিব চণ্ডীকে আশ্বাস দিয়ে ডিঙ্গা থেকে নিয়ে যান। নারায়ণ দেবের কাব্যে - চান্দোর ডিঙ্গা ডুবাতে মনসা হনুমানকে কাজে লাগিয়েও ব্যর্থ হচ্ছিলেন চণ্ডীর কারণে । পরে মনসা নিজেই বিমাতা চণ্ডীকে বুঝিয়ে তার কার্য উদ্ধার করেন।

ঊষা - অনিরুদ্ধের আত্মা নিয়ে যম-পদ্মার যুদ্ধ-বৃত্তান্তটি বিপ্রদাসের কাব্যে নেই, অথচ বিজয় গুপ্তে, নারায়ণ দেবে ও শ্রীরায় বিনোদে রয়েছে। বিশেষ করে ' নারদ মুনির যমপুরী দর্শন ' প্রসঙ্গে শ্রীরায় বিনোদ এবং ' পদ্মার যমপুরী দর্শন ' - প্রসঙ্গে নারায়ণ দেব স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। কেতকাদাস

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেমানন্দের কাব্যে ' যম - মনসার যুদ্ধ '- এর পরিবর্তে ' স্বতন্ত্র ' উষাহরণ ' পালা বর্ণিত হয়েছে যা অন্য কারো মনসামঙ্গলে দেখা যায় না।

আবার দ্বিজ বংশীর মনসামঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে বেশ খানিকটা স্বতন্ত্রতা আছে। তাঁর চাঁদ সদাগরের ইষ্ট দেবতা শিব নহেন, বরং চণ্ডী শিবের পত্নী । চাঁদ গোড়াতে চণ্ডী ও মনসা এই উভয় দেবতার প্রতি সমদর্শী ছিলেন। কিন্তু পরে বিমাতা চণ্ডীর কারণে মনসাদেবী চাঁদের ভক্তিপূজার পরিবর্তে অপমান পেতে থাকেন । অবশ্য শেষ পর্যন্ত শিবের মধ্যস্থতায় এই বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে।

সুদীর্ঘ পাঁচশ' বছর কাল ব্যাপী বিভিন্ন কবির কাব্যে মনসামঙ্গলের কাহিনী নানা রূপে, নানা বর্ণে প্রতিভাত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ঃ

০১। জয়া সেনগুপ্তা, মনসামঙ্গলকাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী, বড়াল প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯০ , ডঃ সুভাষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা (শুভেচ্ছাবাণী)

০২। ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ, ১৯৭৮, পৃঃ ১৮৭

০৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ১৪

০৪। চিত্তরঞ্জন মাইতি, বাংলা কাব্য প্রবাহ, ডি. মেহরা রূপা অ্যান্ড কোং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৪, পৃঃ ৯৫

০৫। বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ১ম খণ্ড , পৃঃ ৩৯৬

০৬। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (প্রথম খন্ড ঃ আদি ও মধ্য যুগ) , পৃঃ ৫০

০৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২

০৮। অরবিন্দ পোদ্দার, মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৯৯৪, পৃঃ ৫৮

০৯। মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৭২

১০। মমতাজুর রহমান তরফদার, বাংলার ধর্মজীবন (আনিসুজ্জামান সম্পাদিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)' -এর পঞ্চম অধ্যায়), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭, পৃঃ ২৭৮

১১। নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), (জ্যোৎস্না সিংহ রায় কর্তৃক সংক্ষেপিত), সংক্ষেপিত লেখক-সমবায়-সমিতি, কলকাতা, সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ) , ১৩৮২ পৃঃ ৩২৬

১২। বিষ্ণুপদ পান্ডা (সম্পাঃ) , উড়িষ্যার সাধক কবি দ্বারিকাদাসের মনসামঙ্গল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৯ , অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত প্রাক্‌কথন, পৃঃ ৩ খ

১৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস , পৃঃ ২৮৮

১৪। সাঈদ-উর-রহমান, 'চাঁদ সদাগরের লাঠি ও হজরত মুসার আসা' (সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফাল্গুন ১৩৯৮, পৃঃ ৬১

১৫। সাঈদ উর রহমান, ' মনসামঙ্গল কাব্য ও ইসলাম ধর্ম' (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন ১৯৮৫) পৃঃ ১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

১৬। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, পৃঃ ৬৮

১৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯

১৮। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩১৬

১৯। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, পৃঃ ৭৮

২০। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড ঃ ? - ষোড়শ শতাব্দী), আনন্দ পাবলিসার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আনন্দ সংস্করণ (তৃতীয় মুদ্রণ), ১৯৯৫, পৃঃ ১৬০

২১। প্রাগুক্ত , পৃঃ ১৯৭

২২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৬

২৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৭০৫

২৪। বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা, ভূমিকা পৃঃ ৩

২৫। ডঃ রণেন্দ্রনাথ দেব, প্রাচীন বাংলা কাব্য প্রদক্ষিণ,প্রবাল প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৪, পৃঃ ৪৭

২৬। প্রাচীন কাব্য ঃ সৌন্দর্য্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, পৃঃ ১১২

২৭। দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দ্বিতীয় খন্ড), (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, পর্ষদ কর্তৃক দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯১, পৃঃ ৪৬৮

২৮। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত), কেতকাদাস - ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল (প্রথম খন্ড), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৩, পৃঃ ৭৩-৭৭

২৯। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, পৃঃ ৫৪

৩০। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ২৮৬

৩১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৭

৩২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৭

৩৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৫ - ০৬

৩৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১১

৩৫। প্রাগুক্ত , পৃঃ ৩০৭

৩৬। গোপাল হালদার, বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (প্রথম খন্ডঃ প্রাচীন ও মধ্য যুগ),মুক্তধারা, ঢাকা , বাংলাদেশে দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮০, পৃঃ ১০১-০২

৩৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২

Dhaka University Institutional Repository

৩৮। শিব প্রসাদ হালদার, পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য, ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৩, পৃঃ ১৩

৩৯। বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য (সঙ্কলিত), বিজয় গুপ্ত প্রণীত পদ্মাপুরাণ বা মনসা মঙ্গল, পৃঃ ৩

৪০। দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, পর্ষদ কর্তৃক দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯১, পৃঃ ১৯৪

৪১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩১৬

৪২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ১৯৩

৪৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩১৮

৪৪। শ্রীরায় বিনোদ ঃ কবি ও কাব্য, পাদটীকা পৃঃ ২৮

৪৫। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (খ্রীস্টীয় দশম-বিংশ শতাব্দী), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রিত নতুন সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃঃ ৫৫

৪৬। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, পৃঃ ৭১

৪৭। বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খণ্ড), পৃঃ ৪১৫

৪৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১৪

৪৯। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা (দ্বিতীয় খন্ড-মধ্যযুগ), রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, (১৯৬৭), পৃঃ ৩৭৯

৫০। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়) পৃঃ ২০২

৫১। বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, পৃঃ ১-২

৫২। প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃঃ ১।।৯০

৫৩। বাংলা মঙ্গলকাবোর ইতিহাস, পৃঃ ২৯৭

৫৪। প্রাগুক্ত , পৃঃ ২৯৭

৫৫। বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খণ্ড), পৃঃ ৪১০

৫৬। প্রাগুক্ত , পৃঃ ৪১০

৫৭। শ্রীরায় বিনোদ ঃ কবি ও কাব্য, পৃঃ ১৪৮

৫৮। ডঃ আশুতোষ দাস (সম্পাদিত), তন্ত্রবিভূতি-বিরচিত মনসাপুরাণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০, ভূমিকাপূর্ব (দু'চার কথা) পৃঃ ৯

৫৯। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ডঃ ? - ষোড়শ শতাব্দী), পৃঃ ১৭৮-৭৯

Dhaka University Institutional Repository

৬০। ডঃ কামিনীকুমার রায়, বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার, বাসন্তী লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০, পৃঃ ৫১

৬১। বাংলা সাহিত্যের কথা (দ্বিতীয় খন্ড - মধ্যযুগ), পৃঃ ৩৬৫

৬২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড), পৃঃ ১৯৭-৯৮

৬৩। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ডঃ সপ্তদশ - অষ্টাদশ শতাব্দী), আনন্দ পাবলিসার্স লিঃ, কলকাতা, আনন্দ সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রন, ১৪০০ , পৃঃ ২২২

৬৪। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ ঃ ৩১১-১৩

৬৫। Vipradasa's Manasa- Vijaya, Sukumar Sen (ed), The Asiatic Society, Calcutta, 1953 (পরে বিপ্রদাসের মনসাবিজয় উল্লিখিত), পৃঃ ৩

৬৬। বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার, পৃঃ ৬৬-৬৮

৬৭। প্রাগুক্ত , পৃঃ ৫৫

৬৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫

৬৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫

৭০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮

৭১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩২১

৭২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড), পৃঃ ১৭৮

৭৩। তন্ত্রবিভূতি বিরচিত মনসাপুরাণ, ভূমিকা পৃঃ ৮১

৭৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড), পৃঃ ১৭৯

৭৫। প্রাগুক্ত , পৃঃ ১৭৯

৭৬। প্রাগুক্ত , পৃঃ ১৮০-৮৩

৭৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৩-৮৭

৭৮। তন্ত্রবিভূতি বিরচিত মনসাপুরাণ, ভূমিকা পৃঃ ২১

৭৯। প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃঃ ২১

৮০। ডঃ অমলেন্দু মিত্র, রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২, পৃঃ ৭৩

৮১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৩

৮২। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল (প্রথম খন্ড), পৃঃ ৮

Dhaka University Institutional Repository

৮৩। Vishnu Paul's Manasa- Mangal, Sukumar Sen (ed), The Asiatic Society, Calcutta, 1968 (পরে বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল উল্লিখিত), পৃঃ ৬

৮৪। রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্ম ঠাকুর, পৃঃ ৭৩

৮৫। সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ডঃ আশুতোষ দাস (সম্পাদিত), কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃঃ ৬

৮৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭-৮

৮৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯

৮৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০

৮৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩

৯০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫-১৬

৯১। রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর, পৃঃ ৮০

৯২। তন্ত্রবিভূতি-বিরচিত মনসাপুরাণ, ভূমিকা পৃঃ ২১

৯৩। বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, ভূমিকা পৃঃ ৩।।০

৯৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড), পৃঃ ১৬১-৭৭

৯৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৮

৯৬। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩০৭

৯৭। বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, ভূমিকা পৃঃ ৩।।৯০

৯৮। শ্রীরায় বিনোদ ঃ কবি ও কাব্য, পৃঃ ৬৯

৯৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯

১০০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯

১০১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০

১০৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড), পৃঃ ১৮৯

১০৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৯-৯০

১০৪। প্রাগুক্ত, পাদটীকা পৃঃ ২০২

১০৫। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩৩২

১০৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৬-২৭

১০৭। বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (প্রথম খন্ড), পৃঃ ৪১২

১০৮। শ্রীরায় বিনোদ ঃ কবি ও কাব্য , পৃঃ ৬৯-৭০।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন কবির মনসামঙ্গল কাব্যে দেবদেবীর তালিকা

এখানে মনসামঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করাসহ তাঁদের কাব্যে উল্লেখিত দেবদেবীদের তালিকা তুলে ধরা হয়েছে।

নারায়ণ দেব ঃ

মনসামঙ্গল কাব্যধারার প্রাচীনতম কবিদের মধ্যে নারায়ণ দেব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর আবির্ভাব - কাল, বাসস্থান প্রভৃতি নিয়ে মতভেদ বিদ্যমান। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ সুকুমার সেন এবং ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য নারায়ণ দেবকে যথাক্রমে খ্রীস্টীয় পনেরদশ, ষোড়শ- সপ্তদশ এবং পনেরদশ -ষোড়শ শতকের কবি[১] হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত নারায়ণ দেবের ' পদ্মাপুরাণ' (মনসামঙ্গল)- এর ভূমিকায় সম্পাদক তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত লিখেছেন - '' যাঁহারা নারায়ণ দেবকে বিজয় গুপ্তের (পনেরদশ শতাব্দী) সমসাময়িক মনে করেন, আমরা তাঁহাদের সহিত একমত নহি। আমরা নারায়ণ দেবকে এয়োদশ শতাব্দীর মধ্য কি শেষভাগের কবি বলিয়া মনে করি।''[২] এ প্রসঙ্গে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ '' আসামীদের কাছে আসামী ভাষায় নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ ' সুকনান্নি' নামে পরিচিত। এই শব্দটি সুকবি নারায়ণী শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ। তাঁহাদের মতে দরঙ্গরাজের অনুজ্ঞায় তাঁহার সভাপন্ডিত কবিবর নারায়ণ দেব পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। ..... আসামে প্রাপ্ত নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে চৈতন্যদেবের বন্দনা পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয়, তিনি খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন।''[৩] বলা বাহুল্য , রাঢ় থেকে পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) - এর কিশোরগঞ্জ (বৃহত্তর ময়মনসিংহ) জেলাস্থ তাড়াইল থানার অন্তর্গত নসিরুজিয়াল পরগণার বোর গ্রামে বসতি স্থাপনকারী[৪] নারায়ণ দেবের কবি-প্রতিভা পূর্ববঙ্গের সীমা অতিক্রম করে রাঢ়, এমনকি আসামের দূরবর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চলেও[৫] প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যও এখানে উল্লেখ করা যায় - '' নারায়ণ দেবকে পনেরদশ শতকের শেষভাগে আবির্ভূত বলিয়া ধরিয়া লইলে কোন মারাত্মক ভুলের মধ্যে পড়িতে হইবে না। তিনি এবং তাঁহার প্রায় সমকালীন কবি বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গলের বিভিন্ন চরিত্র-পরিকল্পনা, নানা আখ্যান ও পুরাণ - কাহিনীর সমাবেশ, উহার সমাজ-চিত্র, নীতিগত মান, অধ্যাত্ম ভাবনা ও জীবনদর্শন - এই সমস্ত

Dhaka University Institutional Repository

উপাদানের যথাযথ বিন্যাসে উহার একটি সামগ্রিক রূপ স্থির করেন ও ইহার বহু শতাব্দীব্যাপী অগ্রগতি ও আত্মবিস্তারের একটি সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ করেন। ..... তাঁহারা যে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত মনসামঙ্গলের নবরূপের স্রষ্টা তাহা নিশ্চিত।''৬

বাঙালী এবং আসামী এই দু'জাতিরই '' নিজেদের কবি'' নারায়ণ দেবের কাব্যই মনসামঙ্গল কাব্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচারের সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। সেজন্যে মনসামঙ্গলের পরবর্তী কালের অনেক কবি এবং গায়েন নারায়ণ দেবকেই আদর্শ ধরে তাঁরই পদ কিংবা পদাংশকে ভিত্তি করে তাঁর সঙ্গে যুগ্মভণিতা দিয়ে নতুন পদ সৃষ্টি করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মনসামঙ্গলের বহুল আলোচিত কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ তাঁর কাব্যের শুরুতে বাণী- বন্দনায় নিম্নোক্ত পদে ব্যাস-বাল্মীকির সাথে নারায়ণ দেবেরও সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন বলে অনেকের ধারণা -

'' ব্যাস-বাল্মীকি মুনি নারায়ণ তাও জানি
তোমাকে সেবিয়া হৈল কবি।''৭

বর্তমানে বঙ্গদেশ থেকে আসামেই অধিক প্রচারিত তথা প্রচলিত নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, কেননা আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রচারিত প্রকৃতার্থে তিনিই একমাত্র মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণের কবি। নারায়ণ দেবের প্রাচীন বাংলা পদগুলো আসামে গিয়ে কিভাবে রূপান্তরিত হয়েছে, তা নিম্নোক্ত পদাংশেরৎ বাংলা ও অসমীয়া পাঠের তুলনামূলক রূপ দেখেই পরিষ্কার বুঝা যাবে।

<u>বাংলা</u>

ওঠ ওঠ ওহে প্রিয়া কত নিদ্রা যাও ।
কাল নাগে খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও।।
তুমি হেন অভাগিনী নাহি ক্ষিতি তলে।
অকারণে রাঁড়ি হৈলা খণ্ড ব্রত ফলে।।
কত খণ্ড তপ তুমি কৈলা গুরুতর।
সে কারণে তোমা ছাড়ি যায় লক্ষ্মীন্দর।।

* * *

সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাঁচালী।

Dhaka University Institutional Repository

পয়ার ছাড়িয়া এক বলিব লাচারী।।

<u>অসমীয়া</u>

উঠা উঠা প্রাণেশ্বরী কত নিদ্রা যাস।
মোক খাইল কাল নাগে চক্ষু মেলি চাস।।
তোর সম অভাগী নাহিক ক্ষিতি তলে।
অকালতা বাঁবী ভৈলী খন্ড ব্রতব ফলে।।
কতো জন্মে খণ্ড ব্রত কৈলি বহুতব।
সেহি দোষে তোক এবি যাওঁ লখিন্দব

*　　　*　　　*

সুকবি নারায়ণদেবব সবস পান্থালী।
লখাইব করুণা বুলি এক যে লেচাবী।।

উপরোক্ত উভয় অংশের রচয়িতা যে একই কবি, তাতে কোন সংশয় থাকা উচিত নয়। কেননা কালে কালে দেশ থেকে দেশান্তরের কারণে এই রূপের বিবর্তন ঘটেছে সেটা বলাই বাহুল্য।

নারায়ণ দেব একটু পুরাণ-ঘেঁষা কবি ছিলেন বিধায় লৌকিক মনসাকাহিনীর তুলনায় পৌরাণিক কাহিনীর দিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। মহাভারতের আস্তিক পর্ব, বিভিন্ন প্রকার শৈব পুরাণ, কালিদাসের 'কুমার সম্ভবম' কাব্য প্রভৃতি সংস্কৃত উপাদান থেকে তাঁর দেব খণ্ডের কাহিনী পুষ্টি লাভ করেছে। ''চরিত্র সৃষ্টি, রসবৈচিত্র্য ও কাহিনী গ্রন্থনে নারায়ণ দেব বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এদিক থেকে তাঁর স্থান বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাসের চেয়ে অনেক উঁচুতে।''[৯] নারায়ণ দেব প্রাক্ চৈতন্য যুগের কবি হয়ে বাংলা সাহিত্যের সেই অপরিণত অবস্থার মধ্যে থেকেও বাংলা ভাষা অবলম্বনে বিরাট কাব্য রচনা করেছিলেন। যে যুগে ধর্মই মানুষের মনে একাধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল সেই যুগে তিনি ধর্মকে অবলম্বন করেও সেখান থেকে চিরন্তন মানবাত্মার সুখ-দুঃখ-বেদনার সন্ধান করেছিলেন। মহাকবি কালিদাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রচিত নারায়ণ দেবের কাব্যের নিম্নোক্ত 'রতির বিলাপ'[১০] অংশটির সাহায্যেই কবির কবিত্ব, শক্তি-সামর্থ্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে -

পতিশোকে রতি কান্দে লোটাইয়া ধরনী।
কেন হেন কর্ম কৈলা দেব শূলপাণি।।

Dhaka University Institutional Repository

দেবের দেবতা তুমি ভুবনের পতি।
স্ত্রীবধ দিন আজি গলায় দিব কাতি।।
সংসারেতে যত পুরুষ সব হইল নাশ।
স্ত্রী পুরুষে আর না পুরিব আশ।।
দক্ষিণ সময় আর না পুরিব মন্দ।
পক্ষন ছাড়িয়া যাইব মকরন্দ ।।
কোকিল মধুর ধ্বনি না পুরিব হৃদয়।
মর প্রভু বিনে নাহি বসন্ত সময়।।

কাহিনীর শেষ অংশের পরিকল্পনায় নারায়ণ দেব সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মনসামঙ্গল কাহিনীর শেষাংশে দুটি প্রধান বিষয় রয়েছে- (১) বেহুলা-লখিন্দরের প্রত্যাবর্তন এবং (২) মনসার প্রতি চাঁদ সদাগরের আচরণ। একথা সত্য যে, '' মনসামঙ্গলের শেষাংশের ঘটনা কল্পনা মাত্র- কবিচিত্ত এই ঘটনার স্থান - বাস্তব জগৎ ইহার স্থান নহে। কিন্তু অক্ষম কবিগণ সর্বত্রই এই কল্পনাকেই সত্য কলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। সেইজন্যই তাঁহাদের কাব্যে রসসৃষ্টির ব্যাঘাত হইয়াছে ; নারায়ণ দেব এই ভুল করেন নাই, তাঁহার বর্ণনায় কল্পনা কল্পনাই রহিয়াছে। ..... অপূর্ব কৌশলে নারায়ণ দেব এই স্বপ্নকে রূপায়িত করিয়াছেন।''[১১]

সুকুমার সেন[১২] মনে করেন যে, নারায়ণ দেবের ' পদ্মাপুরাণ' (মনসামঙ্গল) অত্যন্ত খণ্ডিতভাবে রক্ষা পেয়েছে। কেননা, তাঁর কোন পুঁথি কিংবা কোন ছাপা বইয়ে (আধুনিক অসমীয় সংস্করণ ছাড়া) আগাগোড়া নারায়ণ দেবের ভণিতা দেখা যায় না। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের ব্যাপক প্রচারের কারণেই এমনটি হয়েছে বলে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য[১৩] অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাই তো পূর্বে উল্লেখিত নারায়ণ দেবের কাব্যে বিপ্র জগন্নাথ, বৈদ্য জগন্নাথ, জগন্নাথ দাস, বিপ্র জানকী নাথ, দ্বিজ বংশীদাস, শিবানন্দ, চন্দ্রপতি, দ্বিজ মনোহর, চন্দ্রাবতী, চন্দ্রধর, পদ্মাবতী, শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রমুখ কবি গায়েনদের সংযুক্ত ভণিতা দৃষ্টিগোচর হয়।

এটা মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, নারায়ণ দেবের কাব্যে সংস্কৃত পুরাণাদির আলোকে ' দেব খণ্ড'ই সর্বাধিক আলোকিত হয়েছে। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থে ' দেব খন্ড' খুবই সংক্ষিপ্ত তদুপরি অসম্পূর্ণ। এছাড়া ' নর খন্ডে'র বর্ণনাও খাপছাড়া। তাই '' ডঃ তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থটি নানা কারণে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়।''[১৪] কিন্তু নারায়ণ দেবের প্রকাশিত কাব্যের দুর্লভতার কারণে অত্র মুদ্রিত (সম্পাদনা - অধ্যাপক তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) কাব্য,[১৫] যাকে সম্পাদক ' খন্ডিত' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, সেখান থেকে নিচে দেব - দেবীর নাম সমূহ উদ্ধৃত করা হল -

মহেশ্বর, বাসুকি, শিব, পদ্মা, বিষহরি, নারদ মুনি, চন্ডিকা, ভবানী, চন্ডী, ত্রিপুরারি, শূলপাণি, বিধি, হর, ভগবতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ত্রিলোচন , মনসা, শঙ্কর, মহামায়া, ব্রহ্মা, গৌরী, মহাদেব, ভোলানাথ, নেতা, নেতাবতী, গঙ্গা, ভাগীরথী, পদ্মাবতী, বিশম্ভর, পশুপতি, রাম, ইন্দ্র, বিজয়া (পদ্মা), মহেশ, বিশ্বকর্মা, ধর্ম, পন্যানন, দুর্গা, চন্দ্র, সূর্য, কার্তিক, গণেশ, হরি, জগতগৌরী, অষ্টনাগ, আস্তিক, অগ্নি, গণপতি, ব্রহ্মা, নরসিংহ, বামন, কূর্ম' ধরণী, পরশুরাম, বলরাম, কানু (কৃষ্ণ), বুদ্ধ, অনল, পবন, রবি, শশী, রাহু, শনি, মদন, বৃহস্পতি, পুরন্দর, গদাধর, নিরঞ্জন, গোবিন্দ , কানাই, দেব গন্ধর্ব, নারায়ণ, গরুড়, বিধাতা , কশ্যপ, নিদ্রালি, যম, বরুণ, নবগ্রহ, অশ্বিনী কুমার, শাচীপতি, শচী, জয়ন্তী কুমার, রম্ভা, রোহিণী, শশধর, পার্বতী, ব্রহ্মা, বসুমতী, কামদেব, রতি, বিষ্ণু , দেবরাজ, দেবী সর্বমঙ্গলা, শ্রীহরি, ঊষা, অনিরুদ্ধ, দেবগুরু (বৃহস্পতি), নন্দী, পার্বতী, চিত্রগুপ্ত, সদাশিব, ধর্মরাজ, যমরাজ, সীতা, হনুমান, শ্রীরাম, সুরেশ্বরী, শিবলিঙ্গ, ব্রহ্মাণি (পদ্মা), সুভদ্রা, জগন্নাথদেব, দামোদর, রঘুপতি, মধুসূদন, রুদ্রাক্ষ।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত নারায়ণ দেবের ' পদ্মাপুরাণ', গবেষকদের বর্ণিত নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের আঙ্গিকের সাথে বড়ো রকমের বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। সেজন্যে নারায়ণ দেব ও পন্ডিত জানকী নাথের পদ্মাপুরাণ (মনসামঙ্গল)- এর তুলনামূলক পাঠ গ্রহণ প্রয়োজন যথাসম্ভব অসঙ্গতি দূরীকরণের জন্যে। বন্দনা, দেব খন্ড এবং বাণিয়া খন্ড - এই তিন পর্বে বিভক্ত বর্তমান কাব্যে কালিদাসের ' কুমার সম্ভবম' কাব্য, মহাভারতের আস্তিক পর্ব, বিবিধ শৈব পুরাণ প্রভৃতির সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। অবশ্য তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত গ্রন্থে যে ভাবে চন্দ্রপতি, বৈদ্য জগন্নাথ, বিপ্র জগন্নাথ, শ্রীজগন্নাথ, বংশীদাস, দ্বিজ জয়রাম, বল্লভ, মাধব, হরিদত্ত, দ্বিজ বলরাম (বলাই), শিবানন্দ ও বিপ্র জানকী নাথের ভণিতা সংযুক্ত আছে[১৬] সমশ্রেণীর বর্তমান নারায়ণ দেব ও পন্ডিত জানকী নাথের গ্রন্থের কোন কোন স্থলে দ্বিজ বংশী দাস, ষষ্ঠীবর, শিবরাম দাস প্রভৃতি কবির

Dhaka University Institutional Repository

দু'একটি ভণিতাও আছে।[১৭] উল্লেখ্য, পন্ডিত, দ্বিজ, বিপ্র প্রভৃতি উপাধিধারী জানকী নাথ খুব সম্ভবতঃ পূর্ববঙ্গের কবি এবং তাঁর আবির্ভাকাল অজ্ঞাত।[১৮]

আলোচ্য অংশে নারায়ণ দেব ও পন্ডিত জানকী নাথের গ্রন্থ (যার দেব খন্ডের প্রায় সকল অংশ নারায়ণ দেবের ও বাণিয়া খন্ডের প্রায় সকল অংশ জানকী নাথের রচিত)[১৯] থেকে পর্ব ভিত্তিক দেব-দেবীদের নাম তালিকাভুক্ত[২০] করে দেখান হয়েছে ঃ

বন্দনা অংশ ঃ

নারায়ণ, গোলক-পতি, জগন্নাথ, নিরঞ্জন, ব্রহ্মা, ত্রিলোচন, শঙ্কর, হর, পার্বতী, ভবানী, গৌরী, চন্ডিকা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, ভাগীরথী, মনসাদেবী, নাগমাতা, জগৎ-গৌরী, পদ্মাবতী, বাসুকী, জরৎকারু মুনি, আস্তিক মুনি, গণেশ, গণপতি, সিদ্ধিদাতা, ইন্দ্র, কার্তিক, ষড়ানন, ভগবতী, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, অনল, পবন, ভানু, দিবাকর, তুলসী, গন্ধর্ব।

দেব খন্ড ঃ

মহেশ্বর, শিব, মহেশ, মহাদেব, বিশ্বেশ্বর, ভূতপতি, শঙ্কর, হর, রুদ্র, ভোলানাথ, দিগম্বর, শিবলিঙ্গ, পিনাকী, পশুপতি, ত্রিলোচন, গিরিশ, সদাশিব, মৃত্যুঞ্জয়, আশুতোষ, যোগীন্দ্র, তাপস, পঞ্চানন, ত্রিপুরারি, ভব, নিরঞ্জন, অনাদি, বীরভদ্র, আদিভূত, বিশ্বনাথ, শম্ভু, সুধাকর, ভগবতী, অর্ধ- নারীশ্বর, চন্ডী, উমা, ভগবান, যোগমায়া, সতী, মহামায়া -দশ মহাবিদ্যা (কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা), বিধুমুখী, কমলিনী, পার্বতী, শারদা, আদ্যাশক্তি , রুদ্রাক্ষ, অভয়াদেবী, গিরিসুতা, জয়া, বিজয়া, শশীমুখী, গৌরী, চন্ডিকা, ভবানী, কৃত্তিকা, কাত্যায়নী, কেতুকা দেবী, গণেশ, গণপতি, গজপতি, গণদেবতা, বিষহরি, নাগমাতা, বাসুকী, মনসা, নেতা, সর্বজয়া, শঙ্করতনয়া, গৌরবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনয়নী, পদ্মাবতী, জগৎ-গৌরী, নাগিনী, কদ্রু-কন্যা, পদ্মা, ব্রহ্মাণী অযোনিসম্ভবা, জরৎকারু, আস্তিক, শঙ্খ মুনি, ধনঞ্জয়, কশ্যপ, অদিতি, যম, বিধাতা, বসুমতী, ইন্দ্র, গরুড়, কন্দর্প , মদন, কুবের , বিধি, বাসব, পৃথিবী, দেবরাজ, সহস্রলোচন, সুরপতি, গন্ধর্ব-গন্ধর্বী, পুরন্দর, নন্দী, বিদ্যাধর- বিদ্যাধরী, কিন্নর-কিন্নরী, অপ্সরা, রতি, বসন্ত, কামদেব, অনঙ্গ, বিরূপাক্ষ, রম্ভা, চিত্ররেখা, উর্বশী, জটাধর, চন্দ্রধর, গঙ্গাধর, কপর্দী, অষ্টনাগ, ষড়ানন, কার্তিকেয়, কুবের, দেব সেনাপতি, দেবগুরু, বৃহস্পতি, কামধেনু , নবগ্রহ, চন্দ্র, সূর্য, দশ দিকপাল, শীতলা, কামদেবী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, প্রজাপতি,

Dhaka University Institutional Repository

নারায়ণ, পদ্মযোনি, অনল, দক্ষ প্রজাপতি, পবন, আদিত্য, পতিতপাবন, গদাধর, লক্ষ্মীপতি, হরি, কূর্ম, মৎস্য, বরাহ, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি, কাল, জগন্নাথ, নারদ ঋষি, শুক্র, চক্রপাণি, দেব দামোদর, শ্রীহরি, গঙ্গা, বামন, ত্রিলোকমোহিনী, ত্রিপথগামিনী, জাহ্নবী, অমোঘা, লৌহিত্য, মন্দাকিনী, ভোগবতী, রোহিণী, শশী, দিবাকর, নিশাপতি, কৃষ্ণ, রুক্মিনী, শ্রীমধুসূদন, অগ্নি, স্বাহা, হুতাশন, বহ্নি, কার্তিক, শনি, বরুণ, বায়ু, ত্রিদশ দেবতা, দিনপতি, সাবিত্রী, শশধর, ভাস্কর, রাম।

বাণিয়া খণ্ড ঃ

বিষহরি, মনসা, পদ্মা, নেতা, পদ্মাবতী, অষ্টনাগ, শিবসুতা, আস্তিক মুনি, বাসুকী, ব্রহ্মাণী, জগৎ-গৌরী, অষ্ট দিকপাল, দশ দিকপাল, জরৎকারু মুনি, নাগেশ্বরী, বিদ্যাধর, অনিরুদ্ধ, কামের কুমার, বিদ্যাধরী, উষা, বাণের কুমারী, ষষ্ঠী, নারদ মুনি, মহেশ্বরী, শঙ্কর, পার্বতী, মহেশ্বর, মহাদেব, মহেশ, মহাযোগী, ভৈরব, রুদ্র, ত্রিশূলধারী, শিব, শম্ভু, পরম ব্রহ্মা দেব নারায়ণ , মদন, রতি, ইন্দ্র, চণ্ডিকা, চন্ডী, ডাকিনী, হরি, কার্তিক, শনি, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, প্রজাপতি, বসুমতী, কালিকা, বিধাতা, বিষ্ণু, সদাশিব, সূর্য, চন্দ্র, অনল, ধর্মরাজ, পুরন্দর, বিধি, কাম, অনঙ্গ, কুবের, বিশ্বকর্মা, কৃষ্ণ, শিবলিঙ্গ, গোবিন্দ, কমললোচন, ধর্ম, ভব, গঙ্গা, হর, অগ্নি, গায়ত্রী, গৌরী, যম, ভগবান, দামোদর, শ্রীরাম, শচী, সীতা, গুরু বৃহস্পতি, জাহ্নবী, পুরন্দর, ভবানী, বিধাতা, যমদূত, নন্দী, ত্রিলোচন, জানকী, লক্ষ্মণ, রুক্মিণী, সহস্রলোচন, দামোদর, যদুরায়, জগন্নাথ, গদাধর, সত্যভামা, পবন, কামদেব, জয়ন্ত, গণপতি, সাবিত্রী, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, নবগ্রহ, চিত্র সেন (গন্ধর্ব), উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, অপ্সরা, অপ্সর, সুরপতি, দেবরাজ, বাণী, শশী, শচীরাণী, ধর্ম, যমরাজ, অশ্বিনী, রাহু, শনি, অলক্ষ্মী, দুর্গা, রুদ্রবতী, কৃত্তিবাস, দিগম্বর, পঞ্চানন, নন্দী, ভৃঙ্গী, শঙ্করী, সুরধনী, সুরেশ্বরী, ঈশ্বরী, বিষমুখী, দন্ডী, বিধি, রোহিণী, ত্রিদশ দেবতা, তেত্রিশ কোটি দেবতা, শুক্র , মা তারা, মা বরদা, হরি, মীন, কূর্ম, বরাহ, বসুমতী, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি, ভারতী দেবী, রাই বিনোদিনী, বীণাপাণি, রাই, রাই রঙ্গিনী, শ্যাম, চন্দ্রা (চন্দ্রাবতী), কানু, জয়ন্ত, শচীপুত্র, রুদ্র, হুতাশন, বলভদ্র, গন্ধর্ব - অপ্সর - কিন্নর- যক্ষ-রক্ষদল, আদিত্য, গৌরচাঁদ, শচীমাতা, বনমালী, রাম রঘুবর, কমললোচন, ডাকিনী, যোগিনী , দীননাথ।

বিজয় গুপ্ত ঃ

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মতথ্যের উজ্জ্বল আকর গ্রন্থ । কাব্যের ভাষা সম্পূর্ণ মার্জিত না হলেও এখানে গ্রামীণ জীবনের স্পন্দন পাওয়া যায়। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ

Dhaka University Institutional Repository

বা মনসামঙ্গল বাংলার জনপ্রিয় কাব্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। শুধু মনসামঙ্গল নয়, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কবিদের মধ্যেও বিজয় গুপ্তই প্রথম যিনি কবির আবির্ভাব-স্থান ও অন্যান্য দিক সম্পর্কে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করে গেছেন। এদিক থেকে বিচার করলে চৈতন্য- পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে বিজয় গুপ্তের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

বিজয় গুপ্তের ' পদ্মাপুরাণ'- এর রচনাকাল সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে মতদ্বৈধতা লক্ষণীয়। '' তার কারণ এর পুথি খুবই দুর্লভ এবং বিভিন্ন ছাপা বইতে বিভিন্ন রচনাকালবাচক শ্লোক পাওয়া যায়। তাই অনেকে এইসব শ্লোকের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারেননি।''২১ এ প্রসঙ্গে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন যথার্থই বলেছেন - '' প্রাচীন কবিগণের স্বরূপ আবিষ্কার করা সহজ কর্ম নহে। বিজয় গুপ্তের ছদ্মবেশে ' জয়গোপালগণ' ঐতিহাসিক মরীচিকা উৎপাদন করিতেছেন। সেই গাঢ় ভ্রম-সমুদ্র হইতে রত্ন উঠাইতে যাইয়া অনেক সময় শঙ্খ লইয়া ফিরিতে হয়। পূর্ববর্তী কাব্যগুলির ন্যায় বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণেও নানা হস্তস্পর্শে, নানা তুলির বর্ণক্ষেপে পরিশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে। সুবেন্দ্র দিবালোক এবং উদিত নক্ষত্রালোক যেরূপ সান্ধ্যগগনে মিশিয়া যায়, প্রাচীন কালের ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবিগণের লেখাও সেইরূপ মিশিয়া গিয়াছে ; বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে প্রকাশ্যভাবে অন্যান্য কবির ভণিতারও অভাব নাই।''২২

বিজয় গুপ্ত তাঁর আত্ম-পরিচয় কাব্যমধ্যে যেভাবে দিয়েছেন তা থেকে বুঝা যায় - '' ফতেয়াবাদ মুল্লুকস্থ (অর্থাৎ বর্তমান ফরিদপুর এলাকা) ঘাঘরা ও ঘণ্টেশ্বর নদীর মধ্যবর্তী স্থানে ফুল্লশ্রী গ্রামে কবির জন্ম হয়। ফুল্লশ্রী বর্তমান বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামের একটি পল্লী। কবির পিতার নাম সনাতন ও মাতার নাম রুক্মিণী।''২৩ এই গ্রামে বিজয় গুপ্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলে পরিচিত মনসার মূর্তি বর্তমানেও পূজিত হয়ে থাকে।২৪

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের পুঁথি বেশি পাওয়া যায়নি। যে পুঁথিগুলো পাওয়া গেছে তার কয়েকটিতে কাব্য রচনাকাল নির্দেশে শকাব্দ ব্যবহৃত '' হেঁয়ালির ভঙ্গিতে এবং হেঁয়ালির ভাষাও সব পুঁথিতে এক নয়।''২৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত এবং জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত ' কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ' - এ হেঁয়ালির ভাষা হচ্ছে -

''ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান হুসন রাজা পৃথিবী পালক।।''[২৬]

অবশ্য, সম্পাদক পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন - তাঁর সংগৃহীত পুঁথিগুলোর মধ্যে দুটোতে নিম্নলিখিত পাঠ রয়েছে -

'' ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন সাহা নৃপতিতিলক।।''[২৭]

বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত বিজয় গুপ্তের মুদ্রিত অন্য একটি পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল - এ উপরোক্ত হেঁয়ালিটা এভাবে পাওয়া যায় -

'' ঋতু শূন্য বেদ মুঞ্চ পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন শা নৃপতি তিলক।।''[২৮]

উপরোক্ত হেঁয়ালি তিনটির প্রথম দুটোর মর্মোদ্ঘাটন করলে যথাক্রমে ১৪১৬ শকাব্দ বা ১৪৯৪ খ্রীস্টাব্দ এবং ১৪০৬ শকাব্দ বা ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়। তৃতীয় হেঁয়ালিটার অর্থ পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে না। এরূপ আরও বিভিন্ন হেঁয়ালি যেমন -'' ছায়া শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক''[২৯] অর্থাৎ ১৪০০ শকাব্দ বা ১৪৭৮ খ্রীস্টাব্দ প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যায় ; হেঁয়ালিসমূহে উল্লেখিত '' সুলতান হুসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৫১৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন।''[৩০] তাই , কোন রকম জটিল বিতর্কে না গিয়ে বলা যায়- বিজয় গুপ্তের কাব্য হুসেন শাহের সিংহাসন লাভের পর রচিত হয়, রচনাকাল ১৪৯৪ খ্রীস্টাব্দ বলে অনুমান করা যায়।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বর্ণিত পৌরাণিক স্থান এবং চরিত্রগুলো সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমত হচ্ছে - '' কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। যদি তাঁহারা নিজ নিজ অভ্রভেদী মূর্তি ধারণ করিবার চেষ্টা মাত্র করিতেন, তাহা হইলে বাংলার গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের স্থান হইত না।''[৩১] প্রাকচৈতন্য যুগেই বিজয় গুপ্তের রচনায় এই ভাবটির সর্বোত্তম বিকাশ ঘটতে দেখা যায়, পরবর্তী কালেও যে ধারা বহতা নদীর মতোই বয়ে চলেছে। এই সম্পর্কে বিজয় গুপ্তের শিব ও চণ্ডীর চরিত্র দু'টির কথা উল্লেখ না করলেই নয়। এঁদের মধ্যকার দেবত্বটুকু সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে তিনি যে কেবলমাত্র গ্রাম বাংলার মাটির কাছাকাছি বাঙালীত্বটুকু উদ্ধার করেছিলেন, তা প্রাচীন বাংলার দেবমাহাত্ম্য- প্রচার মূলক কাব্যের একটি বড় বিস্ময়। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

যাবে। গ্রাম বাংলার কবি বিজয় গুপ্তের নিঃস্ব বাঙালী গৃহস্থ-প্রতীক হর-গৌরীর কন্যা পদ্মার বিবাহোৎসবকালীন সংলাপের কিয়দংশ নিম্নরূপ ঃ

"গৌরী বোলে কর লাজ তোমার মুখে নাহি লাজ
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।।
আইয় আসিবে মঙ্গল গাইতে তারা চাবে পান খাইতে
তৈল সিন্দুর পাইব কথায়ে।
হাসি বোলে শূলপাণি আইয় ভাড়াইতে জানি
লেংগটা হইয়া মধ্যে দাঁড়াইব।।
দেখিয়া আমার ঠান আইয়র উড়িব প্রাণ
লজ্জা পাইয়া জাবে পলাইয়া।"[৩২]

তাহ'লে আর পান-গুয়া-তেল- সিঁদুর লাগাব না, অথচ কোন রকম খরচ ছাড়াই মঙ্গলগানের উৎসব হয়ে যাবে। কত দরিদ্র, নিঃস্ব হলে মানুষ মেয়ের বিয়েতেও এ হেন ছল - চাতুরীর আশ্রয় নিতে পারে সেটা নিঃস্ব লোকের অন্তরের ক্ষোভ ও যন্ত্রণাকে সম্যক অনুধাবনকারী গ্রাম-বাংলার কবি বিজয় গুপ্তের পক্ষেই প্রকাশ করা সম্ভব।

বিজয় গুপ্তের কাব্য বিভিন্ন পালায় বিভক্ত। এই পালাভাগ (যেমন- স্বপ্নাধ্যায় পালা, মনসার জন্ম পালা, বিচ্ছেদ পালা, বস্ত্র বদল পালা ইত্যাদি) - এর ফলে কাহিনীর সামগ্রিকতা এবং চরিত্রের সংহতি বহুলাংশে নষ্ট হয়েছে এবং রচনার কাব্য গুণ ও বিঘ্নিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও কবি বিজয় গুপ্ত ছন্দ, অলংকার এবং বাচন ভঙ্গির কলাকৌশলের দ্বারা পাঠক সাধারণকে যেভাবে আকৃষ্ট করার প্রয়াস চালিয়েছেন সেটা সত্যি প্রশংসনীয়। তাঁর রচনার অনেক অংশ[৩৩] আজ বাংলার জনজীবনে বহুপ্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনের মর্যাদায় সমাসীন।

" অতিকোপে করিলে কাজ ঠেকে আথান্তর।
অতি বড় গাঙ্ড় হইলে ঝাটে পড়ে চর।।"
"যেই মুখে কন্টক বৈসে সেই মুখ খসে।"

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববর্তী কবি নারায়ণ দেবের সঙ্গে বিজয় গুপ্তের বেশ কিছু অমিল পরিলক্ষিত হয়। বিজয় গুপ্তের কাব্য কিছু খণ্ড খণ্ড বাস্তবচিত্রের সমাহারে রচিত হয়েছে, পক্ষান্তরে নারায়ণ দেবের কাব্য স্রোতস্বিনীর একটি অখন্ড ধারার ন্যায় নিরন্তর প্রবাহে এগিয়ে গিয়েছে, বস্তুভারে কোথাও আটকে বা থেমে থাকেনি। সেজন্যে খণ্ড খন্ড চিত্র এবং ছোট ছোট চরিত্রগুলো বিজয় গুপ্তের রচনায় যেমন সুপরিস্ফুট হয়েছে, নায়ক-নায়িকার চরিত্র তেমনটি হতে পারেনি ; নারায়ণ দেবের মধ্যে এর উল্টোটি দেখা যায়। এ দিক থেকে বিচার করতে গেলে বিজয় গুপ্তকে নারায়ণ দেবের পরিপূরক (complement) হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ সম্পাদনাকালে সম্পাদক জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত কবি সম্পর্কে ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন, '' দ্বিজ বিপ্রদাসের রচনা পান্ডিত্যের আলোকে ভরপুর। বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বর্ণনা এবং রচনাকৌশলের ভিতরে কবির শাস্ত্রজ্ঞান এবং অপরিসীম পান্ডিত্যের পরিচয় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ছন্দের বাধুনি এবং বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের ভিতরেও সর্বত্র পন্ডিতজনোচিত বিবৃতির পরিচয় আছে। কিন্তু কবি বিজয় গুপ্তের রচনায় পান্ডিত্যের পরিচয় অপেক্ষাকৃত কম। ছন্দের বন্ধন কোন কোন ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়া উহা আভিধানিক পরিভাষানুসারে সর্বাংশে উচ্চাঙ্গ কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু স্বভাব-কবিত্বের সৌন্দর্যসম্ভারে তাহা ভরপুর। বর্ণনার প্রাঞ্জলতায় এবং রচনার সরসতায় উহা অধিকতর প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। এইজন্যই হয়ত বা সেদিনকার সাহিত্যমোদী বাংলার নবাব হুসেন সাহ কবিকে '' ছোট বিদ্যাপতি '' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।''[৩৪]

বর্তমান আলোচনায় কবি বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' থেকে দেব-দেবীদের নাম সংকলন করা যেতে পারে। তার আগে বলে রাখা প্রয়োজন যে, আলোচনা ক্ষেত্রে কবির একাধিক মুদ্রিত গ্রন্থ (বিভিন্ন জনের সম্পাদিত / সংকলিত) থাকা সত্ত্বেও জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত (এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত) গ্রন্থটিকেই (গবেষণার জন্যে সর্বোত্তম বিবেচনা করে) আলোচনায় ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রন্থের[৩৫] সূচীপত্র থেকে 'মঙ্গলকাব্যের সংস্কারগত রূপাঙ্গিক '- এর আলোকে বিভাজনের মাধ্যমে দেব-দেবীর তালিকা দেওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বন্দনা অংশ ঃ

সরস্বতী, গণপতি, অষ্ট লোকগণ, ব্রহ্মা, হরি, হর, কশ্যপ, জরৎকার মুনি, পুরন্দর, আস্তিক মুনি, ইন্দ্র, শচী, বারাহী, চামুন্ডা, মহামায়া, দেবগুরু, অশ্বিনীকুমার, গঙ্গা, ভাগীরথী, ভগবতী, কমললোচন, গোবিন্দ গরুড়, চন্দ্র, সূর্য, জগৎগৌরী, বিষহরি, ধর্ম, অষ্টনাগ, পদ্মা।

দ্বিতীয় অংশ ঃ

(গ্রন্থোৎপত্তির কারণ)

মনসা, পদ্মাবতী, গোসাঁই (শিব), চন্ডিকা, চন্ডী, হরি, রাম, গোবিন্দ ।

দেব খন্ড ঃ

হরি, মনসা, যম, কাম, রাম, দেবগুরু, সৃষ্টির ঠাকুর, দেবগণ, শিব, নারদ তপোধন, গোসাঁই, ইন্দ্র, মদন, চন্ডী, ডাকিনী, যুগিনী, শূলপাণি, হরনন্দী, চন্ডিকা, ত্রিলোচন, পার্বতী, নিদ্রালি, গৌরী, মহেশ্বর, সূর্য, অনঙ্গ, রতি, চন্দ্র, অগ্নি , অনল, বাসুকি, বিষহরি, বসুমতী, পদ্মাবতী, মহাদেব, অযোনিসম্ভবা, নাগিনী, নাগকন্যা, শিবকন্যা, পদ্মা, ভুবনমোহিনী , ইন্দ্রাণী, রোহিনী, বিদ্যাধরী, বিধাতা, গন্ধর্ব, যক্ষবর, ঈশ্বর, পন্চানন, ঈশ্বরী, জগৎ-মাতা, সদাশিব, ভোলানাথ, কার্তিক, মহামায়া, ভগবতী, ভবানী, চুড়ামণি, গঙ্গা, চন্ডী, ত্রিজগত-পতি, জয়া, বিজয়া, শঙ্কর, সুচরিত্রা, সুমিত্রা, জাহ্নবী, ধর্ম, ত্রিপুরারি, শূলপতি, পবন, আকাশ, বায়ু, গঙ্গা, গণপতি, জগৎ-নাথ, ত্রিদশ দেবতা, ব্রহ্মা, জগতমোহন, মহেশ, ভুত, পিশাচ, মহেশ্বর, গদাধর, পশুপতি, কামপতি, জরৎকারু মুনি, দেবরাজ, জগতগৌরী, বিশ্বকর্মা, দেবেশ্বর (শিব), দেবঋষি, ধনেশ্বর, কুবের, ভানু, আস্তিক, অষ্টনাগ, গরুড়, কামধেনু, জগদীশ, নারায়ণ, ষড়ানন, বিষ্ণু, মহেশ্বরী, লক্ষ্মী, লক্ষ্মীপতি, দুর্গা, চন্দ্রচুড়ামণি (শিব), হরি, ত্রিজগতের নাথ, নেতা, ব্রাহ্মণী (পদ্মা)।

বাণিয়া খন্ড ঃ

নেতা, বিষহরি, মনসা, পদ্মাবতী, নিদ্রাবতী, পদ্মা, ধর্ম, তুলসী, গোসাঁই, রাম, মহেশ্বর, হর, গৌরী, মহাদেবী, ধোপার কুমারী (নেতা), শিব, ব্রহ্মাণী (মনসা), ঠাকুরাণী (পদ্মা) , শূণপাণি, নারায়ণ, অগ্নি, গঙ্গাদেবী, কানাই, শিবের কুমারী (পদ্মা/নেতা), বিদ্যাধরী, গন্ধর্ব, অনিরুদ্ধ , উষা, মহাদেব, ত্রিলোকের নাথ, ত্রিদশ দেব, দেবতাগণ, ত্রিলোচন, জয়া, বিজয়া, ভবানী, নারদ মুনি, কার্তিক, গণেশ, অশিনী কুমার, ব্রহ্মা, উর্বশী, চিত্ররেখা, কামদেব, ত্রিপুরারি, ভুবনকারণ, ত্রিলোকের পতি, সর্ব দেব, সদাশিব,

Dhaka University Institutional Repository

অনল, হুতাশন, ইন্দ্র, চন্দ্র, দিবাকর, চিত্রগুপ্ত, যমদূত, যমরাজ, জাহ্নবী, অষ্টনাগ, চতুর্দশ যম, বিষ্ণুদূত, নাগিনী, বিধাতা, চক্রপাণি, ধর্মরাজ (যম), বিধি, বাসুকি, ব্রাহ্মণী, বিষ্ণু , ঈশ্বর, নীলকণ্ঠ, ঈশ্বরী, সূর্য, ষষ্ঠী, গঙ্গা, ভাগীরথী, অষ্ট লোকপাল, লক্ষ্মী, সরস্বতী, উমা, দুর্গা, পবন, চন্ডী, কালিকা দেবী, মন্দাকিনী, রাম, হর, দুর্গা, পশুপতি, পবন, ভগবতী, পতিতপাবন, দশভুজা, গৌরী, জগৎগৌরী, শিবলিঙ্গ, বিদ্যাধরী, কুবের, নবগ্রহগণ, মহামায়া, শ্রীরাম, মদন, গোপাল, গোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণ, প্রজাপতি, ধনেশ্বর, সুরপতি, দেবরাজ, ডাকিনী, যোগিনী, রতি, ধনপতি (নেতার পুত্র), আদ্যের দেবতা (পদ্মা), বরুণ, রাম, লক্ষ্মণ , হনুমান, ষোড়শ মাতৃকা (গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা, কুলদেবতা)।

বিপ্রদাস ঃ

বিপ্রদাস পিপলায় বা পিপলাই বা পিপিলাই - কে বিজয় গুপ্তের প্রায় সমসাময়িক কবি বলে মনে করা হয় । ডঃ সুকুমার সেন - এর মতে - '' বিপ্রদাস মনসা - পাঞ্চালীর সবচেয়ে পুরানো কবি। তাঁহার রচনা অখন্ডিত ও অচ্ছিন্ন রূপে পাওয়া গিয়াছে। মনসার সম্পূর্ণ কাহিনী একমাত্র বিপ্রদাসের কাব্যেই লভ্য।''৩৬ উল্লেখ্য, বিপ্রদাসের ' মনসাবিজয় ' কাব্য ডঃ সুকুমার সেনের হাতে সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে ডঃ সেন বলেছেন - '' এই কাব্যের দুইটি খন্ডিত পুথি পাইয়া কবির প্রথম পরিচয় প্রকাশ করিয়াছিলেন হর প্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৯৭) । অষ্টাদশ শতাব্দীর তিনটি পুথি অবলম্বনে সম্পূর্ণ গ্রন্থ বিপ্রদাসের মনসাবিজয় নামে এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক Bibliotheca Indica গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৫৩ অব্দ) আমার সম্পাদনায়। ..... ভণিতায় ' মনসাবিজয়' ও ' মনসামঙ্গল' দুই নামই আছে, তবে ' মনসাবিজয় ' বেশিবার ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই জন্য ইহাই বিপ্রদাসের কাব্যের নাম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।''৩৭ এ কাব্যে রচনাকাল - জ্ঞাপক নিম্নোক্ত পদটি পাওয়া যায় ঃ

'' সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ
নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ের প্রধান।
হেনকালে রচিল পদ্মার ব্রত গীত
শুনিয়া দ্রবিদ লোক পরম-পীরিত।
পদ্মাবতী - চরণসরোজ মধুলোভে
দ্বিজ বিপ্রদাস তথি ভৃঙ্গরূপে শোভে।।''৩৮

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত পদ থেকে অনুমিত হয় যে, ১৪১৭ শতাব্দ বা ১৪৯৫ - ৯৬ খ্রীস্টাব্দই বিপ্রদাসের মনসাবিজয় (মনসামঙ্গল) কাব্যের রচনাকাল । মঙ্গলকাব্যের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য সুকুমার সেন সম্পাদিত বিপ্রদাসের মনসাবিজয় - এর ভাষা ও ভঙ্গিকে হর প্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত বিপ্রদাসের দু'খানি খন্ডিত পুঁথির ভাষা ও ভঙ্গির তুলনায় '' আরও আধুনিক ''৩৯ বলে মনে করেন। পাশাপাশি, অধ্যাপক ভট্টাচার্য আরও মন্তব্য করেছেন - '' কোন প্রাচীন-পদ সঙ্কলন বা বাইশায় তাঁহার (ভণিতাযুক্ত) কোন পদ ধৃত হয় নাই। খ্রীস্টীয় পন্নদশ শতাব্দীতে বিপ্রদাস নামক কোন কবির আবির্ভাব হইয়া থাকিলে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে লিখিত তাহার কোন পুঁথির কিংবা পদ সঙ্কলনে ধৃত কোন পদের নিশ্চয়ই সাক্ষাৎকার লাভ করা যাইত।''৪০

সন্দেহ বা বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও ধরে নেয়া যায় , বিপ্রদাসের ' মনসামঙ্গল' ১৪১৭ শকাব্দেই (১৪৯৫-৯৬ খ্রীঃ) রচিত হয়েছিল, অবশ্য পরে তাতে বহু প্রক্ষিপ্ত অংশ সংযুক্ত হয়েছে। কাব্যের প্রথম পালায় কবি উল্লেখ করেছেন -

'' সংক্ষেপে পদ্মার ব্রত কহিল মঙ্গলগীত
বিস্তারে কহিব সপ্ত নিশি।''৪১

কিন্তু অত্র কাব্যটিতে (ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত এবং কলকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত) তেরটি পালা রয়েছে। এর থেকে অনুমিত হয় যে, কবি বিপ্রদাস প্রথমে সাতটি পালার মাধ্যমেই কাব্যটিকে পূর্ণতা দান করেছিলেন। পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত উপাদান যুক্ত হওয়ার ফলে কাব্যটির কলেবর বেড়েছে এবং সাতটি পালাকে ভেঙ্গে তেরটি পালায় রূপান্তরিত করা হয়েছে।

বিপ্রদাস তাঁর কাব্যের প্রথম পালায় সংক্ষিপ্ত আত্ম-পরিচয়ে বলেছেন -

''মুকুন্দ-পন্ডিত সুত বিপ্রদাস নাম
চিরকাল বসতি নাদুড্যা বট্ট গ্রাম।
বাৎস্য গোত্র পিপলায় পন্চ প্রবর
সামবেদ কুতুব শাখা চারি সহোদর ''৪২

অন্য পুঁথিতে কবির আত্ম-পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

'' মুকুন্দ পন্ডিত সুত বিপ্রদাস নাম।
চিরকাল বসতি বাদুড্যা বটগ্রাম..
বাৎস্যগোত্র পিপ্পিলাই পন্চপ্রবর।
সামবেদ কৌথুম শাখা চারি সহোদর।।''[৪৩]

দেখা যাচ্ছে , কবি বিপ্রদাসের পিতার নাম ছিল মুকুন্দ পন্ডিত ; তাঁরা সামবেদী ব্রাহ্মণ কুতুব (কৌথুম) শাখা ; বাৎস্য গোত্র, পন্চ প্রবর- পদবী ' পিপলায়' বা ' পিপ্পিলাই' । নিবাস নাদুড্যা (বাদুড্যা) বটগ্রাম। এই নাদুড্যা কিংবা বাদুড্যা কোথায়, তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের প্রাপ্ত চারখানা পুথির (তিনখানি খন্ডিত এবং একখানি পূর্ণাঙ্গ) প্রাপ্তিস্থান চব্বিশ পরগণা জেলার বশির হাট মহকুমা।[৪৪] এখানে কবির ' বসতি ' বলে উল্লেখিত ' বাদুড্যা ' গ্রামের পাশাপাশি সমনামে বাদুড়িয়া থানাও রয়েছে। আবার নাদুড্যা < নাদুড়িয়া নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রামও আছে। বলা যায় - বিপ্রদাস পশ্চিমবঙ্গেতো বটেই, '' এই দু'টি গ্রামেরই কোন একটিতে ''[৪৫] তাঁর নিবাস তথা বসতি ছিল।

বিপ্রদাসের রচনার প্রধান গুণ হচ্ছে - কাব্যের কাহিনীটির ঘটনা প্রবাহে কোনরূপ অস্বচ্ছতা নেই। বর্ণনাভঙ্গিতে যথাসম্ভব সংযত এবং সংহত ভাব বজায় রেখে কাহিনীটির ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করা হয়েছে । তাঁর কাব্যে যথেষ্ট আন্তরিকতার ছোঁয়া পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ হিসেবে তাঁর কাব্যের হাসান - হুসেনের পালাটির কথাই বলা যায়। কবি বিপ্রদাস তৎকালীন মুসলমান সমাজের এক বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন এখানে। স্বল্প পরিমিত স্থানে কবি সমকালীন মুসলমান সমাজের চাকর-গোলাম-নফরদের ব্যবহারের একটি কৌতুকপ্রদ চিত্র এঁকেছেন। মনসার সাথে বিরোধের ফলে প্রভু বড় মিঞার মৃত্যু হলে -

'' মিঞা যদি ফৌত হৈল গোলামেরে খোয় পাইল
বিবি লৈয়া পলাইতে চায়।''[৪৬]

বড় মিঞার মৃত্যুতে চাকর - গোলামদের মধ্যে বিবি লাভের যে ব্যস্ততা পড়ে গেছে তা সে সময়কার সমাজের একটি দিককে ফুটিয়ে তোলে। যা হোক, '' বিপ্রদাসের কাব্যের ভূমিকাগুলি, দেব হোক বা

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ হোক, স্বভাবসঙ্গতভাবে চিত্রিত হইয়াছে।''[৪৭] মোট কথা, '' বিপ্রদাসের কাব্য শান্ত স্নিগ্ধ শ্রীতে মন্ডিত হওয়ায় অন্যান্য কবির মনসামঙ্গল থেকে স্বভাবতই স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে ।''[৪৮]

এখানে কাব্যের[৪৯] সূচী পত্র থেকে ' মঙ্গলকাব্যের সংস্কারগত রূপাঙ্গিক ' - এর সাথে সঙ্গতি রেখে দেব-দেবীদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

বন্দনা অংশ ঃ

গণপতি, শৈলসুতা, নিরঞ্জন, ব্রহ্মা, নারায়ণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মহাদেব, গঙ্গা, ত্রিলোচন, শূলপাণি, মাহেশ্বরী, অষ্টাদশভুজা, কার্তিক, ডাকিনী, জুগিনী, ধর্ম, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ, আনল, কুবের, ঈশান, দিগপাল, নবগ্রহ (রবি, শশী, ভৌম, বুধ, গুরু, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু), নারদ ঋষি, বিদ্যাধর, জরৎকার মুনি, পদ্মা, অস্তিক, নেতো, বিষহরি, বাসুকি, ভাগীরথী।

দ্বিতীয় অংশ ঃ

(গ্রন্থোৎপত্তির কারণ)

আযোনিসম্ভবা, মহাদেব, বাসুকি, পাতালকুমারী, নাগেশ্বরী, পদ্মাবতী, ত্রিপুরারি, মনসা, নিরঞ্জন, ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণী, শূলপাণি, যোগেশ্বরী, সরসযোগিনী, চন্ডী, শ্বেতাম্বরী, নির্বাসিনী, পার্বতী, পর্বতবাসিনী, জরৎকার, জগৎ-গৌরী, পতি-মন্দদরী, জাগিয়া, জাগুলী, সিজ-বৃক্ষ, পদ্মা।

দেব খন্ড ঃ

গোসাঞি, পবন, জ্যোতির্ময়, আকাশ, বসুমতী, আদ্যা - শক্তি, ব্রহ্মা, হরি, হর, মহেশ্বর, ত্রিলোচন, বিশ্বপতি, চন্ড, নারায়ণ, গঙ্গা, পশুপতি, ভাগীরথী, দেবগণ, শঙ্কর, নিরঞ্জন, মনসা, অনাদ্য, রুদ্রাক্ষ, শিব, ধর্ম, শূলপাণি, মহাদেব, পরম ব্রহ্ম, বিষ্ণু, সাবিত্রী, লক্ষ্মী, ইন্দ্র, শচী, দশ দিগপাল, দ্বাদশ আদিত্য, নবগ্রহণ, নারদ ঋষি, বাসুকি, রুদ্র, জগদীশ, বিভুতিভুষণ, হেমন্তনন্দিনী, গৌরী, ভগবতী, মহেশ, কাম, মন্মথ, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, মহামায়া, অর্ধ অঙ্গে গৌরী, নন্দী, ত্রিদশ - ঈশ্বর, ভুতনাথ, পদ্মা, প্রমথ, চন্ডিকা, ভবানী, উমা, ত্রৈলোক্য -জননী, হরপ্রিয়া, সতী, ত্রিপুরারি, মদন, হুতাশন, দেবনাথ, পন্চানন, নেতো, অস্তিক, বিষহরি, শশধর, পদ্মাবতী, নির্মাণি, পরমানন্দময়, ত্রিদশ রায়, কৃত্তিবাস, গরুড়, সূর্য, কশ্যপ,

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবী, দেব-ঋষি, আনল, বিধি, উমা, মাহেশ্বরী, কার্তিক, গণাই, অগ্নি, সিজ - বৃক্ষ, ধামাই, বিশ্বকর্মা, হনুমান, গন্ধর্ব, বিশ্বম্ভর, যম, অগ্নি, প্রজাপতি, হর, জগতী, জগত-জননী, অযোনিসম্ভবা, বিধাতা, বিদ্যাধর-অপ্সর, পবন, বিদ্যাধরীগণ, পুরন্দর, সহস্রনয়ান, কমলা, সুরপতি, সুর-গন্ধর্ব-কিন্নর, জগতগৌরী, লক্ষ্মী, কুবের, চন্দ্র, পশুপতি, ঈশ্বরী, সর্বদেব, কূর্ম, অপ্সরাগণ, গদাধর, কাম, ত্রৈলোক্যসুন্দরী, বিধাতা, সীতা, জগদীশ, জগৎ-নাথ, গণপতি, ষড়ানন, চক্রপাণি, গৌরী, গঙ্গাধর, ত্রিভুবনেশ্বর, জটাধর, চন্ডী, মাহেশ্বরী, পার্বতী, বিষহরি, মহাযোগী, হর-নন্দিনী, মহারুদ্র, ত্রিভুবননাথ, ত্রিলোচন, জরৎকার মুনি, ভৈরব, বেতাল, কিন্নর, বিদ্যাঙ্গনা, দেবরাজ , মাতৃকাগণ, প্রমথনাথ, ভূতনাথ, অস্তিক, রাধা, কানু, শমন, শশিমুখী, ব্রহ্মাণী, বৃহস্পতি, সুরনাথ, শচীপতি।

বাণিয়া / বণিক খন্ড ঃ

শিব, দুর্গা, কুবের, মদন, হর, মহেশ্বর, গৌরী, পিণাকী, ভূতনাথ, শঙ্কর, চন্ডী, পদ্মাবতী, হরপ্রিয়া, পদ্মা, মনসা, বিষহরি, নেতো, অমরগণ, দিকপাল / দিগপাল, পৃথিবী, পার্বতী, পবন, জগতগৌরী, হরসুতা, ধরণী, অস্তিক, অস্তিক-জননী, নাগবাহিনী, মহামায়া, গগন, ধামাই, সিজ-শাখা, বিদাকর, যম, গোমাঞি, তুলসী, পবন, বাসুকি, অগ্নি, জগত-জননী, জগত-ঈশ্বরী, নিরঞ্জন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, চন্দ্র, নারায়ণ, সূর্য, ইন্দ্র, বরুণ, আনল, বায়ু, বিধি, অপ্সর-কিন্নর-গন্ধর্বগণ, অপ্সরী-কিন্নরী, বৃহস্পতি, রবি, গণেশ, আদ্যা, ব্রহ্ম, ত্রিলোচন, যম, অনল, বিদ্যাধর, বিদ্যাধরী, শঙ্কর, হরি, রামচন্দ্র, ভগবান, সীতা, কামদেব, রতি, ইন্দু, মহেশ, মহেশ্বরী / মাহেশ্বরী, মদন, মহাদেব, ধর্ম, ভাগীরথী, শশধর, দিবাকর, শশী, অনঙ্গ কাল,, বিধি, ঈশ্বরী, বিধাতা, গঙ্গাদেবী , শঙ্কর-সুতা, রাহু, চন্দ্র, কপিলা, দেবগণ, জগদীশ, আদ্যনাথ, গোমাঞি, জগতি, দিনশণি, নিদালি ঘুমালি, অনিরুদ্র, উষা, পশুপতি, বিভূতিভূষণ, ভগবতী, মহাদেব, বিশ্বকর্মা, সুরপতি, শচী, শমন, অনিল, অরুণ, বরুণ, গণপতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ছায়া, বসুমতী, প্রদ্যুম্ন, কৃষ্ণ, ভবানী, নন্দি, ভৈরব, বেতাল, প্রেত, চন্ডিকা, দ্বারিকা, গন্ধেশ্বরী, সাবিত্রী, সর্বমঙ্গলা, বেতাই চন্ডী, কালিকা দেবী, সঙ্কেত-মাধব, ষষ্ঠীদেবী, গোঁসাই, শিব, সীতা, দিননাথ, গণেশ, ষোড়শ মাতৃকা, ভগবান, বলভদ্র, কানু, লক্ষ্মণ, নৃসিংহ, বরাহ, বামন, যমরাজ, নাগেশ্বরী, বিশাই, মহীধর, অগ্নি, অরুন্ধতী, চামুন্ডা, চন্ডী, উমা, স্বর্গ-গঙ্গা, পন্চানন, ব্রহ্ম, ত্রিদশ-নাথ, আদ্যনাথ, পন্চদেব, আদিমাতা, জরৎকার মুনি, অযোনিসম্ভবা, ব্রহ্মাণী, জাগুলি, জরৎকার-পত্নী, পতি মন্দধরী, পাতাল কুমারী, যোগেশ্বরী, পরম যোগিনী , মন্দাকিনী, পর্বতবাসিনী, লক্ষ্মী ।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীরায় বিনোদ ঃ

'' কানা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই , নারায়ণ দেব ও শ্রীরায় বিনোদ মনসামঙ্গলের আদি কবি।''৫০ পাঠক সমাজে তো বটেই, এমনকি সাহিত্য-গবেষক, সাহিত্য-সমালোচকদের কাছে প্রথমোক্ত চার কবি পরিচিত থাকলেও শেষোক্ত কবি অর্থাৎ শ্রীরায় বিনোদ এবং তাঁর কাব্য প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। অতি সামপ্রতিককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া ''ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালায় রক্ষিত চারটি পুথি এবং রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়মে রক্ষিত একটি পুথি অবলম্বনে ''৫১ শ্রীরায় বিনোদ প্রণীত ' পদ্মাপুরাণ ' সম্পাদনা করেছেন। সম্পাদকের পি - এইচ, ডি, অভিসন্দর্ভ - ' শ্রীরায় বিনোদ ঃ কবি ও কাব্য ' (দু'ভাগে বিভক্ত প্রথম ভাগে মূলত কবি - পরিচিতি ও কাব্য - আলোচনা এবং দ্বিতীয় ভাগে পদ্মাপুরাণ কাব্যের সম্পাদিত পাঠ) - এর গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশকালে আচার্য সুকুমার সেন ' আশীর্বাণী'- তে বলেছেন, '' প্রস্তুত গ্রন্থটি ডঃ মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া কর্তৃক সম্পাদিত শ্রীরাম বিনোদ রায়ের (অথবা শ্রীবিনোদরাম রায়ের অথবা বিনোদ রায়ের) মনসামঙ্গল পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যের ভান্ডারে একটি অভিনব সংযোজন।''৫২ ' মুখবন্ধ' - এ অধ্যাপক আহমদ শরীফ লিখেছেন, '' তাঁর (ডঃ মুহম্মদ শাহজাহান মিয়ার) সম্পাদিত শ্রীরায় বিনোদ রচিত ' পদ্মাপুরাণ ' এবং কবি স্বয়ং এতকাল প্রায় অজ্ঞাত ও বিস্মৃত ছিলেন। এঁকে সাহিত্য ক্ষেত্রে পরিচায়িত করার ও এঁর গ্রন্থ মুদ্রণ মাধ্যমে প্রচার করার আয়োজন করার জন্যে এঁকে সাহিত্য- সংস্কৃতি প্রেমীদের পক্ষ হয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছি।''৫৩ ভূমিকায় সম্পাদক ডঃ মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া উল্লেখ করেছেন, '' শ্রীরায় বিনোদের কাব্যের কোন পুথির সন্ধান জানা না থাকায় এ যাবৎ তাঁর যথাযথ পরিচিতিও প্রায় অজ্ঞাতই থেকে গিয়েছিল। সুধীমহলে শ্রীরায় বিনোদের কাব্যকৃতির মূল্যায়নের সুযোগও ছিল তাই অনুপস্থিত।''৫৪

কাব্যে কবি শ্রীরায় বিনোদ তাঁর নিজের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে -

'' কমলাক্ষ সেনের পুত্র নাম শতানন্দ ।
ধর্মরায় নাম তার রাজার প্রবন্ধ ।।
তাহার তনয় শ্রীরাম নাম ধরে ।
শ্রীরায় বিনোদ কবি সর্বলোকে বলে।।''৫৫

Dhaka University Institutional Repository

খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতকের কবি শ্রীরাম ওরফে শ্রীরায় বিনোদ আধুনিক টাঙ্গাইল জেলার ' ধোবড়িয়া ' গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।[৫৬] কবি তাঁর পদ্মাপুরাণ কাব্যে সরাসরি সন-তারিখ সহযোগে কিংবা কোন হেঁয়ালিমূলক শ্লোকের মাধ্যমে কাব্য রচনাকাল উল্লেখ না করায় তাঁকে ' চৈতন্য-পূর্ব ' কিংবা ' চৈতন্যোত্তর ' পর্বে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে সমস্যা দেখা যায়। আত্ম-পরিচিতিতে কবি ' কৃষ্ণ-ভক্তি ', 'ভাগবত-পুরাণ ' প্রভৃতির কথা উল্লেখের মাধ্যমে ' বৈষ্ণবময় আবহ '- এর সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য কাব্যের সুচনায় ' দেবতা - স্তুতি ' অংশে কবি যমুনা কালিন্দী বৃন্দাবন- মথুরা ও বৈষ্ণব চরণের বন্দনা করলেও চৈতন্যদেবের বন্দনা করেননি। স্বাভাবিকভাবে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীঃ ঃ) , যদিও পর্ববর্তী কালের গ্রন্থ ' ভাগবত ' চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই মালাধর বসু কর্তৃক বাংলায় ভাবানূদিত হয় (১৪৭৩ - ৮০ খ্রীঃ) । মনে হয়, শ্রীরায় বিনোদ বৈষ্ণব ছিলেন ঠিকই, তবে চৈতন্যোত্তর রাগানুগ মার্গ-অনুসারী নব বৈষ্ণব ছিলেন না।[৫৭]

মনসামঙ্গলের প্রাচীন কবিত্রয় - নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাসের কাব্যের সাথে তুলনা করে দেখলে শ্রীরায় বিনোদের কাব্যে বেশ কিছু মৌলিক সংযোজন পরিলক্ষিত হয়। যেমন - উৎপল মুনির সাথে মনসা বা পদ্মার সহচরী ' নেতার বিবাহ ' এবং ' নেতার পুত্র ধনঞ্জয়ের জন্ম ও লালন-বৃত্তান্ত ' দু'টি শ্রীরায় বিনোদের মৌলিক সংযোজন ' নারদের যমপুরীদর্শন ' এবং ' নারকীদের প্রতি নারদের উপদেশ ' প্রসঙ্গ দু'টিও শ্রীরায় বিনোদের মৌলিক সংযোজন ; লৌকিক দেবতা ' ক্ষেত্রপাল' - এর প্রসঙ্গটিও শ্রীরায় বিনোদের মৌলিক সংযোজন ইত্যাদি। ক্ষেত্রপাল প্রসঙ্গটি একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মনসা যখন হনুমানকে দিয়ে কালিদহে চাঁদ সদাগরের ডিঙ্গা ডুবানোর প্রচেষ্টায় রত, সে সময় চন্ডী ক্ষেত্রপালকে দিয়ে ডিঙ্গাসমূহ রক্ষা করেছিলেন ।

'' পবনকুমার বীর বলে মহাবল।
ধরিয়া চৌদ্দয় ডিঙ্গা জলে কৈল তল।।
ত্রিভুবনে জানে ক্ষেত্রপাল মহাবলী।
চৌদ্দয় খান ডিঙ্গা তোলে দুই করে ধরি।।
ডিঙ্গাগুলা তুলিলেক বীর ক্ষেত্রপাল।
পুনরপি ধরে ডিঙ্গা পবন কুমার।।
চৌদ্দয় ডিঙ্গা ঠেলিলেক শতেক প্রহর।
ঝলঝলি জল উঠে ডিঙ্গার উপর।

Dhaka University Institutional Repository

পুনরপি ক্ষেত্রপাল চৌদ্দয় ডিঙ্গা ধরি।
শতেক প্রহর ডিঙ্গা লৈল আগুসারি।।
পুনর্বার ডুবাইল বীর হনুমান।
ইঙ্গিতে তুলিল ডিঙ্গা ক্ষেত্র বলবান।।"[৫৮]

এখানে দেখা যাচ্ছে-চন্ডী হনুমানের প্রতিপক্ষ হিসেবে ক্ষেত্রপালকে নিয়োগ করেছেন। নিচে শ্রীরায় বিনোদের পদ্মাপুরাণ কাব্যের[৫৯] পর্ব / খন্ড অনুসারে দেব-দেবীদের নামসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

বন্দনা অংশ ঃ

গণপতি, গৌরী, ভগবতী, ব্রহ্মা, শ্রীহরি, সদাশিব, শিব, নিরঞ্জন, অনাদি পুরুষ, পবন, গঙ্গাদেবী, পুরন্দর, আনল, বরুণ, দিবাকর, রোহিণী, শশধর, ধর্ম, জয়ন্তকুমার, পার্বতী, কুবের, রতি, মদন, গ্রহগণ, মন্দাকিনী, ভোগবতী, অলকানন্দা, ভাগীরথী, ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রাণী, তারা (ব্রহ্মার নন্দন) জরৎকারু মুনি, আস্তীক মুনি, উৎপল মুনি, ধনঞ্জয় মুনি, বিষ্ণু, কশ্যপ, হলধর, ক্ষেত্রদেব, বনদেবতা, সরস্বতী দেবী, হর, বাসুকি, পদ্মা, শঙ্কর, নন্দী, প্রভু জগন্নাথ, গরুড়।

দ্বিতীয় অংশ

(গ্রন্থোৎপত্তির কারণ) ঃ

কৃষ্ণ, বিষ্ণু, রাম, শঙ্করকুমারী, ব্রহ্মাণী, পদ্মা, মনসা, যম।

দেব খন্ড ঃ

ব্রহ্মাদেব, হুতাশন, পবন, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, কুবের, বরুণ, যম, সহস্রলোচন, শিব, যক্ষ, রক্ষ, হরি, গন্ধর্ব, কিন্নর, অনাদি, নিরঞ্জন, ভগবান, আদ্যাশক্তি, শক্তি, পুরুষ, প্রকৃতি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, পশুপতি, হর, প্রজাপতি, মহামায়া, আদ্যাদেবী, ভগবতী, নারায়ণ, শ্রীহরি, কূর্ম অবতার, নাগ অবতার, বাসুকি, নাগরাজ, ধরণী, কল্পতরু, আদ্যা ভগবতী, পঞ্চভূতি ভান্ড (পৃথিবী , আনল, জল, পবন, আকাশ), মনু, ব্রহ্মার সাত মানসপুত্র (মারীচ, নারদ, মুনি, ভৃগু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, বশিষ্ঠ), কশ্যপ (মারীচের পুত্র), দক্ষ, অদিতি, মৎস্য অবতার, বসুমতী, পৃথ্বী, ভুবন, ক্ষিতি, বরাহ অবতার, নরসিংহ অবতার, বামন অবতার, হলধর, বুদ্ধ, কল্কি, ধর্ম, বিশ্বম্ভর, গঙ্গাদেবী, গোসাঞি, চতুরানন, পুরন্দর,

Dhaka University Institutional Repository

অরুণ, দেব দিবাকর, নিশাকর, গ্রহগণ, জ্যোতির্ময়, নৈরাকার, অন্তর্যামী, জনার্দন, ত্রিভুবন পতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শ্যাম, শাশধর, কমললোচন, পীতাম্বর, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, দেব ত্রিলোচন, শূলপাণি, ত্রিপথগামিনী, মন্দাকিনী, ভোগাবতী, অলকানন্দা, ভাগীরথী, পঞ্চানন, চন্ডী, নারদ, শঙ্কর, জনমভিখারী, দেবরাজ, পর্বত-নন্দিনী, পশুপতি, নন্দী, হিমগিরিসুতা, গৌরী, সতী, অর্ধ-চন্ডী (শিব) ভবানী, দিগম্বর, জরৎকারু, বিধাতা, কশ্যপ- নন্দিনী (মনসা), কদ্রু-নন্দিনী (পদ্মা), বাসুকি - ভগিনী, সদাশিব, বিভুতি - ভূষণ, সুধাকর, কাম, মহাদেব, মহেশ্বর, দক্ষ, নিদ্রালী, দেবেশ্বর, কার্তিক, গণেশ, চন্দ্রবদনী, ত্রিপুরারি, মদন, বাউল (শিব), রতি, ত্রিলোক্য - মোহন, ত্রিভুবন-নাথ, জগৎ-আধার, মহাদেব, দেবরাজ, দুর্গা, গৌরী, পুরুষ, প্রকৃতি, যুগী, নিরঞ্জন, গিরিসুতা, ভোলানাথ, নাগ-অধিকারী, ব্রহ্মাণী, নাগিনী কন্যা, বিষহরী , বিষ-অধিকারী, পদ্মাবতী, শঙ্করকুমারী (মনসা), হরনন্দিনী, নাগমাতা নাগিনীর অষ্টনাম (জরৎকারু, জয় বিষহরী, অযোনিসম্ভবা, কমলৌষ্ঠা, মনসা, জগদ্‌গৌরী, ব্রহ্মানি, পাতাল নাগিনী), ত্রিভুবনমোহিনী, পদ্মা, অনন্ত নাগ, পক্ষিরাজ (গরুড়), অগ্নি, মহীতল, কামদেব , গৌরীনাথ, বৃহস্পতি, উর্বশী, মেনকা, তিলোত্তমা, সুকেশী, মালিনী, সহস্রলোচন, ইন্দ্র, লক্ষ্মী, সুরপতি, দশ লোকপাল, কপিলা, দিনমণি, ধর্মরাজ, দেব তপোধন, জয়ন্তকোঙর, বিশ্বম্ভর, যোগেশ্বর, বিধি, অনাদি পুরুষ (শিব), নীলকণ্ঠ, সন্ধ্যা, শচী, ছায়া, ত্রিজগৎ পিতা (কশ্যপ), নন্দী, ভৃঙ্গি, হরিহর, সুধাকর, খন্ড কপালিনী (পদ্মা), নেতা, উৎপলা মুনি, ধনঞ্জয় মুনি, আস্তীক মুনি।

বণিক খন্ড ঃ

মনসা , ব্রহ্মাণী, নেত্রাবতী, নেতা, পদ্মা, সুরপতি, গন্ধর্ব, কিন্নর, পদ্মাবতী, শিব, গোসাঞি, বিষহরী, ধর্ম, হুতাশন, অনন্তনাগ, অষ্টনাগ, শঙ্কর কুমারী, যম, অযোনিসম্ভবা, তিন লোকমাতা, পৃথিবী, শিবসুতা, ঈশ্বর, ভবানী, শঙ্কর, হর, গৌরী, হরগৌরী, বিশ্বকর্মা, জয়মনসা, নেতাই, হরনন্দিনী, গঙ্গা, মনসার ঘট, জয় ব্রহ্মাণী, শূলপাণি, মনসা - নাগিণী নেতা, গঙ্গা, মদন, শঙ্কর-নন্দিনী, দেবী ত্রিলোকামোহন, বিধি, বিদ্যা ধরী, শশিমুখী, অনঙ্গ, ইন্দু, চন্দ্রমুখী, শ্রীরাম, রাম, বিধাতা, শ্রীহরি, রবি, ব্রহ্মা, পৃথ্বী, দেবগন, দিবাকর, মহাদেব, ভোলানাথ, মহেশ্বর, ত্রিপুরারি, আনল, অগ্নি, বিষ্ণু, ত্রিলোচন, অরুণ, হরি, হরকুমারী , বিদ্যাধর, পুরন্দর, অনিরুদ্ধ, উষা, ইন্দ্র, দেব- অধিকারী, দেবরাজ, ভবানী, শঙ্কর, বিদ্যাধরীগণ, সহস্রলোচন, চিত্রগুপ্ত, রবিসুত (যম), যমদূত, বজমুখ, সূচীমুখ, যমরাজা, প্রেতপতি, নারদ মুনি,হরিনাম, নারায়ণ, ধরণী, অষ্টনাগ, গরুড়, দশ লোকপাল, প্রজাপতি, ত্রিলোক বিজয়ী, রতি, কামদেব, শশধর, দেব পঞ্চশর, কমললোচন, খগপতি, রবি, শনি, সুধাকর, ষষ্ঠী, আস্তিক, শশী, শুক্র , মেনকা, উর্বশী, পবন,

Dhaka University Institutional Repository

উমা, মাধব, ত্রিভুবন - জননী, অযোনিসম্ভবা, সাপ - অধিকারী, ব্রহ্ম- স্বরূপিণী, ভগবতী, আদ্যা ভগবতী, পশুপতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, নৈরাকার, জ্যোতির্ময়, অখিলের অধিপতি, বিপদনাশিনী, ছিষ্টিপতি, অগতির গতি, ত্রিভুবন-সার শচী, সন্ধ্যা, অরুন্ধতী, দিবাকর, মহামায়া, চন্ডী, পদ্মা, গঙ্গা, সুরেশ্বরী ভাগীরথী, মন্দাকিনী, অসুরনাশিনী, সিংহবাহিনী, ক্ষেত্রপাল, দুর্গা, হনুমান, পর্বতকুমারী পবনকুমার, মহাদেব, নন্দী, সীতা, কৃষ্ণ, আকাশ, অভয়দায়িনী,কুবের, বরুণ, শচীপতি, রবি, কপিলা, আস্তীক মুনি, বাসুকি-ভগিনী, বাসুকি, মনসানাগিনী, গ্রহগণ, দশ লোকপাল, জয়ন্তকুমার, দশ অবতার, বলরাম, কার্তিক, গণেশ, দেবতাসকল, জরৎকারু মুনি, কাশ্য,, অপ্সর, রোহিণী, শশধর, হরিহর, মনমথ, ধর্ম, ধরণী, বাসন, নেত্রাবতী, নেতা, ধনঞ্জয়, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর, জলনিধি, নারায়ণ, গজানন, দেব ষড়ানন, ধনেশ্বর, বিদ্যাধর- বিদ্যাধরীগণ, দেবী বসুমতী, কশ্যপ, নন্দী মহাকাল, ত্রিদশ দেব, নিশাপতি, নিরঞ্জন, অনাদি, শিব, আস্তীক মুনির মাতা, হংসরথ বাহিনী, ভকতবৎসলা, ছিষ্টি - স্থিতিকর্তা, দেবগণ।

দ্বিজ বংশীদাস ঃ

মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ কাব্যধারার বিশেষ করে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্মের সর্বগ্রাসী প্লাবনে প্লাবিত বাংলা সাহিত্যের মনসামঙ্গল কাব্যধারায় দ্বিজ বংশীদাস একজন শীর্ষস্থানীয় কবি। মনসামঙ্গলের বিবর্তনের মধ্যস্তরের কবি দ্বিজ বংশীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৈষ্ণবধর্ম প্রভাবিত সমন্বয়মূলক মনোভাব।[৬০] পূর্ববঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের এককালের বহুল জনপ্রিয় কবি দ্বিজ বংশীদাসের সুযোগ্যা কন্যা বাংলার সুপরিচিতা ' মহিলা কৃত্তিবাস ' চন্দ্রাবতী তাঁর অনূদিত রামায়ণে পিতার নিম্নরূপ পরিচয় দিয়েছেন ঃ

''ধারা স্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বয়ে যায় ।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায় ।।
ভট্টাচার্য বংশে জন্ম অঞ্জনা ঘরণী।
বাঁশের পালার ঘর ছনের ছাউনী।।
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছাড়ি যায়।।
দ্বিজ বংশী পুত্র হৈলা মনসার বরে।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে।।''[৬১]

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সাধক কবি দ্বিজ বংশীদাস বৃহত্তর ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ জেলার (তৎকালীন মহকুমার) পাতুয়ারী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর কাব্য রচনার কাল সম্পর্কে তাঁর মুদ্রিত সংস্করণে এই পদ দুটি পরিলক্ষিত হয় -

" জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার।
শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার।।"[৬২]

এখানে দেখা যাচ্ছে - ১৪৯৭ শতাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৫ - ৭৬ খ্রীস্ট্যাব্দে দ্বিজ বংশী তাঁর পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল রচনা করেন। কবির সময়-কাল নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্[৬৩] উপরোক্ত সময়কালকেই মেনে নিয়েছেন। আবার, আশুতোষ ভট্টাচার্য,[৬৪] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,[৬৫] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ,[৬৬] প্রমুখ দ্বিজ বংশীকে খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতকে স্থান দিলেও সুকুমার সেন[৬৭] সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

চন্দ্রাবতী রচিত ময়মনসিংহ গীতিকার দস্যু কেনারামের পালা থেকে জানা যায় যে, সুকণ্ঠ গায়ক-কবি দ্বিজ বংশীদাসের মনসার ভাসান গান শুনে দস্যু কেনারামের পাষাণ মন দ্রবীভূত হয়ে গিয়েছিল এবং সে বংশীদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল।[৬৮] দ্বিজ বংশীর কাব্য পরিকল্পনা কতকটা মনসামঙ্গলের মূল ধারা -বহির্ভূত। বৈষ্ণব ধর্ম প্রভাবিত সমন্বয়মূলক মনোভাবের কারণে তাঁর চাঁদ সদাগর প্রথমে চন্ডী ও মনসা এই উভয় দেবীর প্রতি সমদর্শী ছিলেন। কিন্তু পরে চন্ডীর তাড়নায় চাঁদকে মনসার সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়তে হয়। শৈব চাঁদের সঙ্গে মনসার ঝগড়ার বদলে শতও চন্ডীর সহায়তাকারী চাঁদের সাথে মনসার ঝগড়ার কথাই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ , ইহা মূলতঃ চন্ডী ও মনসার বিবাদ - চাঁদ সদাগর এখানে উপলক্ষ মাত্র। অবশ্য, শিবের মধ্যস্থতায় পরিশেষে এই বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে। মনসার লৌকিক - সংস্কারচ্ছন্ন মহিমা-প্রচারের কাব্যে দ্বিজ বংশী এমন এক গভীর আন্তরিকতা এবং উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক অনুভূতির সৃষ্টি করেছেন, যার ফলস্বরূপ ইহা ময়মনসিংহের গণজীবনের আনন্দ-উৎসব ও স্ত্রী আচারের অনুষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গিয়েছে।

দ্বিজ বংশীর ভাষা সুপরিচ্ছন্ন, চৈতন্য - পূর্ববর্তী যুগের গ্রাম্যতা থেকে মুক্ত হয়ে উচ্চতর কাব্য রচনার উপযোগিতা লাভকারী তাঁর ভাষারই ক্রমবিকাশের ধারায় খ্রীঃ অষ্টাদশ শতকে শব্দশিল্পী ভারতচন্দ্রের

Dhaka University Institutional Repository

আবির্ভাবকে সহজতর করে তুলেছিল। ভারতচন্দ্রের পূর্বে বাংলা শব্দের সঙ্গে আরবি-ফারসি শব্দের সুসমঞ্জস্য প্রয়োগে তিনিই দক্ষতা দেখিয়েছেন। যেমন -

''ফতেমা, নুরজান আদি, সায়বাণী, সৈয়দ, সাদি,
বান্দী, গোলাম যত আর।
বিষে সবে ঢলি পড়ি, ভূমে যায় গড়াগড়ি,
কাজির ঘটিল সর্বনাশ।
'' পদ্মাপূজা করি মানা, এত হৈল বিড়ম্বনা ''-,
খেদে কহে দ্বিজ বংশীদাস।।''[৬৯]

এখানে দ্বিজ বংশীদাসের মুদ্রিত গ্রন্থ[৭০] থেকে দেব-দেবীদের তালিকা প্রণীত হয়েছে ঃ

বন্দনা অংশ ঃ

গণেশ , নারায়ণ, সরস্বতী, মনসা, মহেশ্বর, অযোনিসম্ভবা, মহেশ্বরসুতা, পদ্মা, আস্তিক মুনি, বাসুকি, জরৎকারু মুনি, অষ্টনাগ, পবন, বিষ্ণু, প্রজাপতি, ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণী (ব্রহ্মার স্ত্রী), হর, গৌরী, হরগৌরী, গঙ্গা, দুর্গা, ত্রিপুরারি, কার্তিক, যম, চিত্রগুপ্ত, শঙ্কর, শঙ্কর দুহিতা, বাসুকি - ভগিনী, আস্তিক-মাতা, জরুৎকারু মুনি-পত্নী, বিষহরি, নেতাই, ভবানী, যোগী, ইন্দ্র, বিধাতা, পূর্ণব্রহ্ম, গজানন, মহামায়া, ঈশ্বর, সিংহবাহিনী, দশভুজা, মহিষাসুরমর্দিনী, ত্রিনয়নী, জগৎগৌরী, চতুর্ভুজা, পদ্মাবতী, ধর্ম, দেব অনাদি, সর্বদেবদেবী, লক্ষ্মী, শিব, ভানু, প্রভু জগন্নাথ, তুলসী।

দেব খন্ড ঃ

দেবগণ, নারদ, মদন, চন্ডী, মহেশ্বর, বিশ্বপতি, ত্রিপুরারি, বিষহরি, রাহু, চন্দ্র, নারায়ণ, পরম পুরুষ, নিরঞ্জন, কেতকা দেবী, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহাদেব , ভুবন, হরি, দামোদর, যম, মেদিনী, প্রজাপতি, চৌদ্দ ভুবন, অগ্নি, সূর্য, রাম, জগজ্জীবন, দক্ষ প্রজাপতি, কশ্যপ, অদিতি, ইন্দ্র, গরুড়, পুরন্দর, শনি, কুবের , বরুণ, বিধি, কানাই, যাদব, কৃষ্ণ, পৃথিবী, ধর্ম, শ্রীকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, গন্ধর্ব, বাসুকি, কাল, লক্ষ্মী, মাধবী, শচী, শচীপতি, জাহ্নবী, মহালক্ষ্মী, বামন, কূর্ম, বিশ্বম্ভর, অপ্সরা, শূলপাণি, কমলা, লক্ষ্মীদেবী, বিদ্যাধরী, শ্রীবিষ্ণু, অলক্ষ্মী, কপালি (শিব), শিব, সতী, পঞ্চানন, ঈশ্বর, মহেশ্বর, জগন্নাথ, হর, দিগম্বর, বিভূতিভূষণ, বেতাল, গোপাল, গোঁসাই, নন্দী, দক্ষ, শঙ্কর, অনল, বীরভদ্র, দেবতা চাতর, অগ্নি,

Dhaka University Institutional Repository

পিণাকী, কামদেব, শ্রীহরি, উগ্রতারা, জ্বালামুখী, মহামায়া, কামেশ্বর, মদন, রতি, অনঙ্গ, কৃষ্ণ, শিবলিঙ্গ ভোলানাথ, পার্বতী, অগ্নি, স্বাহা, পিতৃগণ, দক্ষকুমারী, সতী, রোহিণী, সরস্বতী, উমা, হিমালয়-কন্যা, কালী, চন্ডী, অষ্টভুজা, পার্বতী, ত্রিনয়নী, বৃহস্পতি, পঞ্চানন, শচীপ্রভা (কালীর সখী), ভদ্রেশ্বর, শিব, রুদ্রগণ, হুতাশন, বাসুকি, শশী, পশুপতি, ত্রিলোচন, যোগেশ্বর, শ্যাম, বিনোদ, কানাই, বিধি, কন্দর্প, চন্ডিকা, বিরুপাক্ষ, গোবিন্দ, শুক্র, বিশ্বকর্মা, গৌরী, ভবানী, গণপতি, গণেশ, হরগৌরী, কার্তিক, দেব সেনাপতি, ষড়ানন, মহাদেব, দুর্গা, ভগবতী, হেরম্বনন্দিনী, রাই বিনোদিনী, রবি, নেতা, গঙ্গা, পদ্মা, পদ্মাবতী, বিষহরি, মনসা, কেশব, যোগী, অনাদি দেব, শিব, গঙ্গাদেবী, পার্বতী, শঙ্করী, গণাই, মনমথ কাম, পৃথ্বি, রাধা, অযোনিসম্ভবা, জরৎকারু মুনি, প্রজাপতি, কমলা, সুরেশ্বরী, শচী, ভাগীরথী, সরস্বতী, ইন্দ্র, জয়ন্তকুমার, বৃহস্পতি, বিদ্যাধরী, শিব, গণ, নন্দী, উগ্রতপা মুনি, ধনঞ্জয় (নেতা-উগ্রতপা মুনির পুত্র), মোক্ষদাতা, জরৎকারু মুনি, গরুড়, পৃথিবী, সন্ধ্যা, আদ্য মহাযোগী, আস্তিক মুনি, যক্ষ, কিন্নর, অনন্ত নাগ, অষ্টনাগ, সুগন্ধা (পদ্মার অপর সহচরী)।

বণিক খন্ড ঃ

পদ্মা, নেতা, বিষহরি, শিবের কুমারী, পদ্মাবতী, ঈশ্বর, মনসা, তুলসি, হরি, রাম, নারায়ণ, নারদ মুনি, জয় বিষহরি, মেদিনী, জগজ্জীবন, রাম, চন্ডিকা, ভবানী, শঙ্কর, গঙ্গা, হরগৌরী, হর, গৌরী, দামোদর, ষষ্ঠীদেবী, ভৈরব, পার্বতী, শিব, বিধি, রমণীমোহন, রাম, অগ্নি, ইন্দ্র, মহামায়া, চন্ডী, মনসা নাগিনী, নাগমাতা, দুর্গা, লক্ষ্মী, শনি, বিধি, গুণনিধি (রাম), কামদেব, শম্ভু, ব্রাহ্মণি (পদ্মা) , আকাশ,জয় পদ্মা, ভগবতী, দীনবন্ধু, পতিত পাবন, কাম, বিষ্ণু, কাল, গৌরাঙ্গ, ব্রহ্মা, প্রজাপতি, যক্ষাদি দেবতা, ধর্ম, চন্দ্র, পুরন্দর, সহস্র আঁখি, সূর্য, অনল, লক্ষ্মী, ইন্দ্র, বিদ্যাধরী, কুবের, হর, দীননাথ, শ্রীমধুসূদন , অগ্নি , পবন, মদন, দামোদর, শঙ্কর, বাসব, সীতা, পরসহংস, জ্যোতির্ময়, নিরঞ্জন, গঙ্গা, আস্তিক মুনি, জরৎকারু মুনি, মহেশ্বর, যাদব, রাহু, জানকী, হরি, যম, মহাদেব, ভবানী, শঙ্করী, ধরণী, মহীতল, দেবগণ, কার্তিকেয়, ত্রিপুরারি, কানাই, বিশ্বকর্মা, অনল, রানু, শিবলিঙ্গ, কেশব, অনিরুদ্ধ, উষা, শিবসুতা, বিদ্যাধরী, বিদ্যাধর, অপ্সরা, পৃথিবী, বিধাতা, রাঘব, আকাশ, দেবরাজ, সুরেশ্বরী, গঙ্গাদেবী, জগজ্জীবন, শ্রীরাম, মাধব, গোপাল, গোবিন্দ, কার্তিক, গণেশ, মঙ্গল চন্ডিকা, গঙ্গা ভাগীরথী, মহাদেবী, রবি, শশী, অগ্নি, পবন, গণপতি, বনমালী, সরস্বতী, ধর্ম, বসুমতী, হনুমান, যক্ষগণ, ঈশ্বর, কুবের, ধনপতি, মন্দাকিনী, মঙ্গল চন্ডী, শচীপতি, গরুড়, মাধব, বিশ্বম্ভর, পঞ্চানন, পৃথ্বী, শশী, দিবাকর, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, দেবসেনা, স্বাহা, স্বধা, লোকমাতৃজয়া, শান্তি, পুষ্টি, তুষ্টি, ক্ষম', রমণীমোহন রাম, স্বস্তি,

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীবিষ্ণু, বিনোদ, শ্যাম, রাধা, সীতা, জগতজননী, কাল, অষ্টনাগ, দূর্বাদল শ্যাম, পৃথিবী, পূর্ণব্রহ্ম, চক্রপাণি, নিদ্রাদেবী, অনঙ্গ, রতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ইন্দ্রাণী, রোহিণী, ব্রহ্মাণী, কৃষ্ণ, কালপুরুষ, গদাধর, শচী, পার্বতী, গন্ধর্ব কুমার, রাহু, দক্ষ, দক্ষের দুহিতা, বিধাতা, যমদূত (কাল , বিকাল) , ধর্ম, পশুপতি, পূর্ণব্রহ্ম রাম, জগতগৌরী, শঙ্কর, জাহ্নবী, নেতা ধোপানী, ধনঞ্জয় (নেতার পুত্র), উষাবতী, রবির কুমার (যম), কামের নন্দন (অনিরুদ্ধ), চিত্ররেখা, বিশ্বাবসু, চিত্র সেন, নন্দী, ভূতনাথ, সর্বদেব-দেবী, গরুড়, কুবের , উনপঞ্চাশ পবন, দ্বাদশ আদিত্য, বরুণ, গ্রহাদি, অষ্ট লোকপাল, একাদশ রুদ্র, বৃহস্পতি, শুক্র, পার্বতী, গজানন, যমরাজ, ব্রহ্মা, বাণকন্যা (উষা), ঈশ্বরদশ দিবাকর, চতুর্দশ ভুবন, রঘুপতি, হনুমান, যক্ষগণ, চতুর্দশ যম, রবিসুত, জয়ন্ত কুঞ্জর, গৌরহরি, ত্রিপথগামিনী, (ভোগবতী, করতোয়া ও মন্দাকিনী / গঙ্গা), কেশব, দিবাকর, আস্তিকের মাতা, উর্বশী, রাহু, গগন, ইন্দ্র।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ঃ

মনসামঙ্গল কাব্যধারায় কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ একজন অবিস্মরণীয় কবি। ''কৃত্তিবাস, মুকুন্দ ও কাশীরাম যেমন যথাক্রমে রাম-কথা, চন্ডী -কথা ও ভারত-কথার প্রতিনিধি স্থানীয় কবি, কেতকাদাস তেমনি মনসামঙ্গল কাব্যের।''[৭১] ছাপাখানার যুগে মুদ্রণ-সৌভাগ্য লাভকারী মনসামঙ্গলের প্রথম কবি হচ্ছেন কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। কেতকাদাস (অর্থ - মনসার দাস) এবং ক্ষেমানন্দ একই ব্যক্তি - প্রথম শব্দটি নামের বিশেষণ ও দ্বিতীয়টি নাম - ' কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ' নামের এই ব্যাখ্যা প্রায় সকল গবেষকই মেনে নিয়েছেন।[৭২] মনসামঙ্গলের অন্যান্য কবিগণ পদ্মপত্রে মনসার জন্ম হওয়ার কথা বিবৃত করত তাঁর নাম 'পদ্মা ' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কেয়াপাতায় মনসার জন্ম হবার কাহিনী ক্ষেমানন্দ ছাড়া আর কোন কবির কাব্যে পরিলক্ষিত হয়না।

'' কিআ পাতে জন্ম হৈল কেতুকা সুন্দরী।''[৭৩]

ক্ষেমানন্দ নিজেকে কেতকাদাস অর্থাৎ মনসার দাস হিসেবে কাব্যে উপস্থাপিত করেছেন।

''গাইল কেতকা দাস মনসার পায়।''[৭৪]

কবির কাব্যের কোন কোন জায়গায় শুধু কেতকাদাস ভণিতা দেখে তাঁকে আলাদা লোক বলে ভুল করার অবকাশ নেই।

কাব্যে কবি তাঁর আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন -

Dhaka University Institutional Repository

''রণে পড়ে বারা খাঁ বিপাকে ছাড়িল গাঁ।''[৭৫]

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বর্ণিত কবিকঙ্কণের পুত্র শিবরাম ভট্টাচার্যের সাথে বারা খাঁর চুক্তিনামার সূত্র ধরে ''১৬৪০ খ্রীস্টাব্দের পর বারা খাঁর মৃত্যু হইয়াছে ধরিলে দেশত্যাগী কবির এই গ্রন্থ সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কোন এক সময় রচিত হইয়া থাকিবে।''[৭৬] উল্লেখ্য , বারা খাঁ দক্ষিণ রাঢ় সেলিমাবাদ সরকারের শাসনকর্তা হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৭৭] চৈতন্য-পরবর্তী কবি ''রাঢ়ের অধিবাসী''[৭৮] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ জাতিতে কায়স্থ ছিলেন।

'' ক্ষেমানন্দের বাণী রক্ষ ঠাকুরাণী
যতেক কায়স্থ আছে।।''[৭৯]

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যটিকে অনেকগুলো খন্ড পালার একটি বড়ো সংকলন বলা যেতে পারে। তাঁর কাব্যে বর্ণিত পালাগুলোর মধ্যেকার সংযোগসূত্রটি খুবই দুর্বল। এতে সার্বিকভাবে কাহিনীগত অখন্ডত্বের কোন আভাস পাওয়া যায় না। যেমন - ঊষা অনিরুদ্ধ পালার ঘটনা পুরাণকাহিনীর পথ বেয়ে এখানে একটি আলাদা এবং পূর্ণ কাব্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে। অথচ ঊষা - অনিরুদ্ধের মৃত্যুবরণ এবং মর্ত্যভুবনে যাবার প্রয়োজন চাঁদ - মনসার বিরোধের কারণেই । পালাটির বিস্তৃত ভাবে উপসহাপনের সময় কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ এই মূল প্রেক্ষাপটকেই বিসর্জন দিয়েছেন। বিজয় গুপ্ত সহ প্রায় সকল মনসামঙ্গলের কবির কাব্যেই সংক্ষিপ্ত পরিসরে ঊষা-অনিরুদ্ধের কথা চাঁদ - মনসার বিবাদের মাঝখানে সংস্থাপিত । কেতকাদাসের কাব্যে চাঁদ সদাগরের সাথে ঊষা-অনিরুদ্ধের কাহিনীর সম্পর্ক খুঁজতে যাওয়াও বিড়ম্বনা মাত্র । কেননা, ঘটনার রঙ্গমঞ্চে চাঁদ সদাগরের প্রবেশ অনেক পরে ইত্যাদি।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যের বিভিন্ন পালার মধ্যে 'বেহুলা - লখিন্দর ' নামক পালাটিই প্রধান। এই পালার অপর নাম হচ্ছে 'জাগরণ পালা'। মনসামঙ্গলের মূল আখ্যান চাঁদ সদাগর-বেহুলা - লখিন্দরের কাহিনী এই পালার উপজীব্য বিষয় । এই পালার অন্তর্গত লৌহ - বাসরে লখিন্দরকে সাপে কামড়ানোর দৃশ্যটি কেতকাদাসের বর্ণনায় অপূর্ব হয়ে উঠেছে। এই পালার তো বটেই এমনকি কেতকাদাসের সমগ্র মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে এই অংশটুকুকে শ্রেষ্ঠতম বলা যেতে পারে। এর মধ্যে করুণ রসের পাশাপাশি উদার গাম্ভীর্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। লৌকিক কাব্যের (folk poetry) একটি মুখ্য দিক হচ্ছে। এর কোন কোন অংশের অনেকটা ইংরেজি refrain এর মত পুনরাবৃত্তি ঘটার কারণে একটি ঘন পরিবেশের

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ভব ঘটে ; যদিও অন্য জায়গায় এ ধরনের পুনরাবৃত্তি দোষাবহ বলেই মনে করা হয়। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের লখিন্দরের লৌহ-বাসর বর্ণনায় এমন একটি অংশের পুনরাবৃত্তি একে গৌরবোজ্জ্বল এবং রসঘন করে তুলেছে। লখিন্দরকে কামড়ানোর জন্যে রাত্রির প্রথম প্রহরে বঙ্করাজ সর্প লৌহ-বাসরে ঢুকল, তারপর -

''কপাটের আড়ে থাকি উকি দিয়া চায়।
বেহুলার নিদ্রা নাহি দেবীর কৃপায়।।
কপাটের আড়ে দেখে ভীষণ ভুজঙ্গ।
চমকি বেহুলা উঠে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ।।
ব্যথিত করিল তারে মধুর বচনে।
কাঞ্চনের বাটি দিল কাঁচা দুগ্ধ সনে।।
বেহুলা বলেন খুড়া কোথা আছ তুমি।
তোমা সভা না দেখিয়া নিত্য কান্দি আমি।।
অবিরত মনে কত গণিব হুতাশ।
আমার কঠিন বাপ না করে তল্লাস।।
মনে কিছু না করিহ সেই অভিমান।
কাঞ্চন বাটিতে কর কাঁচা দুগ্ধ পান।।
এতেক শুনিয়া সাপ বড় লজ্জা পায়্যা।
কাঁচা দুগ্ধ পান করে হেঁটমুণ্ড হয়্যা।।
বেহুলা না করে ভয় মনসার দাসী।
সর্পের গলায় দিল সুবর্ণ সাঁড়াসি।।
ক্ষীর অমৃত খাও বলি যে তোমারে।
সুখে শুয়্যা নিদ্রা যাও হড়পী ভিতরে।।''[৮০]

এরপর রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে যথাক্রমে কালদন্ত সর্প এবং উদয়কাল নাগ (সর্প) এল ; তাদের সম্পর্কও বেহুলা কর্তৃক উপরোক্ত পদকটি পুনরুক্ত হল। লোক-গীতিকা (ballad) -র একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য এই প্রকার পুনরুক্তিকে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ তাঁর রচনা-রীতিতে স্থান দিয়ে এর লোক-সাহিত্যগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করত একে একটি বিশেষ মূল্যের পর্যায়ে তুলে ধরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাক-চৈতন্য যুগের মনসামঙ্গল ভাষার দিক দিয়ে যেমন শিথিল ও গ্রাম্য ভাবাপন্ন ছিল, চৈতন্যোত্তর যুগে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্য সার্থকভাবে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। তাই তো '' মনসামঙ্গলের পূর্বতন শক্তিশালী কবি নারায়ণ দেব অমার্জিত ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গির জন্যই বোধ হয় অনেক দুর্বল ক্ষমতার অধিকারী কেতকাদাসের কাছে যশের পরিমাপে হেরে গেছেন।''[৮১] নিম্নে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মুদ্রিত গ্রন্থ[৮২] অবলম্বনে দেব-দেবীদের তালিকা প্রণীত হয়েছেঃ

বন্দনা অংশ ঃ

গণেশ, মনসাদেবী, আস্তিক মুনি, বাসুকি, জরৎকারু মুনি, ধর্ম, গজানন, ব্রহ্ম, দেবরাজ, গণপতি, সকল দেবতা, সরস্বতী, বিধাতা, দেব নারায়ণ, বাগ্‌দেবী, মাতা ভারতী, রবি, শশী, পঞ্চ দেবতা, মধুমতী (সরস্বতী), গরুড়, জটাধর, শিব, শাশিচূড়, বিভূতিভূষণ, শঙ্কর, গজানন, দিবসনাথ, অরুণ সারথি, নিরঞ্জন, ব্রহ্মা, দেব ত্রিলোচন, পার্বতী, ভানু, ভাস্কর, দেব জগন্নাথ, বৈদ্যনাথ, কপিলা, তুলসী, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সীতা, ইন্দ্র, লক্ষ্মী, অষ্ট লোকপাল, রাধা, কানু, গোরাচাঁদ, গৌরাঙ্গ, কুবের, বরুণ, গুহ (কার্তিক), দশ দিকপাল, প্রমথ, চন্ডপাল, যম, চন্দ্র, সূর্য, ডাকিনী, যোগিনী, গঙ্গা, ভাগীরথী, কালিকা দেবী, অরুণ, গোরা ক্ষেত্রপাল, বীর হনুমান, জটা ঠাকুরাণী, ভগবতী, শোভাচন্দ্র, সর্বমঙ্গলা, মাধব, দামোদর, রঙ কমলা, দেবী বিশালাক্ষী, চন্দ্রমুখী, জয় বিষহরি, পাতাল কুমারী, পদুমা কুমারী, কেতুকা সুন্দরী, হরি, ত্রিজগত-ধাত্রী, বিশ্বমাতা, ক্ষিতি, বিধি , জগতি (মনসা), যোগেন্দ্র (শিব), যোগেন্দ্রসুতা, সনাতনী, হর, ত্রিপুরারি, শ্রীচৈতন্য, জগতগুরু, কল্পতরু অবতার, শচী, পুরন্দর, চৈতন্যহরি।

দ্বিতীয় অংশ ঃ

দেবী বিষহরি, মনসা, বিধাতা, বিধি, কেতকা, ব্রাহ্মণী (মনসা)।

দেব খন্ড ঃ

গজানন, গুহ, দেবগণ, কুবের , বরুণ, যম, দশ দিকপাল, শেষপতি কাল, ভবানী, চন্ডী, জগতজননী, পবনের সুত (হনুমান), মহেশ, ব্রহ্মা, হর, কপিলা, ঠাকুর ঈশান, প্রজাপতি, নারায়ণ, ত্রিলোচন, জগতি, শূলপাণি, গরুড়, খগপতি, শিব, মনসা, পৃথিবী, ত্রিপুরারি, গোসাঞী, শশিকলা, গঙ্গাধর, বাসুকি, বিষহরি,

Dhaka University Institutional Repository

চন্ডিকা, কূর্ম, হনুমান, কমলা (মনসা), যোগমাতা, হনুমন্ত, চক্রপাণি, লক্ষ্মীদেবী, চন্দ্র, ইন্দ্র, অগ্নি, নারদ, পন্চানন, কাল, বহ্নি, ইন্দু, হরি, গগন, আনল, কালী, বিশ্বনাথ, শচী, পুরন্দর, সদাশিব, বিভূতিভূষণ, জগদীশ, শম্ভু, বিধি, ত্রিনয়ান, মৃত্যুঞ্জয়, পশুপতি, ভগবতী, ত্রিদশের নাথ, দুর্গা, শৈলসুতা, হৈমসুতা, ভুতনাথ, দিগম্বর, কাম, অপসর, ভুবন ঈশ্বর, গৌরী, শারদা, কার্তিক, লম্বোদর, গণেশ, গণপতি, গণাই, সাবিত্রী (দুর্গা), হৈমবতী, হুতাশন, পদুমা (মনসা), পাতাল কুমারী, গিরিসুতা, ষড়ানন, গজানন, কেতকা, ঈশ্বর , মহেশ্বর, যোগিনী, পদ্মা, হরগৌরী, জগতগৌরী, বিষহরি, রবি, শশী, আকাশ, পবন, গঙ্গা, শঙ্কর, ত্রিপুরারি, শিব, নীলকণ্ঠ, বীর হনুমান, জয় বিষহরি, বিষ বিনোদিনী, মহাদেব, নেতা, বিশ্বকর্মা, বিশ্বন্তর, যম, কাল, বেকাল, হরি, অবনীর নাথ, দিবাকর, শিবলিঙ্গ, বিশ্বনাথ, শমন, শচী, ঊষা, ঊষাবতী, চন্দ্র, রোহিণী, বাণের নন্দিনী, ভোলা, ত্রিনয়ান, ঊষাবালী, শূলপাণি, কীর্ত্তিবাস, দেবের দেবতা, গায়ত্রী, নিরঞ্জন, শূন্যমূর্তি, হরি, ভগবান, কৃষ্ণ, কৃষ্ণের নন্দন (কামদেব), অনিরুদ্ধ (কৃষ্ণের পৌত্র), বিধাতা, কামের কুঙার (অনিরুদ্ধ), কামিলা, কানু, রাধিকা, মদন, কন্দর্প, মদনের পুত্র, বিধি, বৃহস্পতি, সুরগুরু, সুরাচার্য, ক্ষিতি, পরম দয়াল গুরু, কল্পতরু, ধর্ম, খগেন্দ্র, দেবরাজ পুরন্দর, সহস্র নয়নধারী, প্রবর, জয়ন্ত (ইন্দ্রের পুত্র), যম, কাল, দিবসনাথ, অরুণ, ইন্দু, রাহু, হুতাশন, বরুণ, শচীর নন্দন (গৌরাঙ্গ), নন্দী, মহাকাল, অষ্টদিক দশপাল, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, জানকী, পবন-নন্দন, ভরত, শত্রুঘ্ন, পৃথিবী-মন্ডল, গোবিন্দ, গরুড়, রতি, মদন, বসন্ত (মদনের সখা), গগনমন্ডল, নারদমুনি, শমন, জগন্নাথ, কামদেব, দেব হলধর, বিষ্ণু, দেবী নারায়ণী, কূর্ম, বাসুকি, অষ্ট লোকপাল, দিনকর, ভানু, শ্রীপতি (কৃষ্ণ), শ্রীহরি, মহামায়া, নটবর (কৃষ্ণ), দেব ষান্মাতুর (কার্তিক), বিনতানন্দন (গরুড়), শিব, শিবা, দিগম্বরী (গৌরী), ঈশ্বর , নারায়ণ, হর, হরি, অভয়া, ত্রিপুরারি, পার্বতী, মহাদেব, বরদা (মনসা), যদুনাথ (কৃষ্ণ), ঊষা, অনিরুদ্ধ, শিব-দ্বারী (বাণ রাজা), ত্রিলোচন, কেতকা, মনসা।

বণিক খন্ড ঃ

মনসা, নেতা, ঈশান, ঈশান দুহিতা, পশুপতি, চৌদ্দ ভুবন, চতুর্দশ শিব, মহেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রবি, শশী, কুবের , বরুণ, যম, হুতাশন, পৃথিবী, গণেশ, সাবিত্রী (দুর্গা), লম্বোদর, গজানন, শশিমুখী, মহালক্ষ্মী, সরস্বতী, বিশালাক্ষ্মী, বারাহী, কালিকা দেবী, ষষ্ঠী দেবী, ক্ষেত্রপাল, বিধি, ভুবন, আকাশ, দেবগণ, বিষ হরি, হরি, বিশ্বনাথ, ভানু, দুর্গা, মঙ্গল চন্ডিকা, জয় দুর্গা, বসুমতী, চন্ডী, গগন, ইন্দ্র, অষ্টলোকপাল, জগতগৌরী, বিশ্বমাতা, জয়া (মনসা), হর, শঙ্কর, বিষ বিনোদিনী, ত্রিপুরারি, পদ্মাবালী, পদ্মা, কার্ত্তিবাস, খরতরী (মনসা), পরমেশ্বরী, জগতি, জয় বিষহরি, মনসাকুমারী, কামদেব, কামের তনয়, গোবিন্দ,

Dhaka University Institutional Repository

গোবিন্দের নাতি, অনিরুদ্ধ, বাণের কন্যা, উষাবতী, উষা, উষাপতি, ক্ষিতি, কেতকা, ত্রিলোচন, ভুজঙ্গজননী, শঙ্কর, পুরন্দর, দেবরাজ, বিধাতা, গোপাল, নন্দের নন্দন, বনমালী, দামোদর, কাল, কপিলা, কামধেনু, পৃথিবী, দেবী বিষ বিনোদিনী, প্রজাপতি, দেব নারায়ণ, অনন্ত মূর্তি, তুলসী, মহামায়া, আস্তিক মুনি, আস্তিকের মাতা, কমলা (মনসা), রাধা, কানাই, যাদব, বলরাম, কৃষ্ণ, ব্রাহ্মণী, মহাদেব, আদিত্য, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, গন্ধর্বগণ, অবনী, সূর্য, ধর্ম, ব্রহ্ম, সনাতন, শিব, পবন, নেতা ধুবিনী, জরৎকারু মুনি, জরৎকারু জায়া, করুণাময়ী, গণেশ, ত্রিনয়ান, ভরত, জানকী, সীতা, জনক, নন্দিনী, শনি গ্রহ, পবনের পুত্র, বাসুকি, কূর্ম, ভগবতী (মনসা), ঈশ্বরা, বিধাতা, অনন্ত-রূপিণী, ঠাকুরাণী (মনসা), বিদ্যাধরী, উর্বশী, অপ্সরী, লক্ষ্মী, তুলসী, মহামায়া বিশ্বকর্মা, বিশ্বম্ভর, চতুর্মুখ ধাতা (ব্রহ্মা), শশিচূড় (শিব), গরুড়, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, যম, দশদিক পাল, কানাই, বাঞ্ছাকল্পতরু, গোরা ক্ষেত্রপাল, দিবাকর, নারদ মুনি, গৌরী, অনন্ত নাগ, বাসুকি, গঙ্গা, ভাগীরথী, বৈদ্যনাথ, সোম, গজানন, পদ্মাবতী, শচী, মেধা সতী, বিজয়া, জয়া, স্বাহা, স্বধা, ধৃতি, শান্তিবতী, বসু, মাতৃগণ, ব্রহ্মার দুহিতা, ব্রহ্মাণী, শিবা, মদন, রতি, সাবিত্রী, অযোনিসম্ভবা, মহাকাল, যোগী, ভুজঙ্গ-জননী, করুণাময়ী, ধাতা, জাহ্নবী, গঙ্গা, নেতা ধোবানী, বরদাতা (মনসা), ত্রিদশ ঠাকুর (শিব), সর্বদেবগণ, ঈশ্বর, হুতাশন, ত্রিপুরারি, মহামায়া, বিশ্বনাথ, পুরন্দর, গিরীশ, অনঙ্গ, সনাতনী (মনসা), কিন্নরী, বিদ্যাধরী, গন্ধেশ্বরী, অনন্তারি (মনসা), পাতালবাসিনী, ভৈরব ভাবিনী, লক্ষ্মীস্বরূপিনী মাতা, মহাকাল রাত্রি তপস্বিনী, আদ্যাশক্তি (মনসা), জয়া (মনসা), পুরন্দর, ভগবান, মহী, নারায়ণী দেবী, অনাদিদেব, মৃত্যুঞ্জয়, মহেশ্বরী, দেবী সরসিজাসনী (মনসা), হরিহর, চন্দ্র, সূর্য, ধর্ম, শচীনাথ, ঈশ্বর, তুলসী, কপিলা, বামদেব।

দ্বিতীয় ক্ষেমানন্দ ঃ

১৩১৬ বঙ্গাব্দে কলকাতাস্থ বঙ্গবাসী - ইলেকট্রো-মেসিন প্রেস থেকে নটবর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত কবি ক্ষেমানন্দ দাস প্রণীত ' মনসামঙ্গল' - এর ভূমিকায় সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় উল্লেখ করেছেন, '' প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান করিতে করিতে মানভূম জেলার অন্তর্গত লাড়া - পাবড়া গ্রাম হইতে আমরা মনসামঙ্গলের একখানি পুঁথি প্রাপ্ত হই। পুঁথিখানি পাঠ এবং আলোচনা করিয়া উহা যে, ক্ষেমানন্দ-কৃত মনসামঙ্গলের আদর্শ, আমাদের এরূপ ধারণা জন্মিয়াছে। ..... অধুনা ক্ষেমানন্দ বিরচিত বলিয়া যতগুলি পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তক প্রচলিত আছে, তাহার কোন একখানির সহিত উহার মিল নাই। পুঁথিখানির আর এক বিশেষত্ব - উহা দেবনাগর অক্ষরে লিখিত।''[৮৩] গ্রন্থ- সম্পাদক কাব্যটিকে 'ক্ষেমানন্দ-কৃত মনসামঙ্গলের আদর্শ' মনে করলেও কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ সহ অন্যান্য ক্ষেমানন্দ

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ যতীন্দ মোহন ভট্টাচার্য কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের সম্পাদকের ভূমিকায় এ প্রসঙ্গে তাঁর গবেষণাধর্মী অভিমত রেখেছেন এভাবে - ''শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ-সম্পাদিত (ও 'বঙ্গবাসী ' প্রেস হইতে প্রকাশিত) ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল এবং মৎ - সম্পাদিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে , উভয় গ্রন্থ যে একই কবির রচনা হইতে পারে না, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে । প্রথমতঃ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বঙ্গবাসী সংস্করণে কেতকাদাসের উল্লেখ কোথাও নাই ; সর্বত্র ক্ষেমানন্দের ভণিতা আছে। আলোচ্য সংস্করণে কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ উভয় নামের ভণিতাই দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ বঙ্গবাসী সংস্করণ মাত্র ৭৯ পৃষ্ঠার গ্রন্থ। আলোচ্য সংস্করণের শুধু বেহুলা - লখিন্দর পালাই ১৪৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে।..... (১) পাত্র-পাত্রীর নামবৈষম্য, (২) স্থান - নামবৈষম্য এবং (৩) ঘটনা ও পারম্পর্যের বিভিন্নতা বিচার করিলে আলোচ্য গ্রন্থদ্বয় যে একই কবির রচনা নহে, অথবা এক গ্রন্থ যে অপর গ্রন্থের পরিবর্তিত বা সংক্ষিপ্ত রূপ নহে, ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।''[৮৪] যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের এই অভিমতের সাথে আশুতোষ ভট্টাচার্য,[৮৫] সুকুমার সেন,[৮৬] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[৮৭] প্রমুখের ঐকমত্য পরিলক্ষিত হয়। সুকুমার সেন এই ক্ষেমানন্দকে ''দ্বিতীয় ক্ষেমানন্দ''[৮৮] হিসেবে অভিহিত করত তাঁর কাব্যের রচনা কাল '' সপ্তদশ শতাব্দী ''[৮৯] বলে অনুমান করেছেন। পক্ষান্তরে আশুতোষ ভট্টাচার্য এর রচনাকাল ''অষ্টাদশ শতাব্দী ''[৯০] বলে মনে করেছেন।

গবেষকদের মতে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে 'দ্বিতীয় ক্ষেমানন্দ ' ক্ষেমানন্দ নাম গ্রহণ করে তাঁর ক্ষুদ্র কাব্যখানা রচনা করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তার কাব্যখানা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল । তাঁর কাহিনীতেও বেশ কিছু স্বতন্ত্রতা আছে । অত্র কাব্যের জেলী চাঁদ সদাগরের ভূমিকাটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার মত। চাঁদের মনসা-পূজার প্রসঙ্গটাই ধরা যাক। দুই শিবলিঙ্গ কোলে করে চাঁদ স্নান সেরে আসলেন। এরপর শিবপূজা করার পর পশ্চিমমুখী হয়ে (পূর্বমুখী নয়) বসলেন তিনি মনসা পূজা করার উদ্দেশ্যে । অতঃপর -

''জয় ভেবী বল্যে বেণ্যা দেই পুষ্পপানি।
তা দেখিয়ে হাসে মাতা জগৎজননী।
দৈবের নিবন্ধ ভাই কে করে খন্ডনে।
ভেবী বলিতে দেবী বাইরায় চান্দের বদনে।।
পুষ্প জল ধূপ দীপ দিল সদাগর।

Dhaka University Institutional Repository

তুষ্ট হঞে মনসা মা তারে দিল বর।।
পূজিতে পূজিতে চান্দের দিব্যজ্ঞান হল্য।
পশ্চিম মুখ তেজ্যে চান্দের পূর্ব্বমুখ হল্য।।
মনসায় পূজিয়ে চান্দের আনন্দিত মন।
প্রণাম করিল চান্দ অতি বিলক্ষণ।''৯১

এখানে অত্র মুদ্রিত গ্রন্থ৯২ অবলম্বনে দেব-দেবীদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছেঃ

বন্দনা অংশ ঃ

মনসাদেবী, জরৎকারু মুনি, আস্তিক মুনি, বাসুকি, রাধা, মাধব, রাম, যাদব, গোপাল, হলধর, হরি, কাল, জগৎ, যম, যমদূত, শিব, গণপতি, সীতা, রঘুনাথ, কমললোচন, চন্দ্র, সূর্য, বরুণ, পবন, গঙ্গা, ভাগীরথী, ভোলানাথ, ইন্দ্ররাজ, গরুড়, গদাধর, শ্রীনদ্যার চান্দ, ঠাকুর জগন্নাথ, গণেশ, কার্তিক, উমা, কাত্যায়নী, সরস্বতী, গ্রাম্য দেবীগণ, শ্রীগুরু, রোহিণী, যোগিনী, যক্ষ-প্রেত-ভূত, কামখ্যা - কামিনী, দেবগণ, দেবী পদ্মাবতী।

বণিক খন্ড ঃ

দেবী মনসা, কপিলা, ভোলানাথ, ব্রাহ্মণী, জগতজননী, বিধি, শশধর, ভুবন, গঙ্গা, ইন্দ্র, অপ্সরী, অগ্নি, পাত্র ধোবিন, বিশাই, পবন, পৃথিবী, নিতাই ধোবিন, পুরন্দর, চন্দ্র, সূর্য, পদ্মাবতী, হরি, বিধাতা, ধর্ম, মদন, রবি, শশী, গদাধর, বরুণ, কাল, দেবগণ, জগত, শিব, কাশীনাথ, গগন, জগৎ-ঈশ্বরী, রাম, মহেশ্বর, কমলা দেবী।

তৃতীয় ক্ষেমানন্দ ঃ

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত কেতকাদাস - ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল (প্রথম খন্ড) গ্রন্থের পরিশিষ্ট (ক) - তে ক্ষেমানন্দ নামক কবি রচিত 'মনসাপুস্তক' মুদ্রিত হয়েছে। '' এই ক্ষেমানন্দ - কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ও বঙ্গবাসী-প্রেসে মুদ্রিত 'মনসামঙ্গল ' রচয়িতা ক্ষেমানন্দ হইতে পৃথক ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়।''৯৩ অসম্পূর্ণ কাহিনী সম্বলিত মুদ্রিত এই 'মনসাপুস্তক' - এ 'চাঁদের সপ্ততরী নির্মাণ ও সিংহল-যাত্রার উদ্যোগ ' থেকে শুরু করে 'লখিন্দরের বিবাহ - সম্বন্ধ ' পর্যন্ত স্থান লাভ করেছে। এ খন্ডিত কাব্য থেকে কবি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা সম্ভব নয়। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের

Dhaka University Institutional Repository

মত মাঝে মাঝে মনসাকে 'জগতী ' আখ্যাদানকারী অত্র ক্ষেমানন্দ ভণিতার এক স্থানে উল্লেখ করেছেন -

''জয় দেবি হরসুতা দেহ জ্ঞানদান ।
সাজাদা রায়ের বংশ খেমানন্দ গান।''৯৪

আচার্য সুকুমার সেন কর্তৃক ''তৃতীয় ক্ষেমানন্দ ''৯৫ অভিধা লাভকারী এই ক্ষেমানন্দ নিজেকে শাজাদা রায়ের বংশধর হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। উল্লেখ্য, মনসামঙ্গলের অপর এক কবি - কবিচন্দ্রও নিজেকে শাজাদা রায়ের বংশধর বলে তাঁর কাব্যে বার বার উল্লেখ করেছেন -

''সাজাদা রাএর বংশে কবিচন্দ্র গায়
মোর সুত রঘুবীরে হইবে সদয়।।
মোর সহোদরে আর রঘুবীরে
দয়া না ছাড়্য জগতী।''৯৬

এখানে দেখা যাচ্ছে , পুত্র রঘুবীর এবং অনুল্লেখিত নাম ভাইয়ের জন্যে কবি কবিচন্দ্র দেবী মনসা তথা জগতীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। তৃতীয় ক্ষেমানন্দের সাথে কবিচন্দ্রের সম্পর্ক এবং তাঁদের দু'জনের রচনার মধ্যে মিলের পরিমাণ যাচাই করার মত পর্যাপ্ত উপাদান পাওয়া যায়নি। অবশ্য, এমনও হতে পারে - পৃথক গায়েন সম্প্রদায় সৃষ্টিকারী এই দু'জন ভাই ছিলেন। তৃতীয় ক্ষেমানন্দের নিবাসস্থল ছিল ''চিন্তিতপুর গ্রামে।''৯৭

তৃতীয় ক্ষেমানন্দের রচনারীতি উপেক্ষণীয় নয়। শাপগ্রস্তা ঊষার মর্ত্যলোকে বেহুলারূপে জন্মের বিষয়টা দেখা যেতে পারে -

''শাপে ভ্রষ্ট হৈয়া ঊষা জন্মিলা আপনি।
উত্তম ক্ষণেতে হৈল বেহুলা নাচনী।।
* * *
মনসার দাসী সেই জন্মিল সংসারে।
নৃত্য করে গীত গায় মা বাপের ঘরে।।
* * *
শিশুকাল হৈতে সেই পূজয়ে জগতি।
দৈবের লিখন আছে জীয়াইবে পতি।।''৯৮

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় ক্ষেমানন্দের রচনা কাল সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ভাবে জানা না গেলেও তা খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতকের পূর্বে হওয়ার কথা নয় । নিচে তাঁর মুদ্রিত কাব্যাংশ[৯৯] থেকে দেবদেবীদের তালিকা প্রণয়ণ করা হয়েছে-

শ্রীকৃষ্ণ, মনসা, নেতা, বিশ্বকর্মা, জগতী, হরি, শূলপাণি, গঙ্গা, পবন, শ্রীশ্রীজগন্নাথ, সীতা, রঘুনাথ, গগন, জয় বিষহরি, অভয়া, হনুমান, মহাবীর, কাল, মহেশ্বর, সদাশিব, হরসুতা, হর, শিব, ধর্ম, খরতরী (মনসা), জরৎকারু, যম, যমদূত, আস্তিক, আস্তিকের মাতা, গণেশ, ঈশান (শিব), ঈশাননন্দিনী, বিষবিনোদিনী, দেবেন্দ্র, বিধি, রাম, বৈদেহী (সীতা), বসুমতী, বসুমতীসুতা (সীতা), লক্ষ্মণ, শ্রীগুরু, শনিশ্চর, ধাতা, কমলা/বরদা, ব্রাহ্মণী, পবননন্দন, অবনী, আগুন, রাহু, চাঁদ, ক্ষিতি, ষষ্ঠীদেবী, প্রজাপতি, শশধর, চন্দ্র, ঊষা, গ্রহ, শনি, শিবসুতা, সরস্বতী, শশিমুখী, ভুজঙ্গ বাহিনী (মনসা)।

তন্ত্রবিভূতি ঃ

উত্তরবঙ্গ তথা সমগ্র বঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যধারার অন্যতম প্রধান কবি হচ্ছেন তন্ত্রবিভূতি। আগে তাঁর নাম শোনা গেলেও তাঁর কাব্য সম্পর্কে তেমন কিছু জানা ছিল না। ডঃ আশুতোষ দাস তন্ত্রবিভূতির কাব্য আবিষ্কার এবং প্রচার করার পর তাঁর কাব্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ হয়েছে। তন্ত্রবিভূতি বিরচিত 'মনসাপুরাণ ' (লক্ষণীয়, মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণের স্থলে বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' এর পরে এটিই ব্যতিক্রমী নাম) - এর ভূমিকায় সম্পাদক ডঃ আশুতোষ দাস বলেছেন, '' বিপ্রদাসের মনসাবিজয় কাব্যানুরূপ ধর্মপূজা প্রসঙ্গ তন্ত্র বিভূতির মনসাপুরাণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । চন্ডীমঙ্গলের অন্তর্গত শিবদুর্গার কাহিনী অবলম্বনে শিবায়ণ কাব্য রচনার প্রয়োজন পরবর্তীকালে কবিরা অনুভব করিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণের অঙ্গীভূত শিবব্রহ্মাদির ধর্মপূজার প্রসঙ্গ উত্তরকালে ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার উদ্ভাবনে সহায়ক হইয়াছিল কিনা এ প্রশ্ন স্বতঃ মনে জাগে।''[১০০] আচার্য সুকুমার সেন তন্ত্রবিভূতির কাব্যের একটি বিশেষ দিকের প্রতি পন্ডিত - গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তন্ত্রবিভূতি তাঁর কাব্যে একাধিক বার মনসাকে ' তোতলা' নামে আখ্যায়িতা করেছেন -

''তোতলা সর্বেশ্বরী নমো দেবী বিষহরি

* * *

তন্ত্রবিভূতি পদে গায়।''[১০১]

Dhaka University Institutional Repository

''মনে মনে হাসে মা ব্রাহ্মণী তোতল

* * *

তন্ত্রবিভূতে গায় মনসার বরে।।''[১০২]

এই 'তোতলা ' নামটির তাৎপর্য কি ? ''মনসা যে তোতলা ছিলেন এমন কোন ইঙ্গিত কোন গল্পে পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। ..... মহাযান বৌদ্ধধর্মের মহাদেবী তারার মন্ত্রে তাঁকে ' তুত্তারা' বলা হয়েছে।-'' ওঁ তারে তুত্তারে .....'' । এই তুত্তারার সঙ্গে তোতলা নামটির ধ্বনি সংগতি আছে। কিন্তু মানে ? ''[১০৩] বঙ্গদেশে সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থানের সময়ে বৌদ্ধ দেবদেবীগণ যখন নতুন পরিচয় লাভ করছিলেন তার সাথে হয়তো এর কোন যোগ-সূত্র থাকতে পারে।

উত্তরবঙ্গের মালদহ অঞ্চলের[১০৪] অধিবাসী তন্ত্রবিভূতি তাঁর কাব্য-রচনার কোন সন, তারিখ বা ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ না করায় তাঁর সময়-কাল সম্পর্কে সন্দেহাতীত ভাবে কোন কিছু বলা সম্ভব পর নহে। প্রায় সকল গবেষকই তাঁর সময়কাল খ্রীস্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতক বলে অনুমান করেছেন। অবশ্য-সপ্তদশ শতকের মনসামঙ্গলের (উত্তরবঙ্গীয়) কবি জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে তন্ত্রবিভূতিকে কাল-নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিশারীস্বরূপ।[১০৫] পন্ডিত কবি তন্ত্রবিভূতি উত্তরবঙ্গীয় অপর দুই মনসামঙ্গলের কবি - জগজ্জীবন ঘোষাল এবং জীবনকৃষ্ণ মৈত্রের অগগামী। তাঁর কাব্যের কাহিনীতে প্রচলিত কাহিনীর তুলনায় কিছু কিছু নতুনত্ব দেখা যায়, চরিত্রসমূহ ও একেবারে গতানুগতিক নয়। যেমন মালাবতী কাহিনী তন্ত্রবিভূতির নিজস্ব সৃষ্টি , যা উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গলে অভিনব। এছাড়া মনসামঙ্গলের প্রচলিত কাহিনীতে ঊষা-অনিরুদ্ধ ইন্দ্র- সভায় শাপগ্রস্ত হয়ে মর্ত্যধামে বেহুলা-লখিন্দর রূপে জন্ম গ্রহণ করেন এবং মনসা - চাঁদ সদাগরের বিবাদ মিটিয়ে পরে আবার তারা স্বর্গে ফিরে যান। কিন্তু তন্ত্রবিভূতির কাব্যে ঊষা-অনিরুদ্ধের স্থলে সাবিত্রী সত্যবানকে দেখা যায়। অবশ্য কাব্যে উল্লেখ আছে যে, তারা পূর্বজন্মে ঊষা-অনিরুদ্ধ ছিলেন। স্বল্প পরিসরে সাবিত্রীর-বয়ানে ঊষা - অনিরুদ্ধ কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে কবি অন্ত্রবিভূতি অনন্য সাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন -

''সাবিত্রী বোলেন আমি নিবেদি চরণে।
পূর্ব্ব জন্মের কথা প্রভু সুনহ এখনে।।
মহারাজ্য আছে প্রভু দ্বারকা নগর।

Dhaka University Institutional Repository

তোমার জন্ম হৈল প্রভু শ্রীকৃষ্ণের ঘর।।
বাপ কামদেব হয় রতি তোমার মা।
লক্ষ্মী সরস্বতী তোমার হয় বড় মা।।
সংসার মোহিতে পারে আমার শ্বশুর।
তাহার তনয় তুমি অনিরুদ্ধ সুর।।
আর রাজ্য আছে প্রভু জয়ন্তী নগর।
আমার জন্ম হৈল প্রভু বাণ রাজার ঘর।।
বাণের ঝিয়ারী আমি উষা বালী।
এক শত ভাই তোমার চরণে দিল বলি।।
সপনে দেখিলাঙ তোমা না পাই চাহিয়া।
তোমাকে আনিলাঙ চিত্ররেখা পঠাইয়া।।
মায়াতে হইলা তুমি সুবর্ণ ভ্রমর।
সাত তাল জাঙ্গাল লঙ্ঘি আইলে বাসর ঘর।।
সুবর্ণ ভৃঙ্গার জলে পাও পাখালিল।
সেই ত শোণিতপুরে গন্ধর্ব বিভা হৈল।।
সাবিত্রী বোলে সত্যবান হাসিয়া ফেলায়।**[১০৬]

নিচে তন্ত্রবিভূতি -বিরচিত মনসা পুরাণ[১০৭] থেকে দেব-দেবীদের তালিকা দেওয়া হয়েছে ঃ

বন্দনা অংশ ঃ

বিষহরি, শঙ্কর, মনসা, শিব, রাম, তোতলা, নারায়ণী, শিবকন্যা, বটমাতা, ধর্ম, বিজয়া, ব্রাহ্মণী, জগত, ব্রহ্মা, হরি, হর, নাটেশ্বরী, সর্বমঙ্গলা, নাগিনী, গোসাই, পদ্মাবতী, মহেশ্বরী, পদমকুমারী, শঙ্করঝিয়ারী, আকাশকামিনী, পাতালগামিনী, ভুবন, জয় জয়কারী, বিষেশ্বরী, ভৈরবী, ব্রহ্ম, ত্রিভুবনেশ্বরী, সনাতনী, ভয়ঙ্করী, জরৎকার মুনি, পবন, দয়াময়ী, নিরঞ্জন, বিষ্ণু, প্রজাপতি, গঙ্গা, গণপতি, সুরেশ্বরী, ভগীশ্বর, পদ্মা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ঠাকুর জগন্নাথ, চতুর্মুখ, গরুড়, দেব দামোদর, ত্রিদশ অধিকারী, মনসাকুমারী, ভাগীরথী, পুরন্দর , যম, অগ্নি, কূর্ম, দেবী বসুমতী, অভয়া, পার্বতী, চন্দ্র, দিবাপতি, বায়ু, বরুণ, দশ দিগপতি, অনিল, আনল, বাসুকী, নারদ মুনি, শশধর, দেবগণ, আস্তিক, দেবপুর।

Dhaka University Institutional Repository

দেব খন্ড ঃ

প্রভু ভোলানাথ, নারায়ণী, শিবকন্যা, বটমাতা, বিজয়া, ব্রাহ্মণী, হর, ধর্ম, শিব, ত্রিশ কোটি দেবতা, বিভূতি-ভুষণ, শ্রীরাম, মনসা, শিব, আদ্যের তুলসী, লক্ষ্মী, জগন্নাথ, রুদ্রাক্ষ, পঞ্চমদন, দুর্গা, গৌরী, পার্বতী, ত্রিদশ ঈশ্বর, পৃথিবী, বাসুকী, পদ্মা, শঙ্কর, মহাদেব, অষ্টকুলা নাগদেবী, পদ্মাবতী, কার্তিক, বিধি, গণপতি, জয় বিষহরি, গঙ্গা, হেমন্তনন্দিনী, দশভুজা, কালী, অসুরদলনী, গণেশ, ধর্মরাজ, দেবগণ, নিরঞ্জন, পদ্ম মুনি (মনসা), ভবানী, শঙ্কর নন্দিনী, অষ্টকুলা নাগ, যম, ইন্দ্র, মা তোতলা, মহেশ্বর, দেব দিগম্বর, শূলপাণি, দেবতী পদ্মা, চন্দ্র, সূর্য, গন্ধেশ্বরী, বায়ু বরুণ, অষ্ট লোকপাল, ব্রহ্মা, ভুমন্ডল, মহেশকুমারী, বিশ্বকর্মা, বিশাই, তুলসী, রাই, কপিলা, কুবের, নারদ মুনি, বিষ্ণু, নবগ্রহ, হরি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কামেধেনু, বিশ্বরূপ (শিব), সদাশিব,বিষেশ্বরী, গঙ্গা, দেবী শঙ্করী, দিগম্বরী, সুরেশ্বরী, ত্রিলোচন, কালা (কৃষ্ণ), মহেশ্বরী, বিশ্বম্ভর, হরহরি, ত্রিজগত নাথ, গঙ্গাধর, জরৎকার মুনি, বিষহরি, রবি, প্রজাপতি, আগুন, গন্ধর্ব, বিদ্যাধরী, নেতাই, সন্ধ্যাদেবী, অনিরুদ্ধ , উষা, বসুমতী, অষ্টনাগ, আসন বাসন (মনসাদেবীর প্রথম পাত্র)।

বণিক খন্ড ঃ

হরি, গোবিন্দ, জরৎকার মুনি, পদ্মা, মনসা, দেব ত্রিলোচন, শিব, ধর্ম, বিধি, শঙ্কর, দেবগণ, গণেশ, কার্তিক, দ্বাদশ আদিত্য, গঙ্গা ভাগীরথী, দেবী ভগবতী, দেব পুরন্দর, যম, চন্দ্র শেখর, নারদ মুনি, অগ্নি অবতার, ষষ্ঠী অবতার, ব্রহ্মা তপোধন, গরুড়, দশ অবতার, কাহ্নাই, কৃষ্ণ, রাধিকা, রাধা, জগন্নাথ, মধুসূদন, বিশ্বনাথ, নারায়ণ, মহেশ, সুভদ্রা, বলাই, রতি, কামদেব, মীন অবতার, অনিরুদ্ধ কুমার, উষাবালী, কুর্ম অবতার, দেব চক্রপাণি, ধরণী, বরাহ অবতার, পৃথিবী, নরসিংহ অবতার, বামন অবতার, পরশুরাম, শ্রীরাম, সীতা, বুদ্ধ অবতার, কলি অবতার, প্রজাপতি, ত্রিদশ ঈশ্বর, পদ্মাবতী, শূলপাণি, মহাদেব, দুর্গা, জয় বিষহরি, ব্রাহ্মণী, তোতলা, দেবতী পদ্মা, আস্তিক মুনি, ধনেশ্বর, ইন্দ্র, ভুবন, সৃষ্টিকর্তা, বিধাতা, আসন বাসন, ভোলানাথ, শঙ্করনন্দিনী, আনল, নেতাই পাত্র, গন্ধেশ্বরী, কুবের, লক্ষ্মী, অষ্টনাগ, অষ্টকুলা নাগ, কালিকা, দেবী, ক্ষেত্রগণ, দেব দিগম্বর, গোসাই, মহেশ্বর, কাল, পদমকুমারী, দিবাকর, ত্রিজগত নাথ, পবন, বৃহস্পতি, শ্যাম, শঙ্করদুহিতা, ত্রৈলোক্যনাথ, মহামায়া, বিষ্ণু, হর, অখিল ব্রহ্মান্ডেশ্বর, ডাকিনী, যোগিনী, পতিতপাবন, গোপাল, সদাশিব, নারায়ণী, কৃপাময়ী, শিবকন্যা, অস্তিজননী, ভগবান, ঈশ্বর, বসুমতী, ইন্দ্রদেব, ভুবনমন্ডল, পার্বতী, বোমকেশ, ত্রিপথগামিনী (গঙ্গা), পতিতপাবনী, মন্দাকিনী, অলকানন্দা, দেবী ভোগবতী, সরস্বতী, ভগীরথী, জাহ্নবী, শীতরি, মা ভবানী,

Dhaka University Institutional Repository

মদন, শালিগ্রাম, তুলসী, বিশ্বকর্মা, বিশাই, বিদ্যাধর, বিদ্যাধরী, মহামায়া, উনপঞ্চাশ পবন, হনুমান, মহাবীর, পবননন্দন, গজানন, লম্বোদর, জনক নন্দিনী, জানকী, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘন, শনিগ্রহ, পশুপতি, সুরেশ্বরী, শঙ্করী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, কার্তিক, সহস্রলোচন, যুগিনী, গৃধিনী, বিবাদেশ্বরী, গৌরী, পার্বতী, হেমন্তঝিয়ারী, উর্বশী, মেনকা, রম্ভাবতী, নীলাবতী, মঙ্গলাবতী, মালতী, লোচনী, সত্যবতী, ত্রিনয়ানী, মা অভয়া, অবনী, শ্রীকৃষ্ণ, বাণের ঝিয়ারী (উষা), কামদেব, কামের তনয় (অনিরুদ্ধ), হরগৌরী, রাহু, সিজবৃক্ষ, নন্দের নন্দন , অগ্নি, অপ্সরা, অপ্সরী, দিবাকর, বিধাতা, মঙ্গলচণ্ডী, পৃথ্বী, জগতগৌরী, দেবতা, অখিলের পতি, অন্নপূর্ণা, চণ্ডিকা, নিন্দালি (নিদ্রালি), বাসুকী, দেবতা-গন্ধর্ব-কিন্নর, অরুণ, সূর্য, দন্ড-পাণি (যম), সন্ধ্যাদেবী (যমের মাতা), যমদূত (বেতাল, তাল, কাল, মহাকাল, কালিয়া, কাজল, নেঙ্গা, চেঙ্গা, বেঢ়াভাঙ্গা, ঠেঙ্গা, পিপিরিয়া), ক্ষিতি, কপিলা, যদুবীর, রঘুনাথ, কাহ্নাই , অগ্নি, আনল, নেতাই ধুবিনি, ধনাই নন্দন (নেতাইর ছেলে), সুরপতি, সহস্রলোচন, ঠাকুরাণী (পদ্মা), নন্দী, মনসাকুমারী, ধর্মের ঝিয়ারী (গঙ্গাদেবী), ঈশ্বরী, ঈশ্বর, দেবী পদ্মামুনি, ত্রিদশ দেবতা, মহাদেব, দেবগণ, অষ্ট লোকপাল, ভূতনাথ, ইন্দ্র, মাতুলি সারথি, রবি, বিষহরি, সাবিত্রী, সত্যবান।

জগজ্জীবন ঘোষাল ঃ

উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যধারার যে কবি সর্বপ্রথম জনসমক্ষে পরিচিতি লাভ করেন তিনি হচ্ছেন জগজ্জীবন ঘোষাল । তন্ত্রবিভূতি এ ধারার প্রাচীনতম কবি হলেও এই সেদিন পর্যন্তও তিনি লোক সমাজে অজ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু তুলনামূলকভাবে জগজ্জীবন ঘোষাল সেদিক থেকে ভাগ্যবান। দিনাজপুর জেলাস্থ কোচ আমোরা বা কুড়িয়া মোড়া গ্রামে জগজ্জীবন বাস করতেন।[১০৮] ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথের সমসাময়িক ছিলেন কবি জগজ্জীবন ঘোষাল।[১০৯] তাই মনে হয়, কবি খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে কিংবা অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে তাঁর কাব্য রচনা করেন। কবির আত্মপরিচয়মূলক বিভিন্ন পুষ্পিকাংশে[১১০] তাঁর বিস্তারিত তথ্য অবগত হওয়া যায় ; কবির পিতামহ - জয়ানন্দ, পিতা- রূপরায় চৌধুরী, মাতা - রেবতী, সহোদর - ঘনশ্যাম, পত্নী - পদ্মমুখী, পদবী - ঘোষাল, নিবাস-কুচিয়ামেড় ; রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ জগজ্জীবনের গ্রামটি মহারাজ প্রাণনাথের রাজ্যভুক্ত।

মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ কাব্য রচনার ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের একটা স্বতন্ত্র ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। উত্তরবঙ্গীয় মনসামঙ্গলের কবিদের মধ্যে এ পর্যন্ত তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল এবং জীবনকৃষ্ণ

Dhaka University Institutional Repository

মৈত্রের নাম জানা গিয়েছে। কবি জগজ্জীবন তাঁর পূর্বসূরী তন্ত্রবিভূতির কাব্যকে আত্মসাৎ করে নেওয়ার পাশাপাশি তাঁর উত্তর সূরী জীবন মৈত্রের কাব্যের রূপরূপ ও রসরূপের মধ্যে যুগজয়ী মৃত্যুঞ্জয়তা অর্জন করেছেন।১১১ যথারীতি দেবখন্ড ও বাণিয়া খন্ড (বণিক খন্ড) - এ বিভক্ত জগজ্জীবনের কাব্যের প্রারম্ভেও ধর্মমঙ্গল কাব্যের মত সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণ আছে। কবি শিবদুর্গার গ্রাম্যকাহিনীও কিছু কিছু অনুসরণ করেছেন। জগজ্জীবনের দেবখন্ডের কাহিনী বিপ্রদাসের মনসাবিজয় এবং তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণের কাহিনীর সাথে তথ্যগত মিল সত্ত্বেও বিশিষ্টতার দাবী রাখে। তাঁর কাব্যের সৃষ্টিতত্ত্বে মনসার জন্মকাহিনী অভিনবত্বে মনোরম হয়ে উঠেছে।

প্রলয়ের পর সমগ্র পৃথিবী জলমগ্ন। বটপাতার উপর অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ অনাদিদেব ঈশ্বর প্রলয়ের জলে ভাসার সময় সৃষ্টি-ইচ্ছায় আপ্লুত হলেন। অনাদিদেব (দেব নিরঞ্জন) তাঁর চার ভাইকে প্রলয় ঘুচিয়ে সৃষ্টিকার্যে মনোনিবেশ করার নির্দেশ দিলেন। অনাদিদেবের আকাঙ্খনুযায়ী চার ভাই সৃষ্টিকার্যে তৎপর হয়েও সৃষ্টিকার্য সম্ভাবনাকুল কোন উপায় দেখতে না পেয়ে তাঁরা একত্রে পরামর্শের মাধ্যমে প্রলয়ের জলের মধ্যে ধর্ম নামে এক দেবতার সৃষ্টি করলেন। প্রলয় জলাসীন ধর্ম চারদিকে তাকিয়ে কোথাও কোন স্থল ভাগ দেখতে না পেয়ে সংসার জলস্থল সৃষ্টি করার উপায় চিন্তা করলেন। অনিলের অভিপ্রায়ানুযায়ী চার ভাই ধর্মকে তাঁর জন্ম-বৃত্তান্ত, স্বরূপ-পরিচয় এবং জলাধিষ্ঠানের কারণ জিজ্ঞেস করলে ধর্ম নিজেকে অনাদি ঈশ্বর এবং স্বয়ম্ভূ বলে পরিচয় জ্ঞাপন করলেন। তখন অনিল ভাইদের সাথে পরামর্শ করে গুরুনিন্দাপরাধে ধর্মকে অভিশাপ দিলেন যে, তিনি গলিততনু হয়ে জলে ভাসবেন এবং তাঁর দেহে পান্ডুর পোকা আশ্রয় নিবে। অভিশাপোক্তির পর অনিল ধর্মকে সৃষ্টিপত্তন - প্রসঙ্গে উপদেশ প্রদান করলেন। ধর্ম প্রথমে চরাচর, স্বর্গ, মর্ত্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে সৃজন করবেন দেব, নর সৃষ্টি শেষে মনসাকে সৃষ্টি করবেন। মনসাকে সৃষ্টি করে ধর্ম নিজেই তাঁর রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে বিবাহ করবেন ; কিন্তু অবিধি অনুসারে বিবাহ হওয়ায় সেই লজ্জায় ধর্ম দেহত্যাগ করবেন এবং মনসা সতী আখ্যা লাভ করবেন। মৃত ধর্ম মহেশ্বরের দেহাশ্রয় করত অর্ধেক ধর্ম এবং অর্ধেক মহেশ্বর বা মহেশ এই রূপ প্রাপ্ত হবেন। এই উক্তির পর ব্রহ্মা কর্তৃক সৃজন, বিষ্ণু কর্তৃক পালন, মহেশ্বর বা শিবের 'কাক্য - অধিকার ' এবং মনসার শিবের গৃহিণী রূপ-প্রাপ্তি প্রভৃতি অভিব্যক্তি শেষে সত্য- ত্রেতা- দ্বাপর যুগের শেষে কলিযুগের অন্তিমে লোকধর্মের ব্যভিচার কল্লোলিত স্বরূপ প্রকাশ করে চার দেব (ভাই) অন্তর্ধান করলেন। এরপর ধর্ম অনিলের আদেশ অনুসারে সৃষ্টিপত্তন কর্মপর্যায়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সৃষ্টি করলেন। তাঁরা পিতাকে ছেড়ে তপস্যা করতে সমুদ্র তীরে চলে গেলেন। তখন -

Dhaka University Institutional Repository

"না দেখি পুত্রের মুখ ধর্ম্ম হৈলা মন দুঃখ
তেজিলাত দীর্ঘ নিঃশ্বাসে।
নিঃশ্বাসত নিঃসরিল মনসার জন্ম হৈল
বসিলা উঠিয়া বামপাশে।।
মনসা সে সুন্দরী রূপে গুণে বিদ্যাধরী
চাঁচর মস্তকের কেশ।
শরতচন্দ্র জিনি মুখ দেখিয়া সে বাঢ়ে সুখ
ভুবন জিনিয়া ধরে বেশ।।
হৃদয়েত অর্দ্ধভার তিল পুষ্প নাসা যার
কিছু ধরে পুরুষের ধর্ম্ম।
নাই স্ত্রী নাই বর না জানিয়া বস্তিধর
নপুংসক হৈয়া হৈল জন্ম।।
নখেত দিল রেখ হইল পরতেক
সেই পথে স্রবি রক্ত চলে।
মনসাত কন্যা পায়া ধর্ম্ম পড়ে অচেতন হৈয়া
পবিত্র করে কমন্ডলু জলে।।"[১১২]

নিচে কবি জগজ্জীবন - বিরচিত মনসামঙ্গল[১১৩] অবলম্বনে দেবদেবীদের তালিকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছেঃ

বন্দনা অংশ ঃ

পদ্মা, নারায়ণী, বিধি, সুখদাতা, নারায়ণ, দেবগণ।

দেব খন্ড ঃ

দেব অনাদি, ঈশ্বর, শিব, ধর্ম, নিরঞ্জন, মনসা, দেব অনিল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, দেব শূলপাণি, নারায়ণ, মীন অবতার, কূর্ম অবতার, পৃথিবী, বরাহ অবতার, ধরণী, নরসিংহ, বামন, ভৃগুরাম, রাম, রোহিণীনন্দন, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি, শ্রীহরি, বিধি , অষ্ট লোকপতি, যদুপতি, পুরুষ, প্রকৃতি, লক্ষ্মী,

Dhaka University Institutional Repository

সরস্বতী, হর, গঙ্গা, ভাগীরথী, রবি, ইন্দ্র, যমরাজ, যমদূত, শঙ্কর, শঙ্কর নন্দিনী, জগতবন্দিনী, গন্ধর্বগণ, দিবাকর, দশাবতার, তুলসী, বিদ্যাধরী, ভুবন, অস্তিক মুনি, অস্তিকের মাতা, মহেশনন্দিনী, গোসাঞি (ধর্ম), গোসাঞি (শিব), রাহু, চন্দ্র, মদন, মহাদেবী, অষ্টনাগ, অষ্টনাগ অধিকারী, জরৎকার মুনি, জরৎকার মুনির নারী (পত্নী), বিশ্বেশ্বর (বিষ্ণুদেব), ব্যোমকেশ, মহাদেব, ব্রহ্মমুনি (ধর্ম), মহেশ্বর, জগতস্বামী, ত্রিলোচন, ধর্মদেব, অগ্নি, আনল, পশুপতি, অনাদি, সুরপতি, ব্রহ্মাদেব, শ্যাম, আকাশ, গৌরী, শচী, পুরন্দর, দুর্গা, মহেশ্বরী, নারদ মুনি, ধর্মদেব (শঙ্কর), পার্বতী, ত্রিজগত নাথ (শিব), বিশ্বকর্মা, দেব দিগম্বর, ত্রিদশ ঈশ্বর, সদাশিব, ভোলানাথ, শম্ভু, ক্ষেত্রপাল, ইন্দ্রদেব, সুরপতি, বসুমতী (ইন্দ্রের স্ত্রী), ঠাকুর (শিব), ঈশ্বর, দেব ত্রিপুরারি, চন্ডিকা, জানকী, জানকী নাথ, দেবগণ, ক্ষেত্ররায় (শিব), উগ্রকণ্ঠ, দেবী ত্রিনয়ানী, হেমন্তনন্দিনী, হরের ঘরণী, পার্বতী, সব মঙ্গল চন্ডী, দশভুজা, মহামায়া, দেবতী, কেতকী, হর, নন্দী, ভূতনাথ, চন্দ্র, হরগৌরী, কৃষ্ণ, অভয়া, উমা দেবী, দক্ষ, অপ্সরাগণ (রত্নমালা, জয়া, উষা, বিজয়া, উর্বশী), ভবানী, রাহু, গঙ্গাদেবী, গঙ্গাদেবীর পুত্রদ্বয় (ডাকুর, মহানন্দ), চন্ডী, দেব গ্রহপতি, ভাস্কর, জাহ্নর নন্দিনী (গঙ্গা), মায়াবতী (দুর্গা), অগ্নি, আনল, দেব ত্রিপুরারি, ভগবন্ত (শিব), বট জগন্নাথ, মাতা বিষহরি, গিরিসুতা (গৌরী), অমঙ্গলা, দিগবাস (শিব), গরুড়, ভূত-পিচাস-যক্ষ-কিন্নর, অরুণ, বরুণ, অরুন্ধতী, রুদ্রাক্ষ, দেবেশ্বর (শিব), কামিনীমোহন (শিব), মদনমোহন (শিব), কামদেব , বিধাতা, ত্রিজগত মাতা (গৌরী), গঙ্গাধর, প্রমথ, দেব ভগবান, হারী মহাকাল, মাতুলী, শঙ্কর, বাসুকী, জয় বিষহরি, গণপতি, গণেশ, গজানন, কার্তিক, ষড়ানন, ব্রহ্মাণী, দেব ত্রিনয়ান, কাম, পদ্মাবতী, পদমকুমারী, জয় ব্রহ্মাণী, ত্রিজগত সতী (দুর্গা), মঙ্গলচন্ডিকা, ব্রাহ্মণী (পদ্মা), মঙ্গলচন্ডী, হনুমান, গঙ্গা সুরধনী, মনসা , শিবের দুলালী, দুর্গা, দুর্গার অনুচরী (জয়া, বিজয়া), সংসারের অধিকারী (শিব), ত্রিনয়ানী (দুর্গা), ভবানীনাথ , কপিলা, শমন, কাল, শঙ্কর-ঝিয়ারী।

বানিয়া খন্ডঃ

শিব, দেব ত্রিলোচন, ধর্ম, নারায়ণ, পদ্মা, দ্বিজ অস্তিক মুনি, অস্তিক মুনির মাতা, জরৎকার মুনি, জরৎকার মুনির স্ত্রী, অষ্টনাগ, অষ্টনাগ-অধিকারী, শ্যাম, রাধা, শ্যামা, শঙ্কর, মনসা, শম্ভু, সরস্বতী, দেবগণ, শূলপাণি, মহাদেব, শিবনন্দিনী, ব্রহ্মাণী, বিষহরি, নেতা, ভোলানাথ, অগ্নি, আনল, যম, বিধি , বিধাতা, দুর্গা, মহেশ, দেব দিগম্বর, হর, ঈশ্বর, অখিলেশ্বর, ভাগীরথী, গঙ্গা, পতিতপাবনী, হরি, শমন, নারদ মুনি, ব্রহ্মা, প্রভু বামন, কৃষ্ণ, সুরধনী, সুরমুনি, জাহ্নবী, নারায়ণী, চৈতন্য অবতার , নন্দী, ভব, পদ্মাবতী, হনুমান, পবণনন্দন, পদ্মা, ব্রাহ্মণী, রাম, দিবাকর, শশধর, তুলসী, গৌরী, পার্বতী, জগতমাতা,

Dhaka University Institutional Repository

দেবী কাত্যায়নী, ইন্দ্র, শচীপতি, শচী, মাতুলী, সহস্রলোচন, উষা, অনিরুদ্ধ,বাণের কুমারী, কামদেব, কামের নন্দন, মদন, রতি, মন্দাকিনী, দক্ষরাজা, দক্ষসুতা, দশভুজা, ত্রিনয়নী, উমা, সিংহবাহিনী দেবী, উমাপতি, পশুপতি, ভবানীনাথ, ভবানী , তারিণী, অভয়া, চন্ডিকা, অন্নপূর্ণা, পদ্মমণি, নেতাই, বাসুকী, জগতগৌরী, দেবতী, শঙ্কর নন্দিনী, কালা, কাহ্নাই, নন্দের পো, বিশ্বকর্মা, রাহু, চন্দ্র, ধর্ম, শমন, আকাশ, কাল, নিদ্রালি, অনঙ্গ, পরমেশ্বর, সংকটতারিণী, দেব অনাদি, রবি, রবিসুত, যমরাজা, তপন, তপনের সুত, দন্ডপাণি, যমদূত গণ (মহাদূত, বেতাল, তাল, কাল, মহাকাল, কালিয়া, কাজলা, লেঙ্গা, পেঙ্গা, বেঢ়া, ভাঙ্গন, চেঙ্গা, পিপিঠেঙ্গা, নিশাচর, নিমুন্ডা - নিলাই, দন্ডসার, মূলাদাতা, বিজুরিচন্ডল, হুড়া, ভেড়া মুন্ডা, মহাচন্ডা, তেমুন্ডা, ভাঙ্গড়া, আচাভুয়া, আন্ধার মুহা, চরক, ধন্ধ, বিজিমুহা, বিড়ালচক্ষা, লোহালঙ্গা, তালজঙ্গা, কিকট, বিকট, মহাহাতিখোঁজ), অরুণ, বরুণ, নারদ মুনি, গরুড়, ভুতনাথ, যদুবীর, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত রাজা, শত্রুঘন, সীতা, লক্ষ্মী, জানকী, জানকীনাথ, রঘুনাথ, গোবিন্দ অবতার, দশ অবতার, ধরণী, ঠাকুরাণী (পদ্মা), সূর্য, পৃথিবী, আকাশ, সুরপতি, গঙ্গাদেবী, দুর্গাদেবী, শ্রীমতি রাধিকা, যদুপতি, কাম, গণপতি, গণেশ, কার্তিক, গোসাঞি (শিব), বিশ্বম্ভর, অখিল ব্রহ্মান্ডপতি, শম্ভু, হর, হরের ঘরণী, পার্বতী, হেমন্তনন্দিনী, জগতমাতা, ঈশ্বরী, দেব হরিহর, পদমকুমারী, ত্রিজগতপতি, ত্রৈলোক্যনাথ, বিদ্যাধরীগণ (রত্নমালা, জয়া, উষা, বিজয়া, উর্বশী), পঞ্চানন, পঞ্চমুখ, ভগবান, দেবের দেবতা, যোগিণী, পৃথ্বী, জয় ব্রহ্মাণী, মনসাদেবী, গন্ধর্ব-বিদ্যাধর, পবন, ধনেশ্বর, নেতেলা, অস্তিক-জননী, দেব মহেশ্বর, মহেশ্বরী, দেব পুরন্দর, গোপাল, বলরাম, শ্যামসুন্দর, কালাচান্দ, অষ্টদিক লোকপাল, সহস্রালোচন, জগত, আগুন, কন্দর্প, অনঙ্গ, পরমেশ্বর, গৌরী।

বিষ্ণু পাল ঃ

সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে বীরভূম অন্চলেই মনসাপূজার সবচেয়ে বেশি প্রচলন দেখা যায় । সেখানে অদ্যাপিও মনসাপূজার যে ব্যাপক অনুষ্ঠান হয় , তাতে এখনও মূলতঃ যে কবির মনসামঙ্গল গান গীত হয়ে থাকে তিনি হচ্ছেন বিষ্ণু পাল। বীরভূম অন্চলের বিষ্ণু পালের এই একচ্ছত্রাধিপত্যকে সিলেট (শ্রীহট্ট) অন্চলের মনসামঙ্গল রচয়িতা ষষ্ঠীবর দত্তের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

ডঃ সুকুমার সেন কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ''Visnu Pala's Manasa Mangal নামক একখানা ইংরেজী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে (১৯৬৮ খ্রীঃ) ভূমিকায় সম্পাদক লিখেছেন, " It is the only known manuscript of the work that is presented in something like a complete from. The

Dhaka University Institutional Repository

manuscript is not very old; it seems to have been written sometime between 1775 and 1825''[১১৪] বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গলের মূল রচনাকাল সুকুমার সেন[১১৫] খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ কিংবা অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ বলে অনুমান করেছেন। তাঁর এই মতের সাথে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য,[১১৬] ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্[১১৭] প্রমুখ একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। বিষ্ণু পালের কাব্য থেকে কবির কোন পরিচয় জানা না গেলেও বীরভূম অঞ্চলের জন প্রবাদ থেকে জানা যায় যে, রাণীগঞ্জের নিকটবর্তী সেরগড় পরগণাস্থ কোনও এক গ্রামের বাসিন্দা বিষ্ণুপাল জাতিতে কুম্ভকার ছিলেন।[১১৮]

মনসা-মঙ্গল সাধারণত এক মাসে গীত হবার জন্যে রচিত হত ; কিন্তু চন্ডীমঙ্গল আবার আট পালায় বিন্যস্ত করে আট দিনে গীত হবার জন্যে রচিত হত। বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গল চন্ডীমঙ্গল রচনার আদর্শে আট পালায় বিভক্ত হয়ে রচিত হওয়ার কারণে ইহা মনসার ' অষ্ট মঙ্গলা গান ' নামে খ্যাত। অবশ্য তাঁর মনসামঙ্গল আট পালায় (বন্দনা পালা, পরীক্ষিত পালা, ধন্বন্তরি পালা, গন্ধেশ্বরী পালা, বানুজ্য (বাণিজ্য) পালা, সম্বুন্ধ (সম্বন্ধ) পালা, বিয়া পালা এবং জাগরণ পালায়) বিন্যস্ত হলেও ইহা মূলতঃ দেব খন্ড এবং বেন্যা খন্ড (বাণিয়া খন্ড) এই দুই খন্ডে বিভক্ত। বিষ্ণু পালের কাব্যের শুরুতেও ধর্মমঙ্গল কাব্যের অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব রয়েছে। কাব্যের ভাষা প্রায় সম্পূর্ণই আঞ্চলিক কথ্য ; রচনা শিথিলবদ্ধ, এতে কবিত্ব থাকলেও তা সুদৃঢ় সংবদ্ধ নহে ; পল্লী-গীতিকার (ballad) এটাই লক্ষণ। বিষ্ণু পালের রচনা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পল্লীগীতিকার ধর্মী হওয়ার কারণে ইহা বাংলার লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত।

মনসাদেবীর প্রচলিত নামসমূহ ছাড়াও কবি বিষ্ণু পাল তাঁর কাব্যের বিভিন্ন ভনিতায় 'জগতি' এবং 'কেউতুকি (কেওতুকি) ' নাম দুটোও ব্যবহার করেছেন ঃ

''আমার বচন শুন   জগতি মনসা আন

জগতি মনসা অইলে।

মোর সুত্র বাঁচিবে গীত কবি বিষ্ণু পালে ভনে ।''[১১৯]

''কেউতুকি চরণ   শিরে বন্দে গীত

কবি বিষ্ণু পালে গায়।।''[১২০]

মনসাদেবীকে ' জগতি' নামে একাধিক কবি সম্বোধিত করলেও ' কেউতুকি' (কেতুকি/কেতুকী, কেতুকা, কেতকা) নামে এর পূর্বে শুধুমাত্র কেতকাদাস ক্ষেমানন্দই অভিহিত করেছেন। বিষ্ণু পালের

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যে দেবদেবীগণ পৃথিবীর নারী - পুরুষের মত সুখদুঃখ ভোগ করেছেন, মর্ত্যের মানুষের মত তাঁহাও ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাড়িত। পৃথিবীতে কেউ পূজা করে না, চাঁদ সদাগর 'কানী, কানী, ' বলে অপমান করেন - এই দুঃখ জানিয়ে মনসাদেবী পিতা শিবের কাছে তাঁর অভিযোগ জ্ঞাপন করলেন -

''শুন শুন বাপ শুন সদাশিব
পেণ্ডার দুখের বাণী।
স্বর্গের অনিরুদ্র আনিয়া দাও বাপা
মর্তে লইব ফুলপানি।
অন্ন দেবতার পূজা যামি তোমার ঝি।
এতদিন আছিলাম পবন ভখিয়া
এবে সে করিব কি।
ব্রহ্মা হরিহর ইন্দ্র পুরন্দর
তারা রাখে মোর মান।
মহিমন্ডলে খেয়াতি রহিলে
সদাই করিল অপমান।
কাঁনি কাঁনি বলিয়া চান্দো গো
নিদেয় কহিতে বাসি এ লাজ।''[১২১]

যে দেবতা মানুষের পূজা লাভের জন্যে উদগ্রীব, তাঁর অন্তরের ব্যাকুলতা মনসামঙ্গলের কবিরা কোনদিক দিয়েই চেপে রাখেননি -বিষ্ণুপালের রচনায় সেটাই স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। বিষ্ণু পাল সংস্কৃত পুরাণকে বাঙালীর ঘরের উপাদানরূপে এমন ভাবে পুনরর্গঠিত করেছেন, যা পন্ডিতগণও এত সুন্দর ভাবে করতে সক্ষম হননি।

এখানে বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গল[১২২] অনুসারে দেব-দেবীদের নাম তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে ঃ

বন্দনা অংশ ঃ

দেবগণপতি, দেব হর, দেবগন, পার্বতী, সন্নি (শনি), অম্বিকা, হনু, বিধি, গণেশ, শ্রীহরি, সরস্বতী, মাতা কমলা, বচন - ঈশ্বরী, ইছা দেবী, ভারথি (ভারতী), বরদা।

Dhaka University Institutional Repository

দেব খন্ড ঃ

আদি পুরুষ, প্রভু অনাদি, ধর্ম, ব্রহ্মা, শূন্য, প্রভু নিরঞ্জন, বাসকি নাগ, পৃথিবী, পশুপতি, বসুমতী, মনসা, চন্ডিকা, দুর্গা, আদি কুন্ডলিনী, দেব ত্রিলোচন, গদাধর, কশ্যপ মুনি, সনাতনী, অভয়া, ভবানী, বিষহরি, বরাহ, দক্ষিত মুনি, ব্রহ্মা, গরুড়, নারায়ণ, যম, সূর্যের নন্দন, সূর্য, পবন, বরুণ, অলিক্ষি (অলক্ষ্মী), হুতাশন, চন্দ্র, ব্রহ্মার তনয়, অদিতি, দেবগণ , দিবাকর, কপিলা, বটবৃক্ষ, মুরারি, অনাদ্য, মহাদেব, ধর্মকুমারী, চৌষট্টি যোগিনী, চৌদ্দভুবন, গোসাঞি, শঙ্কর, পদ্মমুখী, হরগৌরী, হর, গৌরী, বিশ্বকর্মা, শিব, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, মহেশ্বর, লক্ষ্মী, নারায়ণ, সুরপতি, রাজা পুরন্দর, পদ্মা, গঙ্গা, সুরেশ্বরী, অগ্নি, ষষ্ঠী বুড়ি, কার্তিক, ষড়ানন, শমন, শঙ্কর - নন্দন , কেউতুকি (মনসা), ত্রিপুরারি, দেব গন্ধর্ব, নারদ মুনি, মহারুদ্র, হনুমান, বিষ্ণু, গদাধর, রাধা, ভোলা, ত্রিদশের ঈশ্বর, জয় বিষহরি, ধর্মরাজ, সরস্বতী, গঙ্গাদেবী, কুবের , ভান্ডারী, কমলা (মনসা), তুলসী, মা ভারতী, হরের ঝিয়ারী, ইন্দ্ররাজা, যম, অষ্টনাগ, অষ্টনাগের মা, পদ্মাবতী, দেব ত্রিপুরারি, নবদুর্গা, চন্ডী, ঈশ্বরী, লম্বোদর, ভৈরবী, যোগপতি, সিদ্ধাপতি, হরের ঘরণী, উমা, অষ্ট গোপাল, যোগের যুগিনী, সিজ বৃক্ষ, পাত্র নেতাই, বিশাই, মা ব্রহ্মাণি, বিধাতা, ব্রহ্ম, জগৎপতি, রতি, মদন, দেব চক্রপাণি, শূলপাণি, নরসিংহ,দশ অবতার, ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণি, শচী , ইন্দ্র, সূর্যের ঘরণী, আদি প্রকৃতি, দেবরাজ, রাহু, কেতু, পশুপতি, গোবিন্দ, ঠাকুর বলাই, সিদ্ধাপতি, মহাদেব, কপিলা, নীলাম্বর (ইন্দ্রের পুত্র), রুদ্রাক্ষ, চৌষাট্টি ভবানী, দামোদর, শালগ্রাম, ঠাকুর জগন্নাথ, হেমন্তের ঝিয়ারী, গণাই, অনল, আগুন, বরদা, সুরেশ্বরী, চন্ডী, জগতি (মনসা), নারদ মুনি, বিশ্বম্ভর, অস্তিক মুনি, অস্তিকের মা, নীলকণ্ঠ, সুপাত্রী ধোবানী, অনন্ত নাগ, ব্রাহ্মণি, সুভদ্রা, বিধি, পদ্মনি (স্বর্গ-নন্দিনী), রঘুনাথ, আনল, আগুন, চিত্রগুপ্ত, কাল, বেকাল, কশ্যপ মুনি, দেব সুরাময়, গগন, পুরন্দর , লক্ষ্মীনারায়ণ, জগতি মা , মতা ঈশ্বরঝিয়ারী।

বেন্যা খন্ড ঃ

শিব, হর, গৌরী, হরগৌরী, মহেশ্বর, প্রভু ভোলা, বিষহরি, নেত ধোবিনী, ত্রিপুরারি, পবন, কাম, নাগমুনি, মাধাই (মনসার বাহন), মনসা, বিশ্বকর্মা, বিশাই, কামিলা, শঙ্কর, বিধাতা, গোবিন্দ, গরুড় , শ্রীরাম, ইন্দ্র, মহাদেব, জগন্নাথ, অগ্নি, বিষহরি, পার্বতী, কপিলা, ব্রাহ্মণি, রুদ্রাক্ষ, নেত পাত্র ধোবিনী, ঈশ্বর-ঝিয়ারী, সূর্য, ধর্ম, মা কমলা, যম, জয় ব্রহ্মাণি, সীতাদেবী, শ্রীরামচন্দ্র, মা মনসা, তুলসী, শ্যামদুলাল, গগন, পৃথিবী, পবন, ধরণী, কেউতুকি (মনসা), দেবগণ, যমের দূত, সূর্য, মহারুদ্র, দুর্গা, ভুবন, বসুমতী, মাতা ঈশ্বর ঝিয়ারী, জগতি মাতা, মা হরবিন্দু কমলা, ত্রিদশের ঈশ্বর, গরুড়, হরের

Dhaka University Institutional Repository

ঝিয়ারী, বিষহরি, ভারতী, কমলা, বরদা, বরুণ, যোগিনী, সিযু মনসা, বিধি, অনাদি, শিব, সিদ্ধাপতি, গণেশ, অগ্নি, রাম, পবন, ব্রহ্মা গোসাঞি, আলিক্ষী (অলক্ষ্মী), হুতাশন, গঙ্গা, বিধাতা, অষ্টনাগ, দুর্গা, রাম, লক্ষ্মণ, গন্ধেশ্বরী, মা ঈশ্বরী, দেবগণ, ইন্দ্র বিদ্যাধরী, লক্ষ্মী, হনুমান , অগ্নি, আকাশ, চন্দ্র, গন্ধেশ্বরী, রবি, সদাশিব, ঊষা, অনিরুদ্ধ, হরিহর, ইন্দ্র, পুরন্দর , নারদ মুনি, ঈশ্বরী, গঙ্গা, পাত্র ধোবিনি, ধর্ম, শিব, নারায়ণী, বাসকি নাগ, রতি, কাম, মদন, কেউতুকি, জনার্দন, কুবের, লক্ষ্মী, ভানু, ভাস্কর, সীতা, রামচন্দ্র, অন্তর্যামিনী মাতা, মহারুদ্র, ভবানী, অভয়া, দুর্গা, গরুড়, কৃষ্ণ, হনুমান, জগৎগৌরী, অনন্ত নাগ, দেবী ভদ্রকালী, ইছা দেবী, যম, গোবিন্দ, কাল, বেকাল, সুরেশ্বরী, গঙ্গার পুত্রদ্বয় (ডানি ও ডাকুর), নারায়ণ, নেত ধুবিনি, ধোনা-মোনা (নেত-এর পুত্রদ্বয়), ত্রিশ কোটি দেবতা, শূলপাণি, শিবের দুয়ারী, মহাকাল, অনাদি, সদাশিব, হেমন্তের ঝি, দুর্গা, ব্রহ্মা, রোহিণী, বিষ্ণু, ধর্ম, মহেশ্বর, মা ভুজঙ্গ জননী, যম, চিত্রগুপ্ত, ঠাকুর জগন্নাথ, যম রায়, দেব দিগম্বর, ত্রিলোকের ঈশ্বর, মা শশীমুখী (মনসা), কানাঞি, জটাধর, গঙ্গা, জগৎগৌরী, সরস্বতী, রামা দেবী, মহাদেব, সুধাতরঙ্গিনী, অস্তিক মুনি, অস্তিকের মা, জয়া বিজয়া, বাসুদেব, শ্রীহরি।

ষষ্ঠীবর দত্ত ঃ

শ্রীহট্ট জেলার সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণের কবি হচ্ছেন নারায়ণ দেব ; তার পরেই রয়েছেন কবি ষষ্ঠীবর দত্ত। নারায়ণ দেব তাঁর অসাধারণ কবিত্বশক্তির গুণে শুধুমাত্র শ্রীহট্টে নয়, সমগ্র পূর্ববঙ্গ এবং আসাম প্রদেশে তিনি মনসামঙ্গলের সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় কবির গৌরব অর্জন করেছেন। কিন্তু ষষ্ঠীবর দত্তের কবিত্ব খ্যাতি শুধুমাত্র শ্রীহট্ট জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ; অবশ্য শ্রীহট্ট জেলার কোন কোন এলাকায় নারায়ণ দেব অপেক্ষা ষষ্ঠীবরের কাব্যই বেশি প্রচলিত। " পদ্মাপুরাণের একজন শ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণ দেবের সহিত প্রতিযোগিতায় ষষ্ঠবরের কাব্য যে এতকাল ধরিয়া এক বিস্তৃত অঞ্চলে লোকপ্রিয়তা রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে, ইহাই এই কাব্যের আভ্যন্তরীণ মূল্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।" ১২৩

শ্রীহট্ট এবং তার কাছাকাছি এলাকা ছাড়া অন্য কোন অঞ্চল থেকেই ষষ্ঠীবর দত্তের ভণিতাযুক্ত পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গলের কোন পদ আবিষ্কৃত হয়নি এবং কেবল মাত্র শ্রীহট্ট অঞ্চলেই ষষ্ঠীবরের কাব্যের ব্যাপক প্রচার থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই শ্রীহট্ট জেলাতেই কবির নিবাস ছিল। অনুমান করা হয় যে, কবি ষষ্ঠীবর দত্ত শ্রীহট্ট জেলার মৌলভীবাজার মহকুমার (বর্তমানে জেলা) গুপ

Dhaka University Institutional Repository

অন্তর্গত গয়গড় গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।[১২৪] ষষ্ঠীবরে কাব্য থেকে তাঁর কোন পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় না। তবে এ সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু পদ[১২৫] পাওয়া যায়।

''জ্যেষ্ঠ ভাই বন্দি গাই পিতার সমান''।

''ভণে গুণরাজ খানে কাজীর বড়াই''।

ইত্যাদি

এর থেকে জানা যায় যে, কবি ষষ্ঠীবর দত্তের এক জ্যেষ্ঠ ভাই ছিলেন এবং কবির উপাধি ছিল গুণরাজ খাঁ। ষষ্ঠীবর তাঁর কাব্যের প্রারম্ভিক বন্দনায় জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের নাম উল্লেখ না করলেও কুলপঞ্জিকাগুলোতে তাঁর নাম পাওয়া যায় - হৃদয়ানন্দ।[১২৬] কথিত আছে , সুগায়ক হৃদয়ানন্দ কনিষ্ঠ ভাই ষষ্ঠীবরের রচিত পদ্মাপুরাণের পদসমূহ গান করতেন এবং অনুমিত হয় এ কারণেই তাঁর নামও ষষ্ঠীবরের কতগুলো পদে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। উল্লেখ্য, ষষ্ঠীবর নিজেও ''তালচর'' হাতে নিয়ে পদ্মাপুরাণ গান করতেন, যা চিত্তাকর্ষক ছিল।[১২৭]

কবি ষষ্ঠীবর দত্ত তাঁর কাব্যমধ্যে গ্রন্থরচনার কাল সম্পর্কে কোন কিছুই উল্লেখ না করায় অনুমানের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কাব্যের ভাষা বিচার করেও কাল নির্ধারণের উপায় নেই। শ্রীহট্টের প্রচলিত কথ্যভাষা অবলম্বন করেই মূলতঃ তিনি কাব্য রচনা করলেও বহুল প্রচারের কারণে তাঁর অধিকাংশ পুঁথিরই ভাষা আধুনিকতায় রূপান্তর লাভ করেছে। তাঁর কাব্যমধ্যে সমসাময়িক কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির নাম উল্লেখ থাকলেও কাল উদ্ধারে সহায়ক হত। যাহোক, ষষ্ঠীবরের জ্যেষ্ঠ ভাই হৃদয়ানন্দের বংশধরদের গৃহে রক্ষিত বংশলতা থেকে হিসেব কষে (গড়ে চার পুরুষে এক শতক ধরে) দেখা যায়, খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে কবি ষষ্ঠীবর দত্ত জীবিত ছিলেন এবং সম্ভবত সে সময়েই তিনি তাঁর কাব্য রচনা করেন।[১২৮] আশুতোষ ভট্টাচার্য এ অভিমত রাখলেও বিশেষ করে ষষ্ঠীবর দত্তের প্রকাশিত কাব্যে ভারতচন্দ্রের (১৭০৭-১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ) প্রভাব দেখে সুকুমার সেন,[১২৯] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[১৩০] প্রমুখ গবেষক কবিকে খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষভাগের বলে মনে করেছেন।

মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ কাব্যরচনার মূল যে ধারাটি পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের কবিদের পারস্পরিক প্রভাবের ফলে ক্রমবিকশিত হচ্ছিল, তার সঙ্গে বাংলার সুদূর প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দা ষষ্ঠীবরের কোন সংযোগ ছিল না ; স্বীয় পরিবেশ থেকে ভাবটি সংগ্রহের মাধ্যমে তিনি এর একটি

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত কাব্যরূপ দিয়েছেন। তাঁর কৃতিত্ব এই যে, কোন কোন স্থানে বিশুদ্ধ পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করলেও , মনসামঙ্গলের লৌকিক কাহিনীকে তিনি ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছেন - পল্লীজীবন সুলভ একটি সাবলীল কাহিনীর প্রবাহ কাব্যের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুন্দরভাবে অগ্রসর হয়েছে বিধায় তাঁর কাব্য পল্লী সাহিত্যেরই অন্তর্গত। দেব খন্ড, বাণিজ্য খন্ড এবং স্বর্গারোহণ খন্ড - এই তিন খন্ডে বিভক্ত ষষ্ঠীবর দত্তের কাব্যের স্বর্গারোহণ খন্ডটি সংক্ষিপ্ত হলেও সর্বাপেক্ষা করুণ। কবি এই অংশ রচনায় স্বভাব কবিত্ব গুণে বিষয়ের মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছেন।

দীর্ঘদিনের নিরুদ্দিষ্ট জামাতা লখিন্দর এবং কন্যা বেহুলা (বিপুলা) যোগী ও যোগিনীর ছদ্মবেশে উজানিনগরে এসে নিজেদের পরিচয় গোপন করলেন। কিন্তু স্নেহময়ী মায়ের কাছে বেহুলার এই প্রতারণা বিবেককে দংশন করতে থাকলেও স্বর্গের চরম বিস্মৃতি লোক থেকে আহূত হয়ে তারা আর মর্ত্যের মায়ার পরিচয়ে জড়িয়ে থাকতে পারছেন না। তাই -

"বিপুলায় বলে, প্রভু চল হেথা হনে।
মায়ের করুণা মোর না সহে পরাণে।।
আমি হনে মার কিছু না হইল সুখ।
আর না শুইমু মায়ের বুকে দিয়া মুখ।।"[১৩১]

এক করুণ রূপকের মধ্য দিয়ে পদ্মাপুরাণের কাহিনীর পরিসমাপ্তি কল্পনা করা হয়েছে। কোনও বাস্তব-লোকে কাব্যের এই শেষাংশ সংঘটিত হতে পারে না ; কেননা এ যে কল্পলোকের স্বপ্ন - কল্পনা মাত্র এবং পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল কাব্যের ইহাই ভাব-সম্মিলন। ষষ্ঠীবরের রচনায় কাহিনীগত এই রূপকের মর্যাদা সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রয়েছে। বেহুলার মায়ের স্বপ্নদৃষ্টির সামনে যোগী-যোগিনীর এই স্মৃতিঅবশেষ মায়ামূর্তি নিমিষেই হারিয়ে গেল।

বিভিন্ন জন কর্তক শ্রীহট্ট থেকে প্রকাশিত ষষ্ঠীবর দত্তের পদ্মাপুরাণের মধ্যে ১৩৩২ বঙ্গাব্দে বিরাজাকান্ত ঘোষ সম্পাদিত 'পদ্মাপুরাণ' এবং ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে ফণীন্দ্রচন্দ্র দাস ও গিরিশচন্দ্র দাস সম্পাদিত 'পদ্মাপুরাণ' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৩২] কিন্তু এ দুটোর একটিও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি বলে আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা'য়[১৩৩] উদ্ধৃত অংশসমূহ থেকে দেব - দেবীদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

মনসাদেবী, নেতাদেবী, অনন্ত নাগ, অনন্তের আই, হর, বিষহরী, দেব হরিহর, পদ্মাবতী, ভারতী দেবী, সরস্বতী, পদ্মা, শিব, বিষ্ণু, দেবগণ, দেব ত্রিপুরারি, শঙ্কর, দেব মহেশ্বর, পার্বতী, গৌরী, গঙ্গা, মহাদেব, চন্ডী, গোঁসাই, নন্দী, দেবতার নাথ, ভোলানাথ, সর্বদেব, পন্চানন, কামদেব, রতি, লক্ষ্মী, গণপতি, রাম, রঘুপতি, গদাধর, নারায়ন, নবদুর্গা, রবি, চন্দ্র, অনাদি, দেবী অভয়াকুমারী, বাণের কুমারী, উষা, ইন্দ্ররাজ, শূলপাণি, জয় বিষহরি, নেতাই, বিধি, আকাশ, ভুবন, মহাদেবের ঝি, জয় পদ্মাবতী, ধোপার ঝি (নেতা), ব্রহ্মা।

জীবন মৈত্র ঃ

উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যধারার কবিত্রয়ের মধ্যে জীবনকৃষ্ণ মৈত্র হচ্ছেন কনিষ্ঠতম। বগুড়া জেলার অন্তর্গত করতোয়া নদীর তীরবর্তী লাহিড়ী পাড়া গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে অনন্ত - স্বর্ণমালার গৃহে কবি জীবন মৈত্রের জন্ম হয়।[১৩৪] নাটোরের রাণী ভবানীর পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের সমসাময়িক, 'কবিভূষণ ' উপাধিধারী জীবন মৈত্র তাঁর কাব্য রচনার কাল প্রসঙ্গে তাঁর রচিত 'পদ্মাপুরাণে ' উল্লেখ করেছেন,

''মহীপৃষ্ঠে শশী দিয়া বাণ বিধু সমর্পিয়া
বুঝহ সনের পরিমাণ।''[১৩৫]

এর থেকে জানা যায় যে, ১১৫১ বঙ্গাব্দে বা ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে জীবন মৈত্র তাঁর কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্যও তন্ত্রবিভূতি এবং জগজ্জীবনের মত দেব খন্ড - বণিক খন্ডে বিভক্ত। জগজ্জীবন যেমন তন্ত্রবিভূতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, জীবনও তেমনি জগজ্জীবনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। জীবন মৈত্রের কাব্যের আকার বেশ বড়, কাহিনীও প্রায় গতানুগতিক, তবে কিছু কিছু নতুনত্বও রয়েছে, যেমন লখিন্দর কর্তৃক কামাগঞ্জ নগর স্থাপন ইত্যাদি। তাঁর রচিত মনসামঙ্গলের কাহিনীর সাথে বিহারে রচিত বেহুলা -বিষহরীর কাহিনীর বেশ কিছু মিল দেখা যায়। ধারণা করা হয় উত্তর বিহার থেকে উত্তরবঙ্গে আগত মনসামঙ্গলের কাহিনীর প্রাচীনতম ধারাটি অবলম্বন করেই জীবন মৈত্র তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। উত্তর বঙ্গে মনসামঙ্গলের কাহিনীর সাথে নাথধর্মের অনেক তত্ত্বকথা মিশে যাওয়ায় জীবন মৈত্রও তাঁর কাব্যে সেগুলোর প্রয়োগ করেছেন। তাঁর কাব্যে উপন্যাসের লক্ষণ প্রকটিত হওয়ার কারণেই মনে হয় উত্তরবঙ্গে তাঁর কাব্যের জনপ্রিয়তা বেশি।

Dhaka University Institutional Repository

নারী-চরিত্র - পরিকল্পনায় জীবন মৈত্র খুব একটা সফল না হলেও চাঁদ সদাগরের চরিত্র পরিকল্পনায় তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। ছদ্মবেশিনী ডোমনীর হাত থেকে বিচনিখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে তাতে শিব-দুর্গার চিত্র দেখে চাঁদ সদাগর কপালে ঠেকিয়ে ভক্তি করলেন। কিন্তু ঐ বিচনিতেই অংকিত মনসার চরিত্রের উপর দৃষ্টি পড়তেই-

> ''ক্রোধ করি ডোমনী পানে চায় সদাগর।
> কম্পিত কম্পায়মান বেলালি সুন্দর।।
> পলাইল ডোমনী বিচনি ভূমে ছাড়ি।
> ক্রোধ করি সাধু মারে বিচনাত বাড়ি।।
> পাকায় নয়ন, দন্ত করে কড়মড়।
> সাধু বলে, ''ডোমনীক ধরিয়া বন্দী কর।।''[১৩৬]

জীবন মৈত্রের 'পদ্মাপুরাণ' শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মুদ্রিত হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।[১৩৭] মূলতঃ একে কেন্দ্র করেই আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা'য় উদ্ধৃত জীবন মৈত্রের কাব্যের অংশ-বিশেষ এবং আশুতোষ দাস সম্পাদিত ' তন্ত্রবিভূতি বিরচিত মনসাপুরাণ'[১৩৯] এর সম্পাদকের ভূমিকায় 'তন্ত্রবিভূতি জগজ্জীবন ও জীবন'- এর তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত জীবন মৈত্রের পংক্তিমালা থেকে দেব-দেবীদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে ঃ

পদ্মা, নেতা, মনসা, পদ্মাবতী, যম, ধর্ম, ঈশ্বর, শিব, নিরঞ্জন, ব্রহ্মা, গণপতি, কার্তিক, দুর্গা, চন্ডী, ভবানী, মহাদেব, অনাদি, অনন্ত, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত রাজা, শত্রুঘ্ন, সীতা, জনকের দুহিতা, রঘুনাথ, মদন, রতি, চন্দ্র, রাহু, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, সাবিত্রী, গায়ত্রী , হর, গৌরী, শ্রীহরি, নারায়ণ, দেব ষড়ানন, মহেশ্বর, শূলপাণি, সদাকাল, বিরূপাক্ষ, বিশ্বনাথ, চন্ডিকা, অগ্নি, বিধি , জয় বিষহরী, ধরণী, গগন, সিদ্ধি গুরু, দশ অবতার, সপ্ত হনুমান, রবি, শশী, নবগ্রহ, আকাশ, ধোনা (নেতার পুত্র), আস্তিক মুনি, আস্তিক - জননী, অষ্টনাগ, অষ্টনাগের অধিকারী, জরৎকার মুনি, জরৎকার, মুনির নারী (স্ত্রী), ব্রাহ্মণী, বিদ্যাধরী, গঙ্গা, জগত, রাজা পুরন্দর, দেবগণ, নাগমাতা, দেবমুনি (অস্তিক মুনি), নাগিনী, কাল (যম), দেবের দেব (মহাদেব)।

Dhaka University Institutional Repository

সীতারাম দাস ঃ

সীতারাম দাস খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতকের কবি, যিনি প্রধান দুটি মঙ্গলকাব্য (ধর্মমঙ্গল এবং মনসামঙ্গল) রচনা করেছিলেন। বাঁকুড়া জেলাস্থ ইন্দাস গ্রামে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ জাতিভুক্ত দেবীদাসের পুত্র এবং সভারামের ভাই সীতারাম দাসের জন্ম হয়।১৪০ অল্পবয়সেই গায়কবৃত্তি গ্রহণকারী সীতারাম দাস ধর্মমঙ্গল ও মনসামঙ্গল গেয়ে শোনাতেন। তাঁর গৃহদেবী ' গজলক্ষ্মী মা '- কে অনেক গবেষক বৌদ্ধ আদ্যা বা চন্ডী হিসেবে উল্লেখ করেছেন ।১৪১ গায়কবৃত্তি গ্রহণ করা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেলেন যে, তাঁর গৃহদেবী -

''নূপুর দিলেন মোরে চিন্তিয়া কুশল
গুরু নয় শিশু গায় পরম মঙ্গল।।''১৪২

সীতারাম দাসের মনসামঙ্গলের মনসাদেবী মূলতঃ তাঁর গৃহদেবী গজলক্ষ্মী মাতা । তাই তিনি দেবীকে 'কমলা' বলার পাশাপাশি নিজের কাব্যকে কখনও কখনও ' কমলাকীর্তন' নামেও অভিহিত করেছেন। বিষ্ণু পালের কাব্যের মত সীতারাম দাসের কাব্যেও ধর্মঠাকুর সর্বাধিদেবতা। সীতারামের মনসা ধর্মপূজা করেছেন -

'' ধর্ম পূজে বিষহরি''১৪৩

সীতারাম দাস ধর্মমঙ্গল রচনার (১০০৪ মল্লাব্দ) দশ বছর পরে অর্থাৎ ১০১৪ মল্লাব্দে ('শশি বিন্দু চন্দ্র বেদ') মনসামঙ্গল রচনা করেছিলেন।১৪৪ খ্রীস্টাব্দের হিসেবে তা দাঁড়ায় ১৭০৮-০৯ অব্দ । দেবীর কৃপায় তিনি মনসামঙ্গল পুঁথি লাভ করে নতুন কাব্য লেখার দৈব আদেশে আপ্লুত হয়েছিলেন-

'' দেখাত্যে সরণি যবে দিয়া গেলে পুঁথি
আপনার গীত গুণ শুন গো জগতী।''১৪৫

সীতারাম দাস কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের সাথে বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন : তাঁর কাব্যের সর্বত্র এবং বিশেষ করে বেহুলার যাত্রাপথের বর্ণনায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সীতারাম দাসের মনসামঙ্গল মুদ্রিত হবার তথ্য পাওয়া যায়নি। তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থের অভাবে দেব-দেবীদের তালিকা সন্নিবেশিত করা সম্ভব হল না।

Dhaka University Institutional Repository

বাণেশ্বর রায় ঃ

বাণেশ্বর রায় খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতকের পশ্চিমবঙ্গের মনসামঙ্গলের কবি। হরিনারায়ণের কনিষ্ঠপুত্র বাণেশ্বরের '' নিবাস চম্পকপুরী জন্ম রায়পুরে।''১৪৬ কিন্তু 'চম্পকপুরী ' কিংবা 'রায়পুর' সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। বাণেশ্বরের মনসামঙ্গলের রচনাকাল সম্বন্ধে তিনি কোন হেঁয়ালী না করে সরাসরি বলেছেন -

'' মনসা-মঙ্গল ভাষে প্রথম বৈশাখ মাসে
ষোল শ এক চল্লিশে
ভাবিয়া ভবাণী হর ভণে দ্বিজ বাণেশ্বর
মনসার মঙ্গল-প্রকাশে ।''১৪৭

এর থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ১৬৪১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭১৯ (১৬৪১ + ৭৮) খ্রীস্টাব্দে 'দ্বিজ ' উপাধিধারী বাণেশ্বর রায় তাঁর মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। সুপরিচ্ছন্ন ভাষায় সুসংবদ্ধ রচনায় বাণেশ্বর সম্পূর্ণ বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর বেহুলা চরিত্রটির উপস্থাপন করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় - ছদ্মবেশিণী মনসা কর্তৃক পরিচয় এবং দুর্ভাগ্যের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে গাঙ্গুড়ের জলে ভাসমান বেহুলা বলেছে -

''কান্দিতে কান্দিতে কন বেহুলা যুবতী।
ভুবনে আমার সম নাঞি ভাগ্যবতী।।
বিবাহ করিয়া নাথ লয়্যা আইল মোরে।
প্রভুর সঙ্গেতে ছিলাম লোহার বাসরে।।
জন্মে জন্মে কত আমি ভগ্নব্রত করি।
তাহাতে কুপিত কিবা দেবী বিষহরী।।
না জানি তাহার ঠাঞি হইল কোন পাপে।
যামিনীতে মোর নাথে বিনাশিল সাপে।।
পতির যতেক লোক - চান্দ সনকা জননী।
শ্বশুর কহিল মোরে দুরক্ষর বাণী।।
বণিক - বনিতা মাঝে গালি দিল মোরে।
আপনি সাপিনী হঞা খালি বংশধরে।।

Dhaka University Institutional Repository

হইল আমার মনে অতি অনুতাপ।
লইয়া প্রাণের নাথ জলে দিলাঙ ঝাঁপ।।''১৪৮

মৃত স্বামী লখিন্দরের সঙ্গিনী হয়ে ভেলায় ভেসে স্বর্গলোকে বেহুলার যাত্রা তো আসলে স্বামী নিয়ে জলে ঝাপ তথা প্রাণ বিসর্জন করারই রূপক বিশেষ। এমন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে মনসা-মঙ্গলের অন্য কোন কবিই বেহুলা চরিত্রকে পর্যবেক্ষণ করেন নি। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে বাণেশ্বরের রচনার একটা বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

বাণেশ্বর রায়ের মাত্র একখানা পুঁথি (তাও অসম্পূর্ণ) সংগৃহীত হয়েছে , মুদ্রণ-সৌভাগ্য লাভে সক্ষম হয়নি। তাঁরও মুদ্রিত গ্রন্থের অভাবে দেব-দেবীদের তালিকা সন্নিবেশিত করা সম্ভব হল না।

দ্বারিকা দাস ঃ

মসামঙ্গল কাব্যধারার অন্যতম কবি দ্বারিকা দাস। উড়িষ্যার সাধক কবি দ্বারিকাদাস সম্পর্কে সাহিত্যমোদী ও সাহিত্য সমালোচকরা কিছু দিন আগেও জানতেন না। বিষ্ণুপদ পান্ডা কর্তৃক সম্পাদিত 'উড়িষ্যার সাধক কবি দ্বারিকাদাসের মনসামঙ্গল '' শীর্ষক গ্রন্থখানি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হওয়ার পর এর প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। এর আগে কবি দ্বারিকা দাসের মনসামঙ্গল সম্পর্কে কারো কোন ধারণা ছিল না বললেই চলে। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর '' বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'' - এর ষষ্ঠ সংস্করণ (১৩৮১ বঙ্গাব্দ / ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দ) - এর ভূমিকায়১৪৯ নবাবিষ্কৃত রামানন্দ যতির চন্ডীমঙ্গল এবং স্বামী সত্যানন্দের কাছ থেকে প্রাপ্ত মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গলের পুঁথির কথা উল্লেখ করলেও দ্বারিকা দাসের পুঁথি সম্পর্কে কোন কিছু বলেননি। উল্লেখ্য, ষষ্ঠ সংস্করণই ছিল আশুতোষ ভট্টাচার্যের জীবদ্দশায় উক্ত গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণ।

দ্বারিকা দাসের মনসামঙ্গলের সম্পাদনার ভূমিকায় সম্পাদক বিষ্ণুপদ পান্ডা লিখেছেন - ''মনসা-মঙ্গল কাব্য-শাখার আদি কবি কানা হরিদত্ত। হরিদত্ত এবং তাঁর উত্তরসূরীদের অনুসৃত পথে যে ভিন্ন ভাষাভাষী সাধক কবি দ্বারিকা দাস যাত্রা করেছিলেন এবং মূল্যবান একখানি কাব্য রচনা করেছিলেন এই নতুন আবিষ্কার নিঃসংশয়ে এই সাহিত্য শাখায় একটি উপাদেয় সংযোজন বলেই পরিগণিত হবে। বিজয় গুপ্তের সূক্ষ্ম রসবোধ, নারায়ণ দেবের - পান্ডিত্য এবং কবিত্বের সমন্বয়, বংশীদাসের রূপক

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মিতা এবং কেতকাদাসের বিস্তৃতি ও মাধুর্য সব কিছুর সার্থক উত্তরাধিকার দ্বারিকাদাসের কাব্যখানি কে অপূর্ব সুষমায় মন্ডিত করে তুলেছে। এই কাব্যটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শুধু যে আপন রসোত্তীর্ণতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবে তাই নয়, বিস্মৃতপ্রায় মধ্যযুগে উৎকল - বঙ্গ ভাবসংহতির যে একটি উজ্জ্বল অধ্যায় এককালে বর্তমান ছিল, তারই প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিশিষ্ট স্থান লাভ করবে।''[১৫০]

আগে গবেষকদের ধারণা ছিল - নারায়ণ দেব ছাড়া অন্য কোন বাঙালী কবির কাব্য বাংলাদেশের বাইরে প্রচার সৌভাগ্য লাভ করেনি। দ্বারিকাদাসের পুঁথি প্রাপ্তির পর এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছে। তাঁর পুঁথি ওড়িয়া অক্ষরে লিখিত এবং উড়িষ্যায় যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় কাব্যের একাধিক অনুলিপি প্রস্তুতের ঘটনায়।[১৫১] কবি দ্বারিকাদাসের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। সুকুমার সেনের ভাষায় - ''ভুবনেশ্বরের পুঁথি সংগ্রহশালাতে দুইখানি মনসামঙ্গলের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ওড়িয়া অক্ষরে লেখা। তবে লিপিকর ছিলেন কাঁথির অধিবাসী বাঙ্গালী। পুঁথি দুইটি সম্প্রতি ডক্টর বিষ্ণুপদ পান্ডা কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৭৯ অব্দ) । মূল রচনাটি মেদিনীপুর- উড়িষ্যার প্রত্যন্তবাসী বাঙ্গালী কবি দোয়ারী দাসের রচনা (সম্পাদক ইহাকে দ্বারিকাদাস করিয়া ঐ নামের ওড়িয়া কবির সহিত অভিন্ন বলিয়া ধরিয়াছেন)।''[১৫২] এ প্রসঙ্গে সম্পাদক বিষ্ণুপদ পান্ডা বলেছেন - '' দ্বারিকা দাসের মনসামঙ্গলটির ভাষা অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী মধ্যবাংলার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, অথচ ঐ সময়ের ঐ নামধারী কোন বাঙালী কবির সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি। শুধু মনসামঙ্গল কেন, কোন প্রকার বাংলা কাব্য রচয়িতা হিসেবে দ্বারিকা দাসের নাম অজ্ঞাত। কাব্যটির ভাষার ক্ষেত্রে মধ্যবাংলার সঙ্গে বেশ কিছু ওড়িয়া শব্দের সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। সূত্র সন্ধানের জন্যে তাই উড়িষ্যার তাৎকালিক কবিদের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, সপ্তদশ শতকে উড়িষ্যায় ঐ নামে একজন শক্তিমান কবি ছিলেন। তাঁর কবি প্রতিভা সর্বস্বীকৃত এবং ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসগুলিতে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট ।..... দ্বারিকা এবং দ্বারকা দু'টি শব্দই ব্যাকরণসম্মত । কিন্তু যেকোন কারণেই হোক বাঙালীরা দ্বারকা, দ্বারকানাথ, দ্বারকাপ্রসাদ প্রভৃতি নাম ব্যবহারে অভ্যস্ত। অন্য পক্ষে দ্বারিকা নামটিই উড়িষ্যায় বহু ব্যবহৃত।''[১৫৩] আবার, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ''দ্বারিকাদাসের মনসামঙ্গল '' গ্রন্থের 'প্রাককথন' - এ তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন এভাবে ঃ ''ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে কবি দ্বারিকাদাস সুপরিচিত। ..... উড়িষ্যা প্রদর্শশালায় ওড়িয়া হরফে লেখা দ্বারিকাদাসের মনসামঙ্গল কাব্য, যাহা বাংলা ভাষায় রচিত, তাহা কি ওড়িয়া কবি দ্বারিকাদাসেরই রচিত ? এ বিষয়ে সম্পাদক যে সমস্ত যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহার মূল্য স্বীকার

Dhaka University Institutional Repository

করিতে হইবে। এই কবি কিছুকাল মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে বসবাস করিয়াছিলেন, মেদিনীপুর তখন উড়িষ্যারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনুমান করি, এই অঞ্চলে আসিবার পূর্বেই দ্বারিকাদাস বাংলা ভাষা ভালোই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এখন যেমন ভাষার প্রাচীর তুলিয়া ভৌগলিক সীমানা নির্দিষ্ট হয়, দুই- তিন শত বৎসর পূর্বে সেরূপ সীমা-সঙ্কীর্ণতা ছিল না, বাংলা ও ওড়িয়ার ক্ষেত্রে তো নহেই। যাহা হউক, ডঃ পান্ডার যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত অনুসারে কবি দ্বারিকাদাসকে ওড়িয়া কবি বলিয়া গ্রহণ করা গেল ।''[১৫৪]

নারায়ণ দাসের পৌত্র এবং রাম দাসের পুত্র দীর্ঘজীবী কবি দ্বারিকাদাস ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে কম পক্ষে ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন।[১৫৫] নন্দীগ্রাম (মেদিনীপুর) অঞ্চলে 'মনসার ভাসান' গান এক সময়ে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল, বর্তমানেও তা অব্যাহত আছে। অনেক কাব্যাদি রচনার পর পরিণত বয়সে পরিশীলিত কবি - প্রতিভার অধিকারী সাধক কবি দ্বারিকাদাস নন্দীগ্রামে অঞ্চল থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং প্রধানত গান করার উদ্দেশ্যে তাঁর ' মনসামঙ্গল ' কাব্যখানি রচনা করেন। রাঢ় শাখার অন্তর্ভুক্ত কবি দ্বারিকাদাস কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বিষ্ণুপাল প্রমুখের উত্তরসুরী বলে তাঁর কাব্যের রচনাকাল খ্রীস্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক হলেও সুকুমার সেন[১৫৬] তাঁকে খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের সন্ধিসময়ের বলে মনে করেন। কবি দ্বারিকাদাসের মনসামঙ্গলে প্রথানুযায়ী ' দেব খন্ড ' সংযুক্ত হয়নি। কেবল মাত্র বেহুলা - লখিন্দর কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ তাঁর কাব্যের ' নর খন্ড '- টিও তুলনামূলক ভাবে বেশ সংক্ষিপ্ত। দেবী বিষহরির আবাহন করে সাধক কবি দ্বারিকাদাস তাঁর কাব্য শুরু করেছেন এভাবে -

''প্রথমে দু করপুটে বিষহরী উর ঘটে
কৃপা কর সাগর দুহিতা।
রাখিয়া সঙ্গীতে মন ডাকে তোমায় অভাজন
বর্ণিবারে তব কিছু কথা ।।''[১৫৭]

দ্বারিকা দাসের মনসামঙ্গলে চোখে পড়ার মত বড় ব্যতিএমটি হচ্ছে - বেহুলা ও লখিন্দরের পূর্বজন্ম বর্ণনা করতে গিয়ে কবি ঊষা - অনিরুদ্ধের বদলে ছায়া - নীলাম্বরের কাহিনী নিয়ে এসেছেন। মূলতঃ চন্ডীমঙ্গলে ব্যবহৃত এই দুটি চরিত্রকে কবি দ্বারিকা দাস নতুন ভাবে উপস্থাপন করেছেন। ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর নৃত্যপটু। দেবসভায় তার নৃত্য সকলকে সন্তুষ্ট করেছে। শিব সীমাহীন আনন্দে নীলাম্বরের

Dhaka University Institutional Repository

গলায় হাড়ের মালা পরিয়ে দিলেন। শিব মহা আনন্দে দিলেন ঠিকই কিন্তু ঐ বিশেষ মালাটি প্রাপকের কাছে রুচিকর মনে হল না। শিব নীলাম্বরের অন্তরের কথা জানতে পেরে ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। তখন -

''ক্রোধভরে নীলাম্বরে বলে ত্রিলোচন।

০ ০ ০

অসাধ্য করায় সাধ্য এই হাড় মালা।

হেন মালা নিন্দা কৈলি অর্থে হৈয়া ভোলা।।

আভরণে সুখভোগ বাসনা তোমার।

পৃথিবীতে জন্ম লভ বণিকের ঘর।।

কহিতে কহিতে শিব হৈল অগ্নিময়।

চারি পাশে অগ্নি যেন উঠিলা প্রলয়।

মহাত্রাসে দেবগণ শিবে তুস্তি করে।

ভস্ম হৈয়া ইন্দ্রসুত গেল দিগন্তরে।।

পুত্রের মরণ দেখি ইন্দ্রের আকুল।

অচেতনে কাঁদে ইন্দ্র পুত্রশোকে ভুল।।

হরসে বিরস হৈল যত দেবগণ।

ইন্দ্রের নগর বেড়ি উঠিল ক্রন্দন।।

পুত্রের মরণ শুনি শচী ধায় এসে।

হরিল চেতনা তার পুত্রের বিনাশে।।

জয়ন্ত বিজয় যায় দুই সহোদর।

ভাইর মরণ দুঃখ ভাবিল বিস্তর।।

ইন্দ্রবধূ ছায়বতী ছিল নিজ ঘরে।

স্বামীর মরণ শুনি আইল বাহিরে।।

পতিব্রতা নারী শোকে প্রাণ নাই ধরে।

হৃদে চিন্তা ডুবিল সে দুঃখের সাগরে।।

প্রলয় ঝড়েতে যেহ্নে রম্ভা তরু পড়ে।

হা হা নাথ বলি মুখে সতী প্রান ছাড়ে

দারুণ শিবের ক্রোধে দুঁহে হৈল নাশ।

Dhaka University Institutional Repository

রচিয়া বিলাপ কহে শ্রী দ্বারিকা দাস।।"১৫৮

প্রাক-আধুনিক যুগে যে মানসিক নৈকট্য বাংলা - বিহার - আসাম - উড়িষ্যার মধ্যে শিল্প - সাহিত্যগত সাযুজ্য এনে দিয়েছিল (বিশেষ করে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে), তারই ভিত্তিতে কল্পিত 'বৃহত্তর বঙ্গ' - এর 'ঐক্য ধর্মী ভাবসমন্বয়ের অগ্রদূত' ওড়িয়া সাহিত্যের দিকপাল কবি, শাস্ত্রজ্ঞ এবং দার্শনিক পন্ডিত দ্বারিকা দাস মনসামঙ্গল কাব্য রচনার মাধ্যমে মনসামঙ্গল কাব্যধারায় স্থায়ী আসন করে নিলেন। নিচে দ্বারিকাদাসের মনসামঙ্গল[১৫৯] কাব্যানুসারে দেব - দেবীদের নাম তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে ঃ

বন্দনা অংশ ঃ

বিষহরী, মনসা, নাগমাতা, হরের নন্দিনী, ঈশান কুমারী, পৃথিবী, অবনী, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারিনী, হর, দয়াধারী, দুর্গতি বিনাশা, জগতমাতা, সাগর দুহিতা, অন্তর্যামী।

নর খন্ড ঃ

রাম, শিব, বিষহরী মাতা, নেতু, হনুমান, পবন, গগন, মনসা , পবন কুমার, বিশ্বেশ্বর, পদ্মের কুমারী, শঙ্কর, শূলধারী, ঈশ্বর, ত্রিলোচন, বিশ্বনাথ, গনাই, গণেশ, পবন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গরুড়, কার্তিক, যক্ষরাজ, রুদ্র, অষ্টবসু, দেবগণ, নেতাই, নেতু ধুবিনী, ধনা ও মনা (নেতুর পুত্রদ্বয়), চন্দ্র, সূর্য, কুবের , বরুণ, ধর্ম, তাল, বেতাল, মনোবাঞ্ছাপুরী, ভুজঙ্গ-বাহিনী, অষ্টনাগ, মনসার ঘট, বাসুকি, গঙ্গা, নীলাম্বর, ছায়াবতী, ইন্দ্র , শচী, স্বর্গগঙ্গা, রুদ্রাক্ষ, জয়ন্ত, বিজয়, বিশ্বকর্মা, বিশাই, বাকদেবী, ষষ্ঠীদেবী, সুরপতি, শূলপাণি, খরতরী, রঘুনাথ, জানকী, লক্ষ্মণ, সীতা, রাম, জনক কুমারী, ঈশান, হর, অন্তর্যামী, পৃথিবী, ধরণী, বসুন্ধরা, ক্ষিতি, অগ্নি , আনল, দেব ত্রিনয়ন, হরগৌরী, গৌরী, ভবানী, দুর্গা, শনি, রাহু, গ্রহদেবতা, তুলসী, নিদ্রাবতী, হরি, ভুবন, ভুজঙ্গমাতা, শশধর, দিবাকর, মদন, গোসাই, ঠাকুরাণী, বটবারা, কিন্নর, কিন্নরী, অপ্সরী, বিদ্যাধরী, যক্ষ, অরুণ, হুতাশন, বিষ বিনোদিনী, শিবসুতা, ঈশ্বরী, যম, ধর্মপুত্র, সুরেশ্বরী, ধর্ম, পতিতপাবনী, গন্ধর্ব, কাল, সারদা, ভোলানাথ, ইন্দ্ররাজ, রবি, মাতা কৃপাময়ী, বিষ্ণুমায়া , আতঙ্কভঞ্জনী, হরের নন্দিনী, ভুজঙ্গবাহিনী, মনসাসুন্দরী।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিজ কালী প্রসন্ন ঃ

গবেষকগণ মনসামঙ্গল কাব্যকে 'মধ্যযুগীয় বাংলার জাতীয় কাব্য ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। মনসামঙ্গল কাব্যধারার রচনা আধুনিক যুগে এসেও প্রথম দিকে তা অব্যাহত ছিল। খ্রীস্টীয় ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা - সভ্যতা - সংস্কৃতি বিস্তারিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে আধুনিক যুগে যখন বাঙালীর মনে নতুন নতুন জিজ্ঞাসার জন্ম দিল, সে সময়েও যে কয়জন দুঃসাহসী কবি মনসামঙ্গল রচনা করেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমে যার নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হচ্ছেন জগমোহন মিত্র। তাঁর কাব্যের রচনাকাল ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দ।[১৬০] এর পরেই যাঁর নাম আসে তিনি হচ্ছেন দ্বিজ কালী প্রসন্ন। যশোহর জেলার অন্তর্গত মল্লিকপুর গ্রামের অধিবাসী দ্বিজ কাল প্রসন্নের মনসামঙ্গল ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।[১৬১]

মূলতঃ নর খন্ড তথা বণিক খন্ডের উপর ভিত্তি করেই কালী প্রসন্নের মনসামঙ্গল রচিত হলেও এর মধ্যেই সংক্ষিপ্ত পরিসরে মনসা, নেতার জন্ম কাহিনী বর্ণনাসহ বিভিন্ন পৌরাণিক , শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গেরও অবতারনা করা হয়েছে। এতে কবির শাস্ত্রপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিজ কালীপ্রসন্ন দেবী মনসাকে প্রচলিত বিভিন্ন নামের পাশাপাশি প্রায় অপ্রচলিত, এমনকি তিনিই প্রথম সম্বোধনকারী হিসেবে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন : যেমন -

"বলে বিষহরি, শুনহ সুন্দরি, আসি আমি ভবহরা।

* * *

আমি অভাগিনী, তোমারে না চিনি, দয়া কর কাত্যায়নী।।"[১৬২]

"বিষহরি শাপ যদি দিল বেহুলারে।
বেহুলা রোদন করে দেবী- পদ ধরে।।
কেন শাপ দিলে মোরে কহ গো কমলা।
উপায় যদ্যপি নাহি করগো বিমলা।

* * *

উপায় যদ্যপি নাহি করগো শঙ্করী।
নিশ্চয় পাতকী হবে বধি এই নারী।।"[১৬৩]

"শ্রীজগাতি কর কৃপা, তুমি দেবী বুদ্ধিরূপা, ঘটে আসি হও অধিষ্ঠান।"[১৬৪]

"মনসা-মঙ্গল গীত এই চারি পালা।

Dhaka University Institutional Repository

সমাপ্ত হইল ডাক সবে শ্রীমঙ্গল।।''[১৬৫]

ইত্যাদি

নিচে দ্বিজ কালী প্রসন্নের মনসা-মঙ্গল[১৬৬] কাব্য থেকে দেব - দেবীদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছেঃ

বন্দনা অংশ ঃ

গৌরী পুত্র (বক্রতুন্ড, একদন্ত, কৃষ্ণ পিঙ্গাক্ষ, গজবক্ত, লম্বোদর, বিকটম, বিঘ্নরাজ, ধুম্রবর্ণ, ভালচন্দ্র, বিনায়ক, গণপতি, গজানন), গৌরী, ব্রহ্মা, বিঘ্নবিনাশকারী, নারায়ণ, দেবী সরস্বতী, আস্তিক মুনি, আস্তিক মুনির মাতা, বাসুকী, বাসুকীর ভগিনী, জরৎকারু মুনি, জরৎকারু মুনি পত্নী, মনসাদেবী।

নর খন্ড ঃ

মনসা, শঙ্কর, হর, গৌরী, শিব, শিবা, দেব ত্রিপুরারি, বিষহরি, পদ্মা, শূলপাণি, পার্বতী, ষষ্ঠীদেবী, শীলষষ্ঠী, একুশ ষষ্ঠী, জলদেব, বিধি, যম, শমন, হরি, তুলসী , মহেশ্বর, ধর্ম, শঙ্করী, হনুমান, পন্চানন, দেবদেব, দুর্গা, কন্দর্প, বৃহস্পতি, বশিষ্ঠ, দেবী অরুন্ধতী, সীতা, দেব সীতাপতি, শ্যাম, উমা, দেব, গঙ্গাধর, গঙ্গা, শচী, বজ্রধর, ধর্মরাজ, তারা, ত্রিনয়নী, নারদ, ইন্দ, ইন্দ্রাণী, হরগৌরী, তিলোত্তম, রম্ভা, রাম, গোঁসাই , দেব ষড়ানন, লম্বোদর, শিব, ভুজঙ্গম মূর্তি (মনসা), নেতুদেবী, নেতা, নেতো ধোবানী, লক্ষ্মী, নারায়ণ, ব্রহ্মা, ত্রিপুরারি, ভগবান, ভগবতী, দেবগণ, দেবেন্দ্র , মহেশ্বর, মহাদেব, শচীপতি, দেবরাজ, বিশ্বকর্মা, বিশাই, বিমলা, কৃষ্ণ, মদন, মদন-নন্দন, অনিরুদ্ধ, ঊষা, রতি, রতিপতি, কাম, শূলধারী, শ্রীমঙ্গলা, জগৎজননী, গঙ্গা, চন্দ্র, সূর্য, কালীদেবী, নিদ্রাদেবী, গরুড়, গোবিন্দ, দেব ত্রিনয়ন, বাসুকী, সর্পের জননী, অনল, অগ্নি, ব্রাহ্মণী, ইন্দ্র, ভুবন।

রাধানাথ রায় চৌধুরী ঃ

খ্রীস্টীয় ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগেও একাধিক মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণের কবির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। কুচবিহার অন্চলে এ সময়কার একজন কবি - বৈদ্যনাথের মনসামঙ্গলের পুঁথি পাওয়া গিয়েছে, যদিও কবির কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি।[১৬৭] রাধানাথ রায় চৌধুরী হচ্ছেন এ সময়কার উল্লেখযোগ্য কবি। তাঁকেই মনসামঙ্গল কাব্যধারার সর্বশেষ কবি বলে মনে করা হয়।[১৬৮]

শ্রীহট্টের ষনামধন্য ব্রাহ্মণ-রাজা সুবিদ নারায়ণের পবিত্র বংশে, দক্ষিণ শ্রীহট্টের অন্তর্গত ব্রহ্মচাল পরগণার নন্দনগর গ্রামে জন্মগ্রহণকারী কবি রাধানাথ রায় চৌধুরী প্রায় পন্চাশ বছর বয়সে ১২৮৯

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে) মৃত্যু বরণ করেন।[১৬৯] তিনি তাঁর জীবনের অন্তিম-লগ্নে মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ কাব্যখানি রচনা করেন।

ষষ্ঠীবর দত্তের মত রাধানাথ রায় চৌধুরীর কাব্যও তিন খন্ডে বিভক্ত - দেব খন্ড, বণিক্য (বণিক) খন্ড এবং স্বর্গারোহণ খন্ড । এছাড়া বন্দনা অংশ তো আছেই । রাধানাথের কাব্য নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর । যেমন - সৃষ্টি পত্তন প্রসঙ্গে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্যে বিফল মনোরথ হয়ে মহেশ্বরের পরামর্শ প্রার্থনা করলেন। তখন মহেশ্বর ব্রহ্মাকে দশভুজা দুর্গার পূজা করতে বললেন এজন্যে যে, এতে সৃষ্টি-কার্য সমাধা হবে।

"ব্রহ্মার বচন শুনি দেব - মহেশ্বর।
ব্রহ্মা - প্রতি কহিবারে লাগিলা সত্বর।।
মায়াময় এ সংসার জানে সর্বজনে।
অতএব গতি নাই মহামায়া বিনে।।
মহাপূজা আশ্বিনেতে শরৎ - সময়।
যেইজন করে তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।।
মৃত্তিকাতে দশভুজা করিয়া গঠন।
পদ্ধতি প্রমাণে পূজা কর আরম্ভণ।।"[১৭০]

ভণিতায় 'দ্বিজ' 'দীন' এবং 'বিপ্র' বলে পরিচয়দানকারী রাধানাথের কাব্যে একটা বড় ব্যতিক্রম হচ্ছে - মনসা বা পদ্মাবতীর স্বামী হিসেবে জরৎকারু মুনির পরিবর্তে (অবশ্য ' বণিক্য খন্ডে' এবং 'স্বর্গারোহণে' পদ্মাবতীর বন্দনায় তাঁকে একবার করে 'জরৎকারু মুনি পত্নী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) মণিরাজ মুনিকে উপস্থাপন করা ঃ

"নারদেরে ডাক দিয়া আনিল সাক্ষাৎ।।
শিব বলে, কহ মুনি, শুনি অবান্তর।
কোন স্থানে আছে পদ্মাবতী যোগ্য বর।।
মুনি বলে, আছে দেব মুনির সমাজ।
অহিরাজ যোগ্য পুত্র নাম মণিরাজ।।
পরম তপস্বী বংশ ধর্মেতে তৎপর।

Dhaka University Institutional Repository

তাহার সদৃশ নাহি দেখি যোগ্য বর।।
শিব বলে, মুনি তুমি শুন মন দিয়া।
সম্বন্ধ সুস্থির কর আপনি যাইয়া।।
আমার সংবাদ বল অহিরাজ স্থানে।
সম্বন্ধ সুস্থির কর পরম যতনে।।"১৭১

এরপর -

"হেথা মণিরাজ বর করিল সাজন।
বরযাত্র লৈয়া চলে কৈলাস-ভুবন।।"১৭২
"মনসারে আনিলেন সভা - বিদ্যমানে।
পূর্ব্বমুখে শুদ্ধাসনে বসাইয়া বর।
কন্যাসহ পশ্চিমাস্যে বসিলেন হর।।
পুরাহিত প্রজাপতি বিধি হস্তে নিলা।
পদ্ধতির মতে মন্ত্র কহিতে লাগিলা।।
সাধু সাধু বলি শিব পূজিলেন বরে।
নানা উপচার দিলা বিধি অনুসারে।।
কুশ পত্রে করিলেন সুগ্রন্থি বন্ধন।
বিষ্ণুপ্রীতে করিলেন কন্যা সমর্পণ।।"১৭৩

নিচে রাধানাথ রায় চৌধুরীর 'মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ '১৭৪ কাব্য থেকে দেব দেবীদের নাম তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে ঃ

বন্দনা অংশ ঃ

হরি, জনার্দন, দশাবতার, মীন অবতার, কূর্ম অবতার, পৃথিবী, বরাহ অবতার, নৃসিংহ অবতার, বামন অবতার, ভৃগুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ, নারায়ণ, জগদ্বন্ধু, দয়াময়, কল্কি, সরস্বতী, অনাদ্যা প্রকৃতি, অভয়া, বাগীশ্বরী, মহাদেব, গিরীশ, গিরীশতনয়া, গিরীশতনয়াকান্ত, দেব ত্রিলোচন, দিবাকর, জ্যোতির্ময়, দিনপতি, হুতাশন, কৃশানুপাবক, কেশব, কৈবল্যদাতা, পালক মুরারী, কৌশিকী, করুণাময়ী মাতা, নিত্যা, সুখ - মোক্ষদাতা, পদ্মবতী, আস্তীক, আস্তীক-জননী, নাগেশ্বরী, জগতের মাতা, ত্রিলোচন সুতা, দেবী

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিবিধায়িনী, মাতা সত্যসনাতনী, দেবতা-গন্ধর্ব, চতুর্ভুজা, ত্রিনয়নী, গৌরবরণী, পদ্মাসনা, পতিতপাবনী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ভুজঙ্গিনী, ত্রৈলোক্যজননী, গৌরী, পদ্মমণি, গণেশ, গণপতি, আদিদেব, সর্বাভীষ্ট সিদ্ধিদাতা, পার্বতী, পার্বতীনন্দন, লম্বোদর, গজানন, সর্বদেব রাজা, পুরুষ, প্রকৃতি, নাগমাতা, বিশালাক্ষ্মী, পুরাতনী, ঈশ্বর-নন্দিনী, ভয়-বিনাশিনী, জগত-মহিমা প্রকাশিনী, ভুজঙ্গ-আভরণী, অভয়দায়িনী, করুণাকারিণী, বিষধরভয় নিস্তারিণী, ত্রিনেত্রধারিণী, নাগরাণী।

দেব খন্ড ঃ

হরি, অনাদি, অনাদির আদি, সর্বাদা, প্রজাপতি, মহালক্ষ্মী, বিষ্ণু, বিধাতা, ব্রহ্মা, মহামায়া, নারায়ণ, লক্ষ্মী, লক্ষ্মীপ্রতি, চক্রপাণি, ঈশ্বর, কেশব, শিব, কৃতান্ত ভৈরব, মহাদেব, কৈলাস বিহারী, গদাধর, দেব মহেশ্বর, মীনরূপ, শ্রীহরি, কূর্মরূপ, বরাহরূপ, বনমালী, ভগবান, হর, জগত, আকাশ, বসুমতী, বিধি (ব্রহ্মা), চন্দ্র, সূর্য, বরুণ, পবন, দেব হুতাশন, রুদ্রগণ, বিভুতিভূষণ, বিধাতা, কাল, ধাতা (ব্রহ্মা), হরিহর, দশভুজা, জগদম্বা, চন্ডী, অনল, ধর্ম, দেবী বিশ্বমাতা, ব্রহ্মা, শ্রীদুর্গা, গিরিজা, কাত্যায়ণী, গিরিসুতা, গণেশ - জননী, গণেশ, গঙ্গা, চিত্ত-চৈতন্য - রূপিণী, চামুন্ডাখ্যায়িণী, ইচ্ছাময়ী, মহেশ্বরী, কৃপাময়ী, বিজয়া, নারদ, বশিষ্ঠ, দক্ষ প্রজাপতি, অদিতি, কশ্যপ, ইন্দ্র, গরুড়, খগেশ্বর, দেবগণ, বাসুকী, শচী, শচীপতি, দেবরাজ, ধরণী, বিধি, বনমালী, বিশ্বম্ভর, নারায়ণ, বৈকুন্ঠ-বিহারী, যম, গন্ধর্ব, গগন, পুরন্দর বরুণ, তেত্রিশ কোটি দেবতা, অগ্নি, পবন, সুরপতি, রমা, উমা, ভবানী, ভৈরবী, ভীমা, ভবজায়া, অনুপমা, জগদ্ধাত্রী, দেবী শক্তি-বিধায়িনী, ভগবতী, দুর্গতিনাশিনী, জগৎ-জননী, শিব, ষষ্ঠীদেবী, শিবা, দামোদর, ভোলানাথ, মহেশ্বর, মহেশ্বরী, শঙ্করী, মদন, বিধাতা, কামদেব, গৌরী, বেতাল, নন্দী, ভৃঙ্গী, ভৈরব-ভৈরবীগণ, যমদূত, শঙ্কর, পিনাকী, মদনমোহন, হৈমবতী, ভগবান, ঈশ্বর, অপ্সরীগণ, বিষ্ণুদূত, যক্ষগণ, ত্রিপুরারি, শৈলপতি, শিব -শক্তি, পৃথিবী, শূলপাণি, জয়ন্তী-বিজয়া (গৌরীর সহচরীদ্বয়), শমন, বিশ্বনাথ, কার্তিক, ষড়ানন, কার্তিকেয়, কুবের, পদ্ম-শঙ্খমুনি, গঙ্গা ভাগীরথী, শশী, চন্ডিকা, পন্চানন, হরগৌরী, ভুবন, জাহ্নবী, নিদ্রাদেবী, রবি, চন্ডী, দেব পশুপতি, দেবী নাগমাতা, নেতা, অবনী, নাগেশ্বরী, পদ্মযোনি, সর্বদেব, বিদ্যাধরী, দেবী হরের নন্দিনী, মনসা, শিবের সুতা, বিশ্বমাতা, পদ্মাবতী, পদ্মা, অযোনিসম্ভবা, ত্রিনয়নী, চতুর্ভুজা, গৌরাঙ্গী, মুক্তিদাত্রী, অন্তর্যামী, বিষহরী, ব্রহ্মণী, মহেশ, গোঁসাই, সুরধুনি, জগত-গোঁসাই, হৈমবতী, গণাই, মণিরাজ মুনি, যক্ষপতি, যক্ষগণ, দেব-দেবীগণ, মন্দাকিনী, আস্তীক, অষ্টনাগ, অনন্তনাগ, দেব দিগম্বর, উর্বসী, রম্ভা, অপ্সরীগণ, সুরপতি, দেব অনাদি, নিরঞ্জন, সনাতন, জনার্দন, গোলকবিহারী, রাধিকা, রাধিকাকান্ত, আদি, অনন্ত, কৃতান্ত অন্তকারী, বিশ্বপতি, কৃষ্ণ,

Dhaka University Institutional Repository

মুরলীধর, বনমালীধারী, মুকুন্দমুরারী, গঙ্গাধর, মৃত্যুঞ্জয়, দিনমণি, নগেন্দ্রনন্দিনী, বিষেশ্বরী, রাহু, কেতু, গ্রহ অবতার, দেবী ঠাকুরাণী, মনসাদেবী, নেতা, শনি, নাগরাজ, অনিরুদ্ধ, উষা, ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, উর্বশী, রমা, রোহিনী, অরুন্ধতী, বিদ্যাধর, অপ্সরী, হনুমান, জগত-ঈশ্বর, পদ্মমণি (মনসা)।

বণিক্য খন্ড ঃ

লক্ষ্মী, পদ্মা, ব্রহ্মাদের , ব্রহ্মা, শ্রীদুর্গা, প্রভু প্রজাপতি, বিশ্বকর্মা, শিব, মনসা, নেতা, চন্ডিকা, মা দুর্গতি হরা, মা কাত্যায়নী, কৃপাময়ী, হিমাদ্রিনন্দিনী, বীর হনুমান, বীর চুড়ামণি, ভগবতী, পবন, পবন-নন্দন, বিধি, মা দুর্গতি - নাশিনী, শিবদুর্গা, শিব-লিঙ্গ, বিষহরী, পদ্মাবতী, ত্রিদশদেবতা, বিষ্ণু, রাম, শঙ্কর, ভবানী, ষষ্ঠীদেবী, হরগৌরী, হর, গৌরী, নাগমাতা, ব্রাহ্মণী, শ্রীহরি, ভগবান, দেব পন্নগানন, পদ্মমণি, মহেশ্বর, মহেশ্বরী, নারায়ণী, দশভুজা, ধর্ম, ঈশ্বর, মা শঙ্করমোহিনী, চন্ডী, শঙ্করী, সীতা, গঙ্গাদেবী, সুরেশ্বরী, জাহ্নবী, ভাগীরথী, পার্বতী, মহাদেব, গঙ্গা, সরস্বতী, মন্দাকিনী, ক্ষেত্রপাল, ভগবতী, শক্তি, অন্তর্যামী, দেব ত্রিপুরারি, দেবী হৈমবতী, অনাদ্যা প্রকৃতি শক্তি , অগ্নি, হুতাশন, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, শমন, যমরাজ, যমদূত, চিত্রগুপ্ত, চন্দ্র, সূর্য, অষ্টনাগ, নারায়ণ, অলক্ষ্মী, মণিরাজ মুনি, ঈশ্বর-তনয়া, উষা, অনিরুদ্ধ, কামপুত্র, কাম, রতি, মদন, কন্দর্প, শচীপতি, শচী, পুরন্দর, বাসব, দেবরাজ, দেবগণ, অপ্সরীগণ, দেবত্রিলোচন, মৃত্যুঞ্জয়, নন্দী, রুদ্র-ভূতগণ, দেব পন্নানন, বিশ্বনাথ, শূলপাণি, চৌষট্টি যোগিনী, ভৈরব-ভৈরবী, শক্তিগণ, দেব ত্রিপুরারি, পৃথিবী, বিধাতা, বিধি, গন্ধর্ব-কিন্নর, অপ্সরা-অপ্সরী, কৃষ্ণ, অনাদি, ধরণী, নিদ্রাদেবী, ভোলানাথ মহামায়া , কুবের , দেব পশুপতি, শঙ্কর-সুহিতা, শিবসুতা, সুখ-দুঃখ-মোক্ষদাতা, দেব হরিহর, অনন্ত নাগ, নারদ মুনি, কার্তিক, গণেশ, ধরণী, আকাশ, দিনমণি, শশী, দেবী ঠাকুরাণী (মনসা), বিভূতিভূষণ, যক্ষ, ভুজঙ্গিনী, ধনা (নেতার পুত্র), রুদ্রাক্ষ, সর্বদেব, ত্রৈলোক্যদেবতা (শিব), জরৎকারু মুনি, জরৎকারু মুনি পত্নী, অষ্ট বসু, জগত, অষ্ট লোকপাল, সদাশিব, জ্যোতির্ময়, নাগের জননী।

স্বর্গারোহণ ঃ

পদ্মা, উষা, অনিরুদ্ধ, দেবরাজ, ইন্দ্র, মাতলি, মন্দাকিনী, পদ্মাবতী, মনসা, বিধি, বিধাতা, ধরণী, কাল, শচী, পুরন্দর, কামদেব, রতি, শিব, পার্বতী, ব্রহ্মা, সাবিত্রী, লক্ষ্মী, নারায়ণ, বণের কুমারী, কামের নন্দন, শ্রীহরি, রম্ভা, উর্বশী, চিত্রাঙ্গী, দারুচী, শশিমুখী, চন্দ্রলেখা, বিদ্যাধরীগণ, বিদ্যাধরগণ, দেবগণ,

Dhaka University Institutional Repository

অগ্নি, শঙ্কর, জরৎকারু মুনি, জরৎকারুমুনি পত্নী, শঙ্কর নন্দিনী, অনন্ত নাগ, অনন্ত নাগের আই, হরি, দেবী পদ্মমণি।

এতক্ষণ মনসামঙ্গল কাব্যধারার আদি কবি কানা হরিদত্ত থেকে শুরু করে সর্বশেষ কবি রাধানাথ রায় চৌধুরী পর্যন্ত কবিদের এবং তাঁদের কাব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হল। অবশ্য বিভিন্ন কারণে এ পর্যায়ের অনেক কবি সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। এঁদের মধ্যে ষষ্ঠীবর সেন[১৭৫] [পূর্ববঙ্গ (ঢাকা), খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতক (প্রথমার্ধ)] , গঙ্গাদাস সেন[১৭৬] [পূর্ববঙ্গ (ঢাকা), খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতক)], কালিদাস[১৭৭] [পশ্চিমবঙ্গ, খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতক (শেষার্ধ)], দ্বিজ রসিক[১৭৯] [পশ্চিমবঙ্গ (বর্ধমান), খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতক (শেষার্ধ)] , বৈদ্য জগন্নাথ[১৮০] [পূর্ববঙ্গ (ময়মনসিংহ), খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতক (শেষার্ধ)] , সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহ[১৮১] [উত্তরবঙ্গ, খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতক (শেষার্ধ)-ঊনবিংশ শতক (প্রথমার্ধ)], গোপাল চন্দ্র মজুমদার[১৮২] [পূর্ববঙ্গ (ময়মনসিংহ), খ্রীস্টীয় ঊনবিংশ শতক (প্রথমার্ধ)] প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এটা ঠিক, মনসামঙ্গলের বহু গায়েন এ সমস্ত রচনার '' একমাত্র প্রচারক''[১৮৩] হওয়ার সুবাদে '' গায়েনদিগের খামখেয়ালী''[১৮৪] -র বৃহ ভেদ করে প্রকৃত কবিদেরকে বের করে আনা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ কাজ-সেটা বলাই বাহুল্য ।

মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ কাব্যের বিভিন্ন কবিদের কাব্যান্তর্গতদেব - দেবীদের তালিকা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় - প্রধান, অপ্রধান দেবদেবীদের সংখ্যা কয়েক ' শ হবে । এঁদের সকলের ভূমিকা কাব্যের মধ্যে এক রকম নয়। কেউবা সক্রিয়, কেউবা নিষ্ক্রিয়, আবার কেউবা এ দুয়ের মাঝামাঝি। কোন কোন দেব-দেবীর নাম - বন্দনা, উপমা, তুলনা প্রভৃতি কারণে এসেছে। তালিকায় দেব-দেবীদের একাধিক নাম রয়েছে। যেমন, মনসার অন্যান্য নামসমূহ-পদ্মাবতী, পদ্মা, বিষহরী, জগৎগৌরী, কেতকা, তোতলা, জগতী, কমলা, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি ; শিবের অন্যান্য নামগুলো - মহাদেব, মহেশ্বর, শঙ্কর, হর, ত্রিলোচন, শূলপাণি প্রভৃতি । এইরূপ চন্ডী, গঙ্গা, ইন্দ্র, যম, গণেশ, কার্তিক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু মদন প্রভৃতি দেবতাদেরও বিভিন্ন নাম রয়েছে।

মনসামঙ্গলের কেন্দ্রীয় দেবতা হচ্ছেন মনসা। শিব ও চন্ডী - এ দু'জন এ কাব্যের গুরুত্বপূর্ণ দেবতা। গঙ্গা, ইন্দ্র, যম, বিশ্বকর্মা, নারদ, নেতা প্রমুখও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ধর্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মদন, রতি, জরৎকারু, আস্তিক, কার্তিক, গণেশ, ঊষা, অনিরুদ্ধ প্রমুখের নাম করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ঃ

০১। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়), পৃঃ ২০৩

০২। সুকবি নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ, ভূমিকা পৃঃ ।। ০

০৩। বাংলা সাহিত্যের কথা (দ্বিতীয় খন্ড -মধ্যযুগ), পৃঃ ৩৭৩-৭৪

০৪। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলকাতা, পৃঃ ৩২১

০৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়), পৃঃ ২০৩

০৬। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (প্রথম খন্ডঃ আদি ও মধ্য যুগ) ১৯৬৭, পৃঃ ৭১

০৭। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩২৯

০৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩০-৩১

০৯। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (খ্রীস্টীয় দশম-বিংশ শতাব্দী), ১৯৯৫, পৃঃ ৫৯

১০। বাংলা কাব্য প্রবাহ, ১৯৬৪, পৃঃ ১১০

১১। বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, ভূমিকা পৃঃ ২।০

১২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড ঃ ? - ষোড়শ শতাব্দী), পৃঃ ১৭৮

১৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩৩২

১৪। প্রাচীন কাব্য ঃ সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, পৃঃ ১০৪

১৫। সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, সম্পূর্ণ গ্রন্থ থেকে

১৬। প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃঃ ১

১৭। প্রাণকুমার ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), সুকবি নারায়ণ দেব ও পন্ডিত জানকীনাথ রচিত পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, ঢাকা , পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৮২, ভূমিকা পৃঃ ।/০

১৮। বাংলা সাহিত্যের কথা (দ্বিতীয় খন্ড), পৃঃ ৩৮৬

১৯। সুকবি নারায়ণদেব ও পন্ডিত জানকীনাথ, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, ভূমিকা পৃঃ ।/০

২০। প্রাগুক্ত, সম্পূর্ণ গ্রন্থ থেকে

২১। সুখময় মুখোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩, পৃঃ ১

২২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম খন্ড), পৃঃ ১৯৫-৯৬

Dhaka University Institutional Repository

২৩। আবদুল করিম, বাংলা সাহিত্যের কালক্রম (মধ্যযুগ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৪, পৃঃ ১৬

২৪। বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, ভূমিকা পৃঃ ২০

২৫। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (খ্রীঃ দশম-বিংশ শতাব্দী), পৃঃ ৫৬

২৬। জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত (সম্পাদিত), কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২, পৃঃ ৮

২৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮

২৮। বসন্তকুমার ভট্টাচার্য (সঙ্কলিত) , কবিবর বিজয়গুপ্ত প্রণীত পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, পৃঃ ৪

২৯। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩৩৩

৩০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৩

৩১। বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, ভূমিকা পৃঃ ২০

৩২। কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ (জয়ন্তকুমার সম্পাদিত), পৃঃ ৭৪ ৭৫

৩৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়), পৃঃ ২১১

৩৪। কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ (জয়ন্তকুমার সম্পাদিত), ভূমিকা পৃঃ ৪০

৩৫। প্রাগুক্ত, সম্পূর্ণ গ্রন্থ থেকে

৩৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস(প্রথম খন্ড), পৃঃ ১৬১

৩৭। প্রাগুক্ত, পাদটীকা পৃঃ ১৯৯

৩৮। বিপ্রদাসের মনসাবিজয়, পৃঃ ৩

৩৯। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩৪৩

৪০। বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, ভূমিকা পৃঃ ২।।৯০

৪১। বিপ্রদাসের মনসাবিজয়, পৃঃ ৫

৪২। প্রাগুক্ত , পৃঃ ৩

৪৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩৪৪

৪৪। বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (প্রথম খন্ড), পৃঃ ৪২৩

৪৫। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, পৃঃ ৮

৪৬। বিপ্রদাসের মনসাবিজয়, পৃঃ ৭৯

৪৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড), পৃঃ ১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

৪৮। বাংলা কাব্য প্রবাহ, পৃঃ ১২৮

৪৯। বিপ্রদাসের মনসাবিজয়, সম্পূর্ণ গ্রন্থ থেকে

৫০। ডঃ মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া (সম্পাদিত), শ্রীরায় বিনোদ প্রণীত পদ্মাপুরাণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩, ভূমিকা পৃঃ এক

৫১। প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃঃ এক

৫২। শ্রীরায় বিনোদ ঃ কবি ও কাব্য , ' আশীর্বাণী' পৃঃ সাত

৫৩। প্রাগুক্ত, ' মুখবন্ধ ' পৃঃ আট

৫৪। প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃঃ নয়

৫৫। শ্রীরায় বিনোদ প্রণীত পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ৬

৫৬। শ্রীরায় বিনোদঃ কবি ও কাব্য, ভূমিকা পৃঃ নয়

৫৭। প্রাগুক্ত,, পৃঃ ৩২

৫৮। শ্রীরায় বিনোদ প্রণীত পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ২২৮

৫৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩-৩৫৫

৬০। বাংলা সাহিত্যের কিশের ধারা, পৃঃ ৭২

৬১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩৫২

৬২। বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, ভূমিকা পৃঃ ২

৬৩। বাংলা সাহিত্যের কথা (দ্বিতীয় খন্ড- মধ্যযুগ), পৃঃ ৩৭৯

৬৪। বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, ভূমিকা পৃঃ ২

৬৫। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, পৃঃ ৭২

৬৬। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (খ্রীঃ দশম - বিংশ শতাব্দী), পৃঃ ১২০

৬৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড), পৃঃ ২৪১

৬৮। বাংলা সাহিত্যের কথা (দ্বিতীয় খন্ড - মধ্যযুগ), পৃঃ ৩৭৮-৭৯

৬৯। বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, পৃঃ ৭৩

৭০। অনাথবন্ধু কাব্য ব্যাকরণতীর্থ (সংগৃহীত ও পরিশোধিত), দ্বিজ বংশী কৃত শ্রীশ্রীপদ্মাপুরাণ, বেণী মাধব শীল'স লাইব্রেরী , কলকাতা রাজসংস্করণ, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত, পৃঃ ৯-২৬৫

৭১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ডঃ সপ্তদশ - অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃঃ ২২৮

৭২ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, পৃঃ ২১১

Dhaka University Institutional Repository

৭৩। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ-রচিত মনসামঙ্গল (প্রথম খন্ড), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৩, পৃঃ ৮

৭৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯

৭৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩

৭৬। প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃঃ ১৫

৭৭। প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃঃ ১৪

৭৮। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (সংকলিত ও সম্পাদিত), মনসামঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, নয়া দিল্লী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৭৭, ভূমিকা পৃঃ ৬

৭৯। কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল (প্রথম খন্ড), পৃঃ ২৩৩

৮০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬২-৬৩

৮১। প্রাচীন কাব্য ঃ সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, পৃঃ ১০৯

৮২। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল (প্রথম খন্ড), পৃঃ ১-৩৫২

৮৩। বসন্তরঞ্জন রায় (সম্পাদিত), কবি ক্ষেমানন্দ দাস প্রণীত মনসামঙ্গল ,নটবর চক্রবর্তী প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩১৬, ভূমিকা পৃঃ ১২

৮৪। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল (প্রথম খন্ড), ভূমিকা পৃঃ ১৮-১৯

৮৫। বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩৬৩

৮৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ডঃ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃঃ ২২৮

৮৭। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (খ্রীস্টীয় দশম-বিংশ শতাব্দী), পৃঃ ১২৩

৮৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের হতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড ঃ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃঃ ২২৮

৮৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩০

৯০। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩৬৩

৯১। কবি ক্ষেমানন্দ দাস প্রণীত মনসামঙ্গল, পৃঃ ৭৭

৯২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১-৭৯

৯৩। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল (প্রথম খন্ড), ভূমিকা পৃঃ ৭-৮

৯৪। প্রাগুক্ত, পরিশিষ্ট (ক) পৃঃ ৩৮০

৯৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ডঃ সপ্তদশ - অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃঃ ২৩৭

৯৬। প্রাগুক্ত , পৃঃ ২৩৯

Dhaka University Institutional Repository

৯৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪০

৯৮। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল (প্রথম খন্ড), পরিশিষ্ট (ক) পৃঃ ৩৮৭

৯৯। প্রাগুক্ত, পরিশিষ্ট (ক) পৃঃ ৩৫৫-৯৬

১০০। ডঃ আশুতোষ দাস (সম্পাদিত), তন্ত্রবিভূতি-বিরচিত মনসাপুরাণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০, ভূমিকা পৃঃ ২১

১০১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১

১০২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৩-৭৪

১০৩। প্রাগুক্ত, সুকুমার সেন বর্ণিত দু'চার কথা, পৃঃ ৮

১০৪। প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃঃ ১৭

১০৫। প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃঃ ১৬

১০৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২০-২১

১০৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১-৫৫৯

১০৮। বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, ভূমিকা পৃঃ ৩

১০৯। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩৬৯

১১০। কবি জগজ্জীবন - বিরচিত মনসামঙ্গল , ভূমিকা পৃঃ

১১১। প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃঃ

১১২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭-৮

১১৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩-৩৫৯

১১৪। বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গল, ভূমিকা পৃঃ (।)

১১৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ডঃ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃঃ ২৩০

১১৬। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৪১১

১১৭। বাংলা সাহিত্যের কথা (দ্বিতীয় খন্ড - মধ্যযুগ), পৃঃ ৩৮৫

১১৮। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৪১১

১১৯। বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গল, পৃঃ ১৯

১২০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬

১২১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩-৬৪

১২২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১-১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

১২৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩৮৮

১২৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৭

১২৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯০

১২৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৫

১২৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৬

১২৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৭-৯৮

১২৯। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ডঃ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃঃ ২৪৫

১৩০। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (খ্রীস্টীয় দশম - বিংশ শতাব্দী), পৃঃ ১২৪

১৩১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৪০৫

১৩২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮৯

১৩৩। বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, পৃঃ ২১৪-৩৯

১৩৪। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৪০৭

১৩৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৭

১৩৬। বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, পৃঃ ২৫২

১৩৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড ঃ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃঃ ২৫২

১৩৮। বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা , পৃঃ ৮৬-৮৮, ১২৮-৩৩, ২৪৬-৫২

১৩৯। তন্ত্রবিভূতি বিরচিত মনসাপুরাণ, ভূমিকা পৃঃ ১১৯-৬১

১৪০। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস , পৃঃ ৭৪৫

১৪১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪৫

১৪২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড ঃ সপ্তদশ - অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃঃ ২৪০

১৪৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪০

১৪৪। গ্রাগুক্ত , পৃঃ ২৪০

১৪৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪০

১৪৬। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৪১৪

১৪৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১৪

১৪৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১৫-১৬

১৪৯। বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, ষষ্ঠ সংস্করণের নিবেদন (আশুতোষ ভট্টাচার্য কৃত)

Dhaka University Institutional Repository

১৫০। উড়িষ্যার সাধক কবি দ্বারিকাদাসের মনসামঙ্গল, ভূমিকা পৃঃ ৯৪

১৫১। প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃঃ ৯৩

১৫২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ডঃ সপ্তদশ-অষ্টদশ শতাব্দী), পৃঃ ২৪৬

১৫৩। দ্বারিকাদাসের মনসামঙ্গল, ভূমিকা পৃঃ ৪-৫

১৫৪। প্রাগুক্ত, প্রাককথন পৃঃ২

১৫৫। প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃঃ ৬-৭

১৫৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ডঃ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দ), পৃঃ ২৪৭

১৫৭। দ্বারিকাদাসের মনসামঙ্গল, পৃঃ ৩

১৫৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০-২১

১৫৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩-১৬৯

১৬০। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (খ্রীস্টীয় দশম - বিংশ শতাব্দী), পৃঃ ২১৯

১৬১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৪১৬

১৬২। নন্দ লাল শীল (সম্পাদিত), যশোহর মল্লিকপুর নিবাসী বন্দ্যঘটীয় শ্রীকালী প্রসন্ন বিদ্যারত্ন প্রণীত মনসা-মঙ্গল , বেণী মাধব শীল'স লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৯৮ , পৃঃ ৩১

১৬৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২

১৬৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮

১৬৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২

১৬৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬-১০২

১৬৭। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৪১৬

১৬৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১৬

১৬৯। সুনির্মল বসু (সম্পাদিত), রাধানাথ রায় চৌধুরী -বিরচিত পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, নূতন সংস্করণে, ১৯৭৫, দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন, পৃঃ ৩

১৭০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮

১৭১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৪

১৭২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫

১৭৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬

Dhaka University Institutional Repository

১৭৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩-২৯৮

১৭৫। বাংলা সাহিত্যের কথা (দ্বিতীয় খন্ডঃ মধ্যযুগ), পৃঃ ৬০-৮১

১৭৬। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩৪৭-৪৮

১৭৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৩

১৭৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৫

১৭৯। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (খ্রীস্টীয় দশম বিংশ শতাব্দী), পৃঃ ২১৮

১৮০। বাংলা সাহিত্যের কথা (দ্বিতীয় খন্ডঃ মধ্যযুগ), পৃঃ ৩৮৫

১৮১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ডঃ সপ্তদশ- অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃঃ ২৬৪

১৮২। বাংলা সাহিত্যের কথা (দ্বিতীয় খন্ডঃ মধ্যযুগ), পৃঃ ৩৮৬

১৮৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস , পৃঃ ৪১৭

১৮৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মনসামঙ্গল কাব্যে পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর গুরুত্ব ঃ

মনসামঙ্গল কাব্যধারায় প্রধান দেব-দেবী হচ্ছেন - মনসা, শিব ও চন্ডী ; অপ্রধান দেব-দেবীদের মধ্যে রয়েছেন - গঙ্গা, নারদ, ইন্দ্র , ধর্ম, নেতা, যম, বিশ্বকর্মা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, জরৎকারু, আস্তিক, ঊষা-অনিরুদ্ধ, মদন-রতি, কার্তিক, গণেশ প্রমুখ। মনসামঙ্গল দেবী মনসাকে নিয়ে আবর্তিত বলে মনসাই এর কেন্দ্রীয় বা প্রধান চরিত্র। তবে কাহিনীর প্রয়োজনে এবং মনসার মাহাত্ম্য বিস্তারে শিব ও চন্ডী অন্যতম প্রধান চরিত্র হিসেবে কাব্যে অন্তর্ভুক্ত ।

মনসামঙ্গল কাব্য বাংলা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে প্রাচীনতম এবং অধিকতর স্থানে প্রচারিত। মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণের মনসা বা পদ্মা সর্পদেবতা। সর্পদেবতার উল্লেখ বেদ, পুরাণ এবং বৌদ্ধ গ্রন্থে থাকলেও মনসামঙ্গল কাব্যের দেবী মনসা পূর্ণ কিাশিতা। ''বাঙ্গালীর ঘরের দেবতা''[১] মনসা সম্পর্কে সুকুমার সেন[২] মনে করেন যে, ঋগ্বেদের সময়েও তাঁর অস্তিত্ব ছিল।

মঙ্গলকাব্যের বিশেষজ্ঞ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে- '' মূলতঃ এক হইয়াও জাঙ্গুলী ও সরস্বতী একজন বৌদ্ধ তান্ত্রিক সমাজ ও অপরজন বৈদিক সমাজ অবলম্বন করিয়া ক্রমে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল। উল্লিখিত জাঙ্গুলী দেবীই যে অথর্ব বেদোক্ত সর্পবিনাশিনী কিরাত কন্যা, বৈদিক সরস্বতীর প্রাথমিক পরিকল্পনার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া তিনি পরে পূর্বভারতীয় মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে অবলম্বন করিয়া জাগুলী নামে পূজিতা হইতেন এবং আরও পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে মনসাদেবী নামে পরিচিতা হইয়াছেন।''[৩] সুকুমার সেনের[৪] মতে মনসার সঙ্গে পরবর্তীকালে জাগুলী মিলিত হওয়ার ফলে মনসা ' জাঙ্গুলী' নামও পরিচিত। মনসামঙ্গলের কবি বিপ্রদাস এই (জাঙ্গুলী) নামের লোকব্যুৎপত্তি দিয়েছেন '' *জাগিয়া জাগুলী নামে সিজবৃক্ষে স্থিতি।*''[৫] 'সিজবৃক্ষ' সম্পর্কে বলা যায়- সংস্কৃতে যে বৃক্ষকে স্নুহী বলা হয়, বাংলার সব জায়গায় তা সিজ বা মনসাগাছ নামে পরিচিত। সাধারণের বিশ্বাস- মনসাগাছে মনসাদেবী বাস করেন, তাদের কাছে মনসার মূর্তির মত মনসাগাছের মূল্যও অনেক।

Dhaka University Institutional Repository

সিজবৃক্ষ বা সিজগাছ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন- ''উত্তর প্রদেশে মেহুণ্ড, মুহর ও সিজ ; বোম্বাইয়ে নিবডুঙ্গ বা থোর ; গুজরাটে থোরডাং ডলিয়ো কটালী, হাতলোতলধারী, নানো পরদেশী ; মহারাষ্ট্রে নিবডুঙ্গ ; কাংটে নিডুঙ্গ ; ফনীংচে নিবডুঙ্গ, বিকাংডী ; কণাটে নিবডিংগু ; তৈলঙ্গে চেংমুড়''৬ ইত্যাদি । বলা বাহুল্য, '' বাংলাদেশেই কেবল ইহার নাম মনসা এবং উদ্ধৃত নামগুলির কোনটিই সংস্কৃত হইতে জাত নহে, প্রত্যেকটি দেশজ শব্দ''৭ প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে, তৈলঙ্গে অর্থাৎ তেলেগু ভাষায় সিজ মনসা গাছের নাম চেংমুড়। মনসামঙ্গলের কাহিনীতে দেখা যায় - চাঁদ সদাগর তাচ্ছিল্য অর্থে বা গালি দিয়ে মনসাদেবীকে 'চেংমুড়ী', 'চেংমুড়ি কানি' প্রভৃতি বলেছেন। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য বলায় 'চেংমুড়ি/ চঙ্গমুড়ি শব্দের '' কোন অর্থ নাই ''৮ ভেবে অত্র কথাটি ' তেলেগু''৯ থেকে এসেছে এ অভিমত ব্যক্ত করত পাশাপাশি '' মনসামঙ্গলের সমস্ত গল্পটিকেও ''১০ তিনি সেখান থেকে অর্থাৎ '' দাক্ষিণাত্য''১১ থেকে বাংলায় আসার অনুমান করেছেন। আচার্য সুকুমার সেন অবশ্য এ অনুমানের কোন ভিত্তি খুঁজে পাননি এই ভেবে - '' দক্ষিণের জীবিত সর্প-পূজার সহিত উত্তরের প্রতীক সর্প-পূজার কোন যোগ নাই। সিজ - পূজাও সেখানে অজ্ঞাত। এ পূজা আসিয়াছে হিমালয় অঞ্চল হইতে।''১২ তা ছাড়া তিনি চেঙ্গমুড়ি শব্দের বাংলা অর্থও খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মতে- ''শববাহনে ব্যবহৃত বাঁশে (''চেঙ্গ'', ''চোঙ্গ'') জড়ানো কাপড় হচ্ছে ''চেঙ্গমুড়ি কানি'' শব্দের আসল অর্থ। আধুনিক ''চেঙ্গদোলা'' শব্দের মধ্যেও চেঙ্গ শব্দের এই অর্থ লভ্য।''১৩

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সর্পদেবী ' জাঙ্গুলী ' বৌদ্ধধর্ম বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে মনসাদেবী নামে পরিচিতা হয়ে উঠলেও পরবর্তীকালে তাঁর নতুন নাম হয় বিষহরী। কালের পরিক্রমায় সর্পদেবীর জাঙ্গুলী নামটি বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গেলেও বিষহরী নামটি বাংলা এবং বিহারে এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। এর পাশাপাশি মনসা নামও বহুল ভাবে আধুনিক কালে গৃহীত।

দেবী ভাগবত১৪ অনুসারে তিনটি কারণে দেবীর নাম হয় মনসা ঃ প্রথমত তিনি কশ্যপ মুনির মানসী তনয়া, অর্থাৎ তাঁর মননক্রিয়া থেকে উদ্ভূতা ; দ্বিতীয়ত মানুষের মনই তাঁর ক্রীড়াক্ষেত্র ; তৃতীয়ত তিনি নিজেও মনে মনে বা যোগবলে পরমাত্মার সাধনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

একটা দিক অত্যন্ত স্পষ্ট যে রামায়ণ, মহাভারত অথবা অপেক্ষাকৃত পুরাতন পুরাণগুলোতে মনসার কোন উল্লেখ নেই। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে মনসা মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সুকুমার সেনের ভাষায় - ' মনসা' শব্দের মৌলিক অর্থ হচ্ছে - '' মনের তীব্র বাসনা, কাম।''[১৫]

সাধারণভাবে মাতৃতান্ত্রিক অনার্য সমাজে নারী-দেবতার পূজা প্রবর্তিত হয়ে থাকে। অন্য দিকে, আর্য - সমাজ পিতৃপ্রধান হওয়ায় সেখানে অধিকাংশ পুরুষ - দেবতার অর্চনা প্রবর্তিত হয়। বাংলাদেশও এই বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম নয়।

বাঙালী - মানসে শিব-দুর্গার কন্যা হিসেবে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী অনেক আগে থেকেই স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন (স্মতর্ব, বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা)। মনসামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত শিবের (এবং চন্ডী বা দুর্গারও) কন্যা হিসেবে মনসার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনা বাঙালী হিন্দু মানসকে সঙ্গত কারণেই উদ্বেলিত করে। ' সাপ, রাজহাঁস এবং হাতী মনসার এই বেশি বা কম প্রচলিত তিনটি বাহনই''[১৬] লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই মনসার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। লক্ষ্মীর অন্যতম বাহন হিসেবে হাতী বা মহানাগ (হস্তী নাগ) বহু পূর্বকাল থেকেই স্বীকৃত। মনসার বাহন সাপ হওয়ায় এই দুই নাগের নামবাচক মিল তার আরেকটি বাহন হিসেবে হাতীকে নির্বাচিত করতে উদ্দীপ্ত করেছে। তাছাড়া, শিবকন্যারূপে লক্ষ্মীর সাথে মনসার ভাবের ঐক্যের অন্যতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে - লক্ষ্মীর কমলা নাম এবং মনসার পদ্মা নামের বিষয়টা। উল্লেখ্য, লক্ষ্মী প্রায়শঃই পদ্মিনী বা পদ্মাবতী নামে উল্লেখিত হন। অপরদিকে, মনসা, রাঢ় প্রভৃতি অঞ্চলে কমলা নামেও উক্ত হয়ে থাকেন. আবার, সরস্বতী এবং মনসার উভয়ের বাহন হচ্ছে হংস বা রাজহংস। এদের মধ্যকার ঐক্যসূত্রের একটা দিক বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় ; সেটি হচ্ছে উভয়েই সঙ্গীত নৃত্যাদির অনুরাগী। নদী-উপাসনার বিষয়টিও উভয়ের তুলনায় ক্ষেত্রে এসে পড়ে। বৈদিক যুগে সরস্বতী নদী ছিল যথেষ্ট সম্মানের অধিকারিণী, পরবর্তীকালে গঙ্গা নদীর উপর সরস্বতী নদীর উত্তরাধিকার বর্তায়। বাংলাদেশে গঙ্গার প্রধান শাখাটি 'পদ্মা' নামে খ্যাতি পেয়েছে এবং '' বাঙালী-চিত্তের উপর পদ্মাদেবীর প্রভাব প্রতিপ''[১৭] অত্র নামকরণকে উৎসাহিত করেছে বলা যায়।

বাংলার উচ্চতর সমাজে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকরী থাকলেও, এই দেশের সাধারণ সমাজে মাতৃতান্ত্রিক মৌলিক ভিত্তিটা যথেষ্ট শক্তিশালী। সেজন্যে এখানকার প্রধানতম দেবতা দুর্গা, কালী প্রভৃতি সকলেই নারী । এই সংস্কার-স্নাত হয়েই বাংলায় সর্পদেবতারও উদ্ভব ঘটেছে বলে তিনি পুরুষ না

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে স্ত্রী। এটাও মনে করা যেতে পারে যে, বাংলার প্রতিবেশী গারো কিংবা খাসিয়া জাতির মত বাংলায়ও যখন এক শক্তিশালী মাতৃতান্ত্রিক জাতির বসবাস ছিল তখনই সর্পভয় থেকে ত্রাণ পাবার মানসে এখানে এক সর্প দেবীর পূজার শুরু হয়েছিল, কালক্রমে এই দেশে যখন বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছে, তখন সেই পুরাতন মাতৃতান্ত্রিক সংস্কার হিন্দুসংস্কার দ্বারা বাইরের দিক থেকে আলোড়িত হলেও এর অন্তঃপ্রকৃতি প্রায় একই রয়ে গিয়েছে।

বাংলাদেশে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের যুগে বৌদ্ধ-সংশ্লিষ্টতার কারণে সর্পদেবীর জাঙ্গুলী নামটিকে বাদ দেওয়া হয় এবং তার পরিবর্তে তাঁর বিষ নাশকারক গুণের সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন নামকরণ করা হয় বিষহরী। এখানেও একটি ব্যাপার লক্ষ্য করার মত - সংস্কৃতি ' বিষহর' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'বিষহরা' এবং 'বিষহারী' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'বিষহারিণী' হয়।

বাংলার লৌকিক দেবদেবী যাহা একান্তভাবেই বাংলার মাটি, পরিবেশ থেকে জাত এবং আর্যেতর পৌরাণিক প্রভাবে অনেকটা উন্নত হলেও বাঙালীর নিজস্ব চেতনা জাত হওয়ার কারণে এঁদের লৌকিক রূপগুলো বিলীন হয়নি। তার ফলে এই দেবতারা পুরাণ এবং লোকমানসের মিশ্ররূপ নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান হলেন শিব। পুরাণের মত তিনি মঙ্গলকাব্যেও দেবাদিদেব।[১৮] শিব ছাড়া যেমন যজ্ঞ হয় না, তেমনি শিব ছাড়া কাব্যও হয় না। সকল কাব্যের (বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যের) চরিত্রের সাথে তাঁর একটি আত্মিক সম্পর্ক রচিত হয়েছে। মনসামঙ্গলের মনসাও এর বাইরে নন। এই কাব্যে মনসা শিবের মানস কন্যা, বিমাতা চন্ডীর সাথে তাঁর বিরোধ লেগেই থাকে। এ নিয়ে শিবকে সব সময় তটস্থ থাকতে হয় - একদিকে কন্যা, অন্যদিকে পত্নী দু'দিককে সাম্যাবস্থায় রাখা তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভব হয়ে উঠে না। এখানে শিব ও চন্ডীর উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করা যায়।

ভারতীয় উপমহাদেশের যে সমস্ত প্রাগ্-বৈদিক দেবতা পরবর্তী কালেও তাদের প্রতিষ্ঠার আসনকে সমুজ্জ্বল রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে শিবই সর্বপ্রধান। সম্ভবত, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মতই বাংলার আর্যেতর লোকধর্মেও প্রথম থেকেই শিবদেবতার সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা ছিল।

অনুমান করা যায় যে, উপমহাদেশের প্রাগ্-বৈদিক সমাজে সমকালীন শৈবধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সিন্ধু সভ্যতার আবিস্কার থেকে বিষয়টি সমর্থিত হয়। বাংলাদেশে প্রথম থেকেই যে শৈবধর্ম প্রচারিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল, সেখানে আর্যেতর সমাজের উপাদানের মিশ্রণ পূর্বেই ঘটে। শুধু তাই নয়, অনার্য দেবতা শিব ইতোপূর্বেই আর্য সমাজে সম্মানজনক স্থান করে নিয়েছিলেন।

প্রত্নতত্ত্বে আদি-শিবের প্রথম নিদর্শন মেলে মহেঞ্জোদারোতে। সেখানকার অধিবাসীরা শুধু মাতৃদেবীর পূজাই করতেন না, তাঁরা সৃজনশক্তির উৎস হিসেবে এক পুরুষদেবতারও পূজা করতেন। সেখানে প্রাপ্ত এক তিন মুখবিশিষ্ট দেবতার মূর্তি[১৯] থেকে এটা প্রমাণিত হয়। মূর্তিটি সিংহাসনের উপর আসীন, তাঁর বুক, গলা এবং মাথা উন্নত। বীরাসনে বসা মূর্তির হাত দুটি হাঁটুতে ছড়ানো অবস্থায় বিদ্যমান। ধ্যানস্থ এবং ঊর্ধ্বলিঙ্গ মূর্তিটির উভয় পার্শ্বে চার প্রধান দিক-নির্দেশক স্বরূপ হাতি, বাঘ, গন্ডার এবং মহিষের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত। তাঁর সিংহাসনের নিচে দুটি হরিণকে পেছনদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। মোট কথা, পরবর্তীকালের শিবের তিনটি মূলগত ধারণা মূর্তিটির মধ্যে প্রকটিত - (১) যোগীশ্বর বা মহাযোগী, (২) পশুপতি এবং (৩) ত্রিমুখ।

ঋগবেদে উক্ত হয়েছে যে, রুদ্র সোনার তৈরি অলঙ্কার পরেন। মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত আদি শিবের মূর্তির হাতে এবং গলায় গহনা দেখা যায়। আর্যদের মধ্যে একটি প্রথার প্রচলন ছিল- তাঁদের দেবতামন্ডলীতে নতুন কোন দেবতাকে ঢুকানোর সময় তাঁকে অগ্নিদেবতার সঙ্গে সমীকরণ করে নিতেন। যেমন অনার্য দেবতা কালী বা করালীকে আর্য দেবতামন্ডলীতে প্রবেশ করানোর সময় করা হয়েছিল। অগ্নিদেবতার সঙ্গে সমীকরণের ফলে পরবর্তী কালের বৈদিক সাহিত্যে শিবকে হর, মৃদ, শর্ব, ভব, মহাদেব, উগ্র, পশুপতি, ঈশান, শঙ্কর, প্রভৃতি দেবতার সাথে অভিন্ন দেখতে পাওয়া যায়। বৈদিক রুদ্রাগ্নির উপাসনার ফলেই এটি সম্ভবপর হয়েছিল। উল্লেখ্য, সংস্কৃতে ' রুদ্র' শব্দের অর্থ যেমন 'রক্তবর্ণ,' দ্রাবিড় ভাষাতেও তেমনি 'শিব' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'রক্তবর্ণ'।

হিন্দুধর্মে শিব ও শক্তি যে শুধুমাত্র মনুষ্যাকৃতিতে পূজিত হন, তা নয়। লিঙ্গ ও যোনি - এই প্রতীকাকারেরও পূজিত হয়ে থাকেন। সিন্ধু-সভ্যতায় এর নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে - ''লিঙ্গপূজা এবং মাতৃকাপূজা যে সিন্ধুতীরের প্রাগৈতিহাসিক লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহাও প্রমাণ করিয়াছে হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ। ..... লিঙ্গ পূজাই ক্রমশ শিবের সঙ্গে জড়িত হইয়া শিবলিঙ্গ ও শক্তিযোনি পূজায় রূপান্তরিত হয়''[২০]

Dhaka University Institutional Repository

শৈবধর্মের সংজ্ঞা প্রদান প্রসঙ্গে বৈদিক, তান্ত্রিক , পৌরাণিক প্রভৃতি সম্বন্ধীয় পাশ্চাত্যের অন্যতম বিশেষজ্ঞ Sir Monier Williams দেবতা শিবের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেছেন এভাবে " Saivism may be defined to be the setting aside of the triune equality of Brahma, Siva, and Vishnu, and the merging of Brahma and Vishnu in the god Siva."[২১] প্রাগার্য শিবের উপাদানে সৃষ্ট বৈদিক রুদ্র পরবর্তীতে পৌরাণিক শিবে রূপান্তরিত হন।

রুদ্র-শিবের উপাসনা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ায় আর্যেতর বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই দেবতাটি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন। যজুর্বেদের যুগ থেকেই আর্য-শিব অন্ত্যজ শ্রেণীর পূজা পেয়ে আসছেন। এর পর হাজার হাজার বছর ধরে শিব বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন জাতির উপাস্য হওয়ার পাশাপাশি বিচিত্র বিরুদ্ধ নানাবিধ গুণে ভূষিত হয়েছেন। সর্বত্যাগী, মহাযোগী, আত্মভোলা শিব কত ভাবেই না রূপায়িত হয়েছেন ধর্মগ্রন্থ, সাহিত্য প্রভৃতিতে।

আর্যেতর জাতিরা শিবকে নিজেদের উপাস্যরূপে গ্রহণ করায় আর্যেতর কৃষ্টির প্রভাবে অনেক লৌকিক উপাখ্যানেরও সৃষ্টি হয়েছিল শিবকে ঘিরে - এটা ধারণা করা মূলক হবে না । শিব যেমন বিভিন্ন আর্য ও অনার্য গোষ্ঠীর পূজনীয় হয়েছেন , তেমনি আর্য শৈব ধর্মেও নানাবিধ ধর্ম সম্প্রদায় তথা গোষ্ঠীর প্রভাব পড়েছে। বিভিন্ন অনার্য তথা লৌকিক দেবতাও কালে কালে রুদ্রশিবের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন। একদিকে বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম প্রভৃতি শৈব ধর্মের অনেকাংশ গ্রাস করেছে, অন্যদিকে শিবদেবতাও বৌদ্ধ জৈন-দেবতা এবং কৌম প্রমথেশদের গ্রাস করেছেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রাবল্যের সময় শিব মহাযোগী রূপে কল্পিত হয়েছেন। প্রাগার্য যুগের শিব ছিলেন উগ্র স্বভাবের এবং আকারের । পরে আর্য-অনার্যের সমন্বয়ের ফলস্বরূপ শিবের সৌম্যকান্তি আসে। আরও পরবর্তীকালে সম্ভবত বৌদ্ধ যুগের প্রভাবে প্রভাবিত শিব-মূর্তিই বর্তমানে পরিলক্ষিত হয়, আদি শিবের মূর্তির সাথে যার কোন মিলই খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

বিভিন্ন পুরাণে শিবের তিন পত্নীর উল্লেখ আছে। প্রথমে তিনি দক্ষ প্রজাপতির মেয়ে সতীকে বিয়ে করেছিলেন। দক্ষের যজ্ঞে সতী দেহ ত্যাগ করে পরবর্তী জন্মে পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা হয়ে জন্মে শিবকেই পতিত্বে বরণ করেছিলেন। এছাড়া গঙ্গার পৃথিবীতে নামার সময় শিব পৃথিবীকে রক্ষার জন্যে গঙ্গাদেবীকে মস্তকে ধারণ করে শিব গঙ্গাধর নামে পরিচিত হয়েছিলেন। বাংলা মঙ্গলকাব্যসহ বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যে রুদ্র-শিবের যে বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়, তা বহুলাংশেই পৌরাণিক বর্ণনার অনুরূপ। মঙ্গলকাব্যে কোচ, ডোম, বাগ্দী প্রভৃতি আর্যেতর জাতির মধ্যে প্রচলিত শিবপূজা যথেষ্ট জনপ্রিয় অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, নাথ প্রভৃতি ধর্মসহ এই অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন লৌকিক ধর্মের উপাদানের উপর ভিত্তি করে বাংলায় শিবের এক অভিনব সঙ্কর-রূপ গড়ে উঠেছিল। এই রকম নানামুখী ও বিপরীতধর্মী কতকগুলো আদর্শের সংমিশ্রণের ফলে উদ্ভূত শৈব উপাদানসমূহ দ্বারা বাংলায় কোন বিশিষ্ট সাহিত্য সার্থকভাবে গড়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ, এর নানাবিধ উপাদান সমূহ পরস্পর থেকে এমনভাবে আলাদা যে, এদের দ্বারা কাহিনী ও আদর্শগত কোনও অখন্ডতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। এবং এর ফলেই শিব মঙ্গল দেবদেবীগোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত হতে সক্ষম হননি যে কথা আগেই বলা হয়েছে। অবশ্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের প্রায় সবস্থানেই শিবকে নানা ভাবে দেখা যায়। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যে শিবকে প্রধানত দুটি উৎস (পৌরাণিক ও লৌকিক) থেকে পাওয়া যায়। দক্ষযজ্ঞ নাশ, মদন ভস্ম, শিব-পার্বতী বিবাহ প্রভৃতি প্রসঙ্গ পুরান থেকে বর্ণনা করায় বাঙালী কবিরা এক্ষেত্রে তেমন কোন মৌলিকতা দেখাতে পারেননি ; তবে লোকায়ত শিবের কল্পনায় বাঙালী কবিরা নিজস্বতা তথা মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন যার ফলে শিব-চরিত্র জীবন্ত ও বাস্তব হয়ে বাঙালীর কাছে পরম উপভোগ্য বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

চন্ডী বা দুর্গা বাঙালী হিন্দুদের প্রাচীন দেবী। এঁর প্রকৃতি জটিলতম। কারণ বিভিন্ন সময়ে এ দেশের বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন স্থানীয় অবস্থা হতে পরস্পর ভিন্ন প্রকৃতির যে সকল দেবী পরিকল্পিত হয়েছিলেন কালে কালে তাঁর সব এক সাধারণ 'চন্ডী' নামের মধ্যে একাকার হয়ে গিয়েছে। মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, গন্ধেশ্বরী, সুবচনী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবীও দেবী চন্ডী বা দুর্গারই অংশসম্ভূতা। মার্কন্ডেয় পুরাণ অনুসারে, মহিষাসুর বধের জন্যে দেবতাদের তেজ বা শক্তি থেকে তাঁর জন্ম হয়েছিল। লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, মার্কন্ডেয় পুরাণান্তর্গত চন্ডীর সঙ্গে শিব কিংবা হিমালয় কারোরই কোন বিশেষ সম্পর্ক নেই। সেখানে অন্যান্য দেবতার মত শিবেরও চন্ডীর সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক।

বেদে যেমন সংখ্যার দিক থেকে দেবতাদের চেয়ে দেবীরা নগণ্য, তেমনি প্রাধান্যের ক্ষেত্রেও দেবীরা তুলনামূলকভাবে নিম্ন পর্যায়ে । তা সত্ত্বেও অন্যান্য নামে (ঊষা, অদিতি, সরস্বতী, বাক, রাত্রি প্রভৃতি) দেবীচরিত্র থাকলেও বৈদিক সংহিতায় 'চন্ডী' নামটি নেই। এমন কি, রামায়ণ, মহাভারত কিংবা প্রাচীন কোন পুরাণেও চন্ডীদেবীর উল্লেখ পর্যন্ত নেই। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে রচিত অর্বাচীন কয়েকখানি

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃত উপ-পুরাণে- চন্ডী নাম দেখতে পাওয়া যায়। এর থেকে অনুমিত হয়, আর্যেতর কোন সমাজ থেকে এই নামটি কালক্রমে পূর্ব ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যে স্থান অধিকার করেছিলেন।

হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের সময় যখন বাংলাদেশে পৌরাণিক দেব-দেবীরা প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে থাকেন তখন কিংবা তারও আগে এ দেশ দেব-দেবী শূন্য ছিল না। অন্যান্যদের পাশাপাশি লৌকিক চন্ডী বা দুর্গা দেবীরা তখন বাংলার সর্বত্র স্থানীয় ভিত্তিতে প্রবল প্রতাপে নিজেদের স্থান করে নেন। এঁদের সংখ্যা অসংখ্য ; যেমন বনদুর্গা, নবদুর্গা, শুভদুর্গা, রাল দুর্গা, শুভচন্ডী, রণচন্ডী, রথাই চন্ডী, ও লাই চন্ডী, উড়ন চন্ডী, উদ্ধার চন্ডী, অবাক্ চন্ডী, বসন চন্ডী, ককাই চন্ডী, ঢেলাই চন্ডী, মঙ্গল চন্ডী প্রভৃতি। আবার এক মঙ্গলচন্ডীরই কত রকমের নাম-বারমেসে মঙ্গলচন্ডী, জয় মঙ্গলচন্ডী, কুলুই মঙ্গলচন্ডী, নাটাই মঙ্গলচন্ডী ইত্যাদি।

অনেকে মনে করেন, চন্ডীদেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক অর্বাচীন পুরাণসমূহ রচিত তথা প্রচারিত হবার অনেক আগে থেকেই বাঙালী সমাজে অন্যান্য চন্ডীর না হলেও অন্তত মঙ্গলচন্ডীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অষ্ট প্রহরব্যাপী মঙ্গলচন্ডীর গীত হওয়া, অন্যান্যের পাশাপাশি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর মত উচ্চশ্রেণীর কবি কর্তৃক 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্য রচিত হওয়া, সমকালীন পুরাণে মঙ্গলচন্ডীর স্বীকৃতিপূর্ণ প্রভৃতি ঘটনা দেবী মঙ্গলচন্ডীর দৃঢ় ভিত্তির সাক্ষ্য বহন করে। দ্রাবিড় ভাষাভাষী ওরাওঁ নামক উপজাতি (ছোট নাগপুরের অধিবাসী)-দের মধ্যে 'চান্ডী' এবং 'মূর্তি চান্ডী' নামে দু'টি শক্তিদেবীর সন্ধান পাওয়া যায়।[২২] চন্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতুর উপাখ্যানে মঙ্গলচন্ডী যেমন পশুদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, উপরোক্ত চান্ডীও মৃগয়াজীবীদেরই দেবী। আবার, মূর্তি চান্ডী সন্তানের মঙ্গলকারিণী দেবী, এদিকে অসংখ্য বরদাত্রী মঙ্গলচন্ডী দেবীর অন্যতম বর হচ্ছে পুত্রবর প্রদান। তাই সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠে - এই চান্ডী বা মূর্তি চান্ডীর সঙ্গে বাঙালীদের লৌকিক চন্ডী বিশেষ করে মঙ্গলচন্ডীর কোন সম্পর্ক আছে কিনা ? শরৎচন্দ্র রায়[২৩] - এর লেখা ওরাওঁদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, কালকেতু কাহিনীর শিকারী ও পশুদের দেবী চন্ডী হচ্ছেন রাঁচি পাহাড়ের ওরাওঁদের চান্ডীটাঁড়ের যুদ্ধ ও শিকারের চান্ডীদেবী, অথবা তাঁরই সগোত্রা।

চন্ডীমঙ্গল কাব্যে একটি কাহিনীর পরিবর্তে দুটি কাহিনী (কালকেতুর উপাখ্যান ও ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান) রয়েছে। এ দু'কাহিনীর দেবী নামে অভিন্না (চন্ডী বা মঙ্গলচন্ডী) হলেও প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। ইতোমধ্যে তান্ত্রিক হিন্দু দেবীরা এবং শক্তিদেবীরাও এসে সেই চন্ডী দুটির সঙ্গে একত্রিত হতে থাকেন। অনেক গ্রাম্যদেবী বা লৌকিক দেবী চন্ডী বা দুর্গা নামের মধ্যে নিজেদের বিলীন না করেও নিজ নামেই নিজেকে শিবপত্নী দুর্গারূপে প্রচার করেছেন। যেমন-সুমতি, সুবচনী, ঘাটাকুলি, সঙ্কটত্রাণী প্রভৃতি। এঁরাও যে আর্যেতর সমাজেরই দেবী ছিলেন, পরে চন্ডী বা দুর্গার সঙ্গে অভিন্না হয়ে নিজেদের প্রকাশ করেছেন, ব্রতের উপকরণ এবং ব্রতকথার মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দ) আবির্ভাবের পূর্বেই কানা হরিদত্ত, নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস প্রমুখ কবি মনসাদেবীর মাহাত্ম্যসূচক মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। পক্ষান্তরে সে সময়কার চন্ডীমঙ্গল কাব্যের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এ থেকে ধারণা করা যায়, মনসামঙ্গল কাব্যগুলোর পথ ধরে পরবর্তীকালে চন্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হয়। আরও অনুমান করা যায়, মনসাদেবীর পূজা প্রবর্তিত হবার পরবর্তী সময়ে লৌকিক চন্ডীদেবী বা মঙ্গলচন্ডীর পূজা সমাজে চালু হয়েছিল। কিন্তু মনসামঙ্গল কাব্যেই চন্ডীদেবীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অবশ্য মনসামঙ্গলের চন্ডীর সাথে চন্ডীমঙ্গলের চন্ডীর খুব একটা সাদৃশ্য নেই। পরবর্তী কালে শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যে, অন্নদা মঙ্গল কাব্যে এমনকি নাথপন্থীদের সাহিত্যে বিশেষ করে 'গোর্খ বিজয়' - এ দেবী চন্ডীরই রূপভেদ তথা নামান্তর হিসেবে দুর্গা, সতী, পার্বতী, উমা, অন্নদা প্রভৃতিকে দেখা যায়। উল্লেখ্য, একই দেবী হলেও প্রকৃতিতে এঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ।

অপ্রধান দেব-দেবী । এখানে পৌরাণিক এবং লৌকিক উভয় প্রকারের দেবদেবীই রয়েছেন। পৌরাণিক পর্যায়ে যেমন রয়েছেন গঙ্গা, ইন্দ্র, যম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নারদ, বিশ্বকর্মা, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতি; লৌকিক পর্যায়েও তেমনি রয়েছেন ধর্ম, ক্ষেত্রপাল, নেতা প্রভৃতি দেবদেবী। এ পর্যায়ে সংক্ষিপ্তাকারে তাঁদের উৎপত্তির ইতিহাস তুলে ধরা যায়।

নদীদেবতা গঙ্গা ভারতীয় পুরাণ-সাহিত্যাদিতে গুরুত্বপূর্ণ আসনে আসীনা। সরস্বতীর সাথে গঙ্গার চমৎকার মিল রয়েছে " সরস্বতী থাকেন দ্যুলোকে কিরণরূপে, মর্তে নদীরূপে। গঙ্গার তিনরূপ - স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্তে গঙ্গা ও পাতালে ভোগবতী।"[২৪] গঙ্গার আগমন-উৎস সম্পর্কে বেদ থেকে কিছু জানা সম্ভব না হলেও পুরাণ থেকে জানা যায় যে, তাঁর আগমন ঘটেছে ব্রহ্মলোক থেকে। কলি কলুষহারিণী

Dhaka University Institutional Repository

গঙ্গা কালিযুগে সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ হিসেবে বন্দিতা হয়েছেন পুরাণেই। গঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ[২৫] অনুসারে গঙ্গা, সরস্বতী ও লক্ষ্মী - এ তিনজনেই বিষ্ণুর স্ত্রী। একদিন সপত্নী সুলভ ঝগড়া বেঁধে যাওয়ায় সরস্বতী ও গঙ্গা পরস্পর একে অপরকে মর্ত্যে গিয়ে নদী হওয়ার অভিশাপ দিলেন। লক্ষ্মী ঝগড়া থামাতে এসে নিজেও একইভাবে অভিশপ্তা হন। বাস্তবে (উপমহাদেশের বুকে) দেখতে পাওয়া যায়- গঙ্গা নদী এবং সরস্বতী নদী স্ব-নামেই আবির্ভূতা, কিন্তু লক্ষ্মী ''পদ্মা'' নামে অবতীর্ণা । উল্লেখ্য, ভৌগোলিক দিক থেকে গঙ্গানদীরই মূল ধারাটি বাংলাদেশে এসে পদ্মা নাম ধারণ করেছে।

গঙ্গার মর্ত্যাবতরণের ইতিহাস[২৬] বাল্মীকি -রামায়ণের আদি কান্ডে বর্ণিত হয়েছে। রাজা ভগীরথ কঠোর তপস্যার দ্বারা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে মর্ত্যে আনার অনুমতি লাভ করেন। কিন্তু তাঁর বেগ ধারণ করা জটাশ্বর মহাদেব ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয় বলে ভগীরথ পুনরায় কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে তাঁর মস্তকে গঙ্গার বেগ ধারণে তাঁকে রাজী করান। অতঃপর ব্রহ্মার আদেশে গঙ্গা তীব্রবেগে মহাদেবের মাথায় পড়ে তাঁকে পাতালে ভাসিয়ে নেয়ার প্রয়াস চালান। এতে শিব রুষ্ট হয়ে তাঁর জটা - জালের মধ্যে গঙ্গাকে আটকিয়ে রাখেন। বিপদ বুঝে রাজা ভগীরথ পুনরায় শিবকে স্তুতি করে সন্তুষ্ট করত তাঁর জটা থেকে গঙ্গাকে মুক্ত করান। গঙ্গা তখন পশ্চিমে হলাদিনী, পাবণী ও নলিনী, পূর্বে সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু এবং ভগীরথের পশ্চাতে এক স্রোত - এই সাতটি স্রোত বা ধারায় বয়ে যেতে থাকেন । এসময় গঙ্গা যজ্ঞোপকরণীদিসহ জহ্নুমুনির যজ্ঞভূমি ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ায় ক্রুদ্ধমুনি গঙ্গাকে গন্ডুষে পান করেন। পরে রাজা ভগীরথের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে জহ্নুমুনি জানু বিদীর্ণ করে (মতান্তরে কর্ণপথে) গঙ্গাকে মুক্তিদেন। সেই থেকে গঙ্গা জহ্নুমুনির কন্যাস্থানীয়া এবং 'জহ্নুকন্যা' বা 'জাহ্নবী' নামে খ্যাত। এরপর গঙ্গা স্বাভাবিক গতিতে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। গঙ্গার ধারা সাগর সঙ্গমে এসে মিলিত হলে তখন সগর বংশের উদ্ধার-কার্য সাধিত হয়। বলা বাহুল্য, ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্যে এনেছিলেন বলে গঙ্গা 'ভাগীরথী' নামেও অভিহিতা হয়ে থাকেন।

আবার বৃহদ্ধর্ম পুরাণ[২৭] মতে-শিবের পত্নী, দক্ষের কন্যা সতী জন্মান্তরে নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করে হিমবান ও মেনার দু'কন্যা- গঙ্গা ও উমারূপে জন্মেছিলেন। দেবগণ গঙ্গাকে হিমবানের কাছ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

প্রার্থনা করে স্বর্গে নিয়ে এলে গঙ্গা ব্রহ্মার কমন্ডলুতে আশ্রয় নিলেন এবং শিবের আকুলতায় চতুর্ভুজা মূর্তিতে শিবের কাছে এবং সলিল রূপে ব্রহ্মার কমন্ডলুতে অবস্থান করতে স্বীকৃতা হলেন। এরপর এক সময় নারদ ও শিবের গান শুনে বিষ্ণু হলেন দ্রবীভূত - বৈকুণ্ঠ হোল সলিলময়। সেই সলিল ব্রহ্মার কমন্ডলুতে স্থান পেল, গঙ্গার সঙ্গে দ্রবীভূত বিষ্ণু সম্মিলিত হওয়ায় গঙ্গা হলেন পুণ্যতোয়া।

এককালে নদী সরস্বতী যে মহিমা অর্জন করেছিলেন, পরবর্তীকালে গঙ্গা সেই মহিমা অর্জন করত ভারতীয় জীবনধারার মর্মমূলে প্রবেশ করেছেন। অবশ্য নদী সরস্বতী ও দেবী সরস্বতী প্রকৃতিগত দিক থেকে অভিন্না হয়ে উঠতে ব্যর্থ হলেও ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে পুণ্যতোয়া সর্বতীর্থময়ী গঙ্গার স্রোত ধারা একাত্ম হয়ে নদী গঙ্গা দেবী গঙ্গা রূপে পূজিতা হয়েছেন এবং গঙ্গাদেবীর মূর্তিও প্রকটিতা হয়ে উঠেছেন। সরস্বতী নদীরূপতা বিসর্জন দিয়ে হয়েছেন বিদ্যাদেবী, কিন্তু গঙ্গা নদীরূপেই ভক্ত - হৃদয়ে স্থান পেয়েছেন, যদিও তাঁর পূজা সরস্বতী কিংবা লক্ষ্মীর মত ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। গঙ্গার দেবীত্বে উত্তরণের কাল হিসেবে অনুমিত হয়- '' গুপ্ত রাজাদের সময়ে (খ্রীস্টীয় ৪র্থ /৫ম শতাব্দীতে) গঙ্গার মূর্তি পূজিত হোত।''[২৮]

ইন্দ্র । বৈদিক আর্যগণের প্রধান দেবতা হচ্ছেন ইন্দ্র । কর্মের মাধ্যমেই তিনি অন্যান্য দেবতাদের অতিক্রম করে গেছেন। বেদে ইন্দ্র দেবতাদের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান স্থানে অবস্থান করলেও পুরাণে তিনি স্থানভ্রষ্ট হয়েছেন। সেখানে তিনি ব্রহ্মা - বিষ্ণু - মহেশ্বর এবং মহাশক্তির কাছে একজন সামান্য রাজা মাত্র। অবশ্য, বেদে ইন্দ্রের যে সকল বিশেষত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর প্রায় সবই পৌরাণিক যুগেও বিদ্যমান ছিল। এখানেও তিনি বজ্র ও বিদ্যুতের নিক্ষেপকারী।

প্রচলিত মত হচ্ছে - স্বর্গরাজ্যের অধিপতিই 'ইন্দ্র ' উপাধির অধিকারী হতেন। অসুরর' ইন্দ্রের চিরবৈরী। ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য অসংখ্যবার অসুর কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে। স্বর্গরাজ্য একাধিকবার হস্তচ্যুতও হয়েছে অসুরদের কারণে। অবশ্য ক্রমাগত যুদ্ধের মাধ্যমে ইন্দ্র অসুরদের পরাজিত ও নিহত করেছিলেন। ইন্দ্র বৃত্র, নমুচি, জম্ভ প্রভৃতি অসুরদের নিধন করে বৃত্রহা, বৃত্রঘ্ন, নমুচিসূদন, জম্ভভেদী, জম্ভভেদন প্রভৃতি নামে খ্যাতি লাভ করেন। এছাড়াও নানাবিধ কাজের জন্যে তাঁর নামের তালিকা বিস্তৃততর হয়ে উঠে। যেমন - অসুরদের বহু পুর বা দুর্গ ধ্বংস করার কারণে 'পুরন্দর ', মেঘকে বাহন করার কারণে 'মেঘবাহন', বারিবর্ষণ করার কারণে 'বৃষা', প্রধান অস্ত্র হিসেবে বজ্রকে ধারণ

Dhaka University Institutional Repository

করার কারণে 'গোত্রভিদ', 'বজ্রী', আখন্ডল,' শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনান্তে ইন্দ্রত্ব লাভ করার কারণে 'শতমুখ', 'শতক্রতু', 'শতমন্যু,' ইত্যাদি।[২৯] ইন্দ্রের জনক দ্যৌ ও ত্বষ্টা এবং জননী হচ্ছেন অদিতি । তাঁর পত্নীর নাম ইন্দ্রাণী এবং শচী ; তনয় ও তনয়ার নাম জয়ন্ত ও জয়ন্তী। এছাড়া, তাঁর রথচালক, রথ, হস্তী এবং অশ্বের নাম হচ্ছে যথাক্রমে মাতলি, বিসান, ঐরাবত এবং উচ্চৈঃশ্রবা।[৩০] ঋগবেদে ইন্দ্রের যে গৌরবগাথা, বীরত্ব, মহিমা বর্ণিত হয়েছিল, পরবর্তী পর্যায়ে তা ক্রমশঃ লঘুতর হয়েছে। অথর্ববেদের কালে এসেই ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদের সমান্তরালে চলে এসেছেন নিজের শীর্ষস্থান ত্যাগ করে। বিশেষ করে মহাভারতে - পুরাণে ইন্দ্র চরিত্রের মহিমা বহুলাংশে খর্বিত হয়েছে। এসব স্থানে ইন্দ্র ভীরু হীনকর্মারূপে প্রায় সর্বত্রই প্রতিভাত হয়েছেন। এখানে তিনি নিজের সিংহাসন, ইন্দ্রত্ব বহাল রাখার চিন্তায় সর্বক্ষণ উদ্বিগ্ন । কেউ কঠোর তপস্যা কিংবা বেশি সংখ্যায় যজ্ঞ সম্পাদন করার চেষ্টা করলেই ইন্দ্র তাঁর ইন্দ্রত্ব হারানোর আশঙ্কায় সেগুলো পন্ড করার উপায় খুঁজতেন। বেশির ভাগ সময়েই তিনি অপ্সরাদের সহায়তা নিতেন। বৈদিক যুগে অনেক ইন্দ্র কেন্দ্রিক কাহিনী ছিল রূপক আকারে। কিন্তু পরবর্তী কালে সেই রূপক কাহিনী পূর্ণরূপ পায় । বর্তমানে মূর্তি গড়ে ইন্দ্রের পূজার প্রচলন না থাকলেও ''খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে ইন্দ্রের মূর্তি পূজা প্রচলিত ছিল - এ বিষয়ে সংশয়ের কারণ নেই।''[৩১]

বাংলা মঙ্গলকাব্যে বিভিন্নভাবে ইন্দ্র-কাহিনী স্থান পেয়েছে। মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, অভয়ামঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে ইন্দ্র - প্রসঙ্গ রয়েছে। মনসামঙ্গলে ইন্দ্র বেশ গুরুত্বের সাথেই আলোচিত হয়েছে।

এখানে পৌরাণিক দুই প্রধান দেবতা- বিষ্ণু ও ব্রহ্মার উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা করা যায়। পরবৈদিক সংস্কৃত সাহিত্যে এবং পুরাণের একজন প্রধান দেবতা বিষ্ণু ; কিন্তু বেদে বিষ্ণু প্রথম সারির দেবতাদের পংক্তিভুক্ত হতে পারেননি। অবশ্য বেদের বিষ্ণুকে একেবারে অপ্রধান দেবতাও বলা যায় না - ঋগবেদে ১০৫ বার, সামবেদে ২৪ বার, যজুর্বেদে ৫৯ বার এবং অথর্ববেদে ৬৬ বার বিষ্ণুর উল্লেখ করা হয়েছে।[৩২]

ঋগবেদের সময়ে ঋতু ও বর্ষকর্তা সূর্যরূপী বিষ্ণু বৈদিক দেবতাদের মধ্যে প্রথম সারিতে স্থান না পেলেও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে তিনি ক্রমবিবর্তনে প্রধান হয়ে উঠেছিলেন। পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব - এই তিন

Dhaka University Institutional Repository

দেবতার অন্যতম হচ্ছেন বিষ্ণু। সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের মধ্যে স্থিতিকর্মের বা পালনকর্মের অধিষ্ঠাতা তিনি। ঋগবেদেও বিষ্ণু পালন - কর্তা হিসেবে অভিহিত হয়েছেন।[৩৩]

জগতের পালনকার্যের অধিকর্তা বিষ্ণু পুরাণের যুগে অন্যতম প্রধান দেবতা বা প্রধানতম দেবতার আসন লাভ করেছেন। বিষ্ণুর প্রাধান্য সবার উপরে থাকায় তাঁর গুণকর্ম ভেদে বহুপ্রকার অবতার কল্পিত হয়েছিল। কবি জয়দেব তাঁর 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যের প্রথমে দশ অবতারের বন্দনা করেছেন। লোকরক্ষার প্রয়োজনে বিষ্ণু বিভিন্ন অবতারে আবির্ভূত হয়ে মধুকৈটভ, হিরণ্যাদি লোকশত্রুকে ধ্বংস করেছেন। বিষ্ণু বা নারায়ণ ক্ষীরোদসাগরে অনন্ত-শয্যায় শায়িত। এঁর পত্নী লক্ষ্মী, পুত্র কামদেব, ধাম বৈকুণ্ঠ, বাহন গরুড়, শঙ্খ পাঞ্চজন্য, চক্র সুদর্শন, গদা কৌমদকী, ধনু শার্ঙ্গ, অসি নন্দক এবং মণি কৌস্তভ। দেবতাদের শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুকে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা বিপদের সময় শরণ করেন।[৩৪]

মহাভারত-পুরাণাদিতে বিষ্ণুর প্রজাপতি হিসেবে তিনটি অবস্থার উল্লেখ আছে। প্রথম অবস্থায় তিনি সক্রিয় সৃষ্টিকর্তারূপে ব্রহ্মা, যিনি নিদ্রিত বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে উত্থিত হয়েছেন। দ্বিতীয় অবস্থায় বিষ্ণু স্বয়ং রক্ষক হিসেবে অবতার, যেমন - শ্রীকৃষ্ণ । সর্বশেষ বা তৃতীয় অবস্থায় তিনি স্বীয় কপালউদ্ভূত ধ্বংসের দেবতা শিব বা রুদ্র।[৩৫] বিষ্ণুর বাহন গরুড়।

ত্রিমূর্তির অন্যতম সৃষ্টিকর্তা বিধাতা ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন - বলে তিনি পদ্মযোনি । বেদে কিংবা ব্রাহ্মণে ব্রহ্মার উল্লেখ নেই, সেখানে সৃষ্টিকর্তাকে হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বেদে ব্রহ্মা নামে কোন দেবতার অস্তিত্ব নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সর্বত্র একাত্মতা সত্ত্বেও পৃথক অস্তিত্ব ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিবের মত সবস্থানে ব্যাপকভাবে পূজালাভ করতে সক্ষম হননি।

পুরাণে ব্রহ্মা - বিষ্ণুর কাহিনী বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে । মঙ্গলকাব্যগুলোও এর থেকে দূরে থাকতে পারেনি। মনসামঙ্গল কাব্যে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু মোটামুটি ভাল ভাবেই আলোকিত হয়েছেন। বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বকর্তা পুরাণে দেবশিল্পীতে রূপান্তরিত হলেন এবং তাঁর বিশ্বসৃজন শক্তি প্রজাপতি ব্রহ্মণস্পতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পুরাণে ব্রহ্মার আবির্ভাব ঘটিয়েছে - সেটা বলা যায়।

ঋগবেদের মতে - বিশ্বকর্মা সর্বদর্শী ভগবান । ইনি ধাতা, বিশ্বদ্রষ্টা ও প্রজাপতি। ইনি পিতা, সর্বজ্ঞ ; দেবতাদের নামদাতা এবং মর্ত্যজীবের অনধিগম্য। বিশ্বকর্মা শিল্পসমূহের প্রকাশক, অলঙ্কারের স্রষ্টা, দেবতানিচয়ের বিমাননির্মাণকারী। তাঁর অনুগ্রহে মানুষ শিল্পকলায় দক্ষতা লাভ করেন। তিনি লঙ্কা নগরীর নির্মাণকারী, উপবেদ ও স্থাপত্য বেদের প্রকাশকারী এবং চৌষট্টি কলার অধীশ্বর। তিনি প্রাসাদ, ভবন, উদ্যান প্রভৃতির শিল্পী প্রজাপতি। বিষ্ণু পুরাণ অনুসারে প্রভাসের ঔরসে বৃহস্পতির ভগিনীর গর্ভে বিশ্বকর্মার জন্ম হয়।[৩৬]

বিশ্বকর্মা বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র, শিবের ত্রিশূল, কুবেরের অস্ত্র, কার্তিকেয়ের শক্তি এবং অন্যান্য দেবতাদের অস্ত্র-শস্ত্রাদি নির্মাণ করেন। স্বর্গ তাঁরই সৃষ্টি।[৩৭] কোন কোন গবেষকের মতে " বিশ্বকর্মা আসলে প্রাগার্য নাগরিক জাতির দেবতা, আদিতে হাতীর (অথবা বানরের) প্রতীকে পূজিত হতেন, উত্তরকালে সংস্কৃতির সহাবস্থান ও সমন্বয় ঘটলে বৈদিক নাম "বিশ্বকর্মা" এই সমন্বিত -দেবতার উপরও আরোপিত হয়, বৈদিক দেবতা ত্বষ্টার বিভিন্ন গুণ এখন বিস্তৃতনামা হরপ্পীয় দেবতার স্থাপত্যবিদ্যা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য দক্ষতাও তাঁর মধ্যে একত্রে কল্পনা করা হয়।"[৩৮] বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলোতে বিশেষ করে মনসামঙ্গল কাব্যে বিশ্বকর্মা সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও যথেষ্ট ব্যঞ্জনাধর্মীভাবে উপস্থাপিত হয়েছেন।

যম : বেদে যমের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এভাবে - যে দেবতা সমস্ত ভূত জাতির পরিচিত, পুণ্যবান কিংবা পাপী সবার গন্তব্যপথের সহায়স্বরূপ, বিবস্বানের পুত্র, যিনি পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে কর্মফল অনুযায়ী জীবসকলের এ লোক থেকে অন্য লোকে যাবার উপযুক্ত শরীর প্রদান করে থাকেন, জীবমাত্রেরই রাজা বলে পরিচিত - তিনিই যম। ঋগবেদের অনেক স্থলে যমকে বরুণ ও অগ্নির সঙ্গে একত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। কোনও স্থলে আবার অগ্নি ও যমকে অভিন্ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথর্ববেদের মতে, যমই মৃতদের আশ্রয়দাতা এবং ভবিষ্যৎবাসের স্থান নির্দেশকারী।[৩৯]

যম স্বর্গের দেবতা হলেও নরকের অধিপতি। সবুজ বর্ণের কলেবরে রক্তবর্ণের বেশ-ভূষায় ভূষিত যম দন্ডধর, শমন, কৃতান্ত, অন্তক, ধর্ম, ধর্মরাজ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। যমের দূতরা যমদূত নামে খ্যাত, যাদের কাজ হচ্ছে মৃত ব্যক্তিদের আত্মা যমালয়ে নিয়ে আসা। মনসামঙ্গল কাব্যে যমদূতদের সূত্র ধরেই মনসা- যমের যুদ্ধের সূচনা ঘটে, যা কাব্যের মধ্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। যা হোক, সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও যম মনসামঙ্গল কাব্যে তাঁর আসনটিকে আলোকিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কার্তিক - গণেশ । কার্তিক এবং গণেশ উভয়েই শিব ও পার্বতীর পুত্র বলে পরিচিত। দেবতা গণেশ সিদ্ধিদাতা। খর্বাকৃতি তনু, ত্রিনয়ন, চার হাত এবং হাতির মত মাথা। মূষিক বাহন ধারী গণেশ মঙ্গল ও সিদ্ধির জনক হিসেবে সকল দেবতার আগে পূজা পেয়ে থাকেন।

গণেশ - জন্মের বিভিন্ন উপাখ্যান বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যকার একটি হচ্ছে এইরূপ - পার্বতীর দিব্য গাত্র-মল থেকে গণেশ জন্ম লাভ করেন। মহাদেব বা শিব পার্বতীকে খুশি করার জন্যে এঁর মস্তকহীন দেহে একটি গজমস্তক জুড়ে দেন। শিবের কৃপায় গণেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেন এবং মাতা পার্বতীকে প্রদক্ষিণ করত স্বীয় মহিমা ও পরম জ্ঞান- ভক্তি প্রকাশ করেন। পিতা-মাতার বরে গণেশ গণের অধিপতি , বিঘ্ন- বিনাশক এবং সর্বসিদ্ধিদাতা রূপে মর্যাদা লাভ করেন।[৪০]

তারকাসুরের অত্যাচার থেকে ত্রিলোক রক্ষার্থে প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল এক মহাবীর দেব- সেনাপতির। শিব-পার্বতীর পুত্র ছাড়া মহাশক্তিরধর নায়ক পাওয়া সম্ভব নয় বলে প্রয়োজন হল ধ্যানমগ্ন শিবের ধ্যান ভঙ্গের। এ দুরূহ কার্যের দূত মদন ভস্মীভূত হলেন মহাযোগীর তপোভঙ্গ করতে গিয়ে। অবশ্য পরে পার্বতীর সুকঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব তাঁকে বিবাহ করলেন। তাঁদের পরিণয়ের ফলস্বরূপ জন্ম হল কুমার কার্তিকেয়ের। এ কাহিনী মহাকবি কালিদাসের ' কুমারসম্ভবম' কাব্যের, মনসামঙ্গলের অনেক কবিই যার অনুসরণ করেছেন। বিভিন্ন পুরাণেও কার্তিকেয়ের জন্ম সম্পর্কে বিচিত্র উপাখ্যান রয়েছে। এই কাহিনীসমূহ থেকে দেখা যায় - শিবতেজ থেকে জন্মালেও কার্তিকেয় পার্বতীর গর্ভজাত নন, - তিনি অগ্নির তনয়।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কার্তিকেয়ের জন্ম কাহিনী[৪১] বর্ণিত হয়েছে এভাবে ঃ পার্বতীর সাথে বিহারকালে শিবের তেজ পৃথিবীতে পড়ে। পৃথিবী এই তেজ ধারণ করতে অক্ষম হওয়ায় তা অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। অগ্নি ভীত হয়ে এই তেজ শরবনে ফেলে দেন। শরবনে এই তেজ (বীর্য) থেকে একটি সুন্দর বালকের সৃষ্টি হয়। কৃত্তিকারা তখন এই বালককে দেখে স্তন্যপান করিয়ে লালন-পালন করতে থাকেন। পার্বতী দেবতাদের কাছ থেকে ব্যাপারটা অবগত হয়ে কার্তিকেয়কে নিজের কাছে নিয়ে আসেন।

Dhaka University Institutional Repository

মহাভারতে কার্তিকেয়ের জন্ম বৃত্তান্ত স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হয়েছে। কার্তিকেয়ও গণাধিপতি বলে গণেশ থেকে তাঁর পার্থক্য খুব বেশি নয়। উভয়েই গণাধিপতি বা গণেশ। স্কন্দ - কার্তিকেয় পূজার ইতিহাস অনেক প্রাচীন । কুশাণ মুদ্রার এবং যৌধেয় মুদ্রার প্রমাণ ধরে বলা যায় মোটামুটি খ্রীস্টাব্দের সূচনা কাল থেকেই তাঁর মূর্তি পূজা চালু ছিল। সূর্যরূপী রুদ্রের অংশ হওয়ার কারণে স্কন্দ- কার্তিকেয়কে সূর্যের অনুচর বা সৌর দেবতা হিসেবে গ্রহণ করা যায়। যা হোক, বৌধায়নের ধর্মসূত্র, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, নারায়ণোপনিষৎ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য প্রভৃতির সাক্ষ্য থেকে অবগত হওয়া যায় যে রুদ্র শিব থেকে বিচ্ছিন্ন পৃথক দেবতা হিসেবে কার্তিকেয়ের রূপ স্বীকৃত হয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকেরও আগে।[৪২] বর্তমান সময়ে বাঙালী হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা-দুর্গাপূজাতে শিব-পার্বতীর তনয় রূপে দেবসেনাপতি কার্তিকেয় দুর্গাপ্রতিমার সাথে সন্নিবিষ্ট হয়ে পূজা পেয়ে থাকেন। এ ছাড়াও কার্তিক মাসে সংক্রান্তিতে অনেকে পৃথক ভাবেও ময়ূর বাহনধারী কার্তিকেয়ের পূজা করে থাকেন ।

মনসামঙ্গল কাব্যে কার্তিকেয় - গণেশ -এ দু'ভাই দেব খন্ড ও নর খন্ড উভয় স্থানেই বিচরণ করেছেন, যা সহজে দৃষ্টি এড়াবে না।

দেবর্ষি নারদ, যিনি পৃথিবীতে উন্নত জীবন যাপন করে প্রায় দেবতা -শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন, মনসামঙ্গল কাব্যে যাঁর ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য । নারদ ছিলেন ত্রিকালদর্শী, ত্রিলোকজ্ঞ, বেদজ্ঞ ঋষি। নার শব্দের অর্থ জল ; সব সময় তর্পণের জন্যে তিনি জলদান করতেন বিধায় তাঁর নাম হয় নারদ।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ[৪৩] অনুসারে নারদ ব্রহ্মার মানসপুত্র । ব্রহ্মা তাঁর অন্যান্য মানসপুত্রদের সাথে নারদকেও সৃষ্টি কার্যের দায়িত্ব দেন। সৃষ্টিকার্য নিয়ে ব্যস্ত থাকলে ঈশ্বরের চিন্তায় বিঘ্ন হবে - এ চিন্তা করে নারদ পিতা ব্রহ্মার আদেশ পালনে অপারগতা প্রকাশ করেন। তখন ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়ে নারদকে অভিস্পাত করেন। ব্রহ্মার অভিশাপে নারদ প্রথমে গন্ধর্বদেহ এবং পরে নরদেহ ধারণ করেন। নরজন্মে নারদ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বিষ্ণুকে ধ্যান করতে করতে দেহত্যাগ করলে তাঁর পাপমোচন হয় এবং তিনি ব্রহ্মে লীন হয়ে যান। কয়েক কল্প পরে ব্রহ্মা যখন পুনরায় সৃষ্টিকার্যে মনোনিবেশ করেন, তখন তাঁর কণ্ঠ থেকে নারদ উৎপন্ন হন।

Dhaka University Institutional Repository

বীণা হাতে ইনি ত্রিভুবনময় হরিগান করে সকলকে মোহিত করতেন। সংবাদ ও পরামর্শদান, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিবাহাদি সংঘটনে তাঁর ভূমিকা অতুলনীয়। শিবের বিবাহে ইনি ঘটক ছিলেন, দক্ষের অহঙ্কার চূর্ণ করাতেও তিনি ছিলেন । প্রচলিত প্রবাদ হচ্ছে যে, নারদ বাহন ঢেঁকি, যদিও শাস্ত্রে এর প্রমাণ মিলে না। যা হোক, মনসামঙ্গলে নারদের চরিত্রটি বেশ উপভোগ্য ও জীবন্তরূপে প্রকাশমান তাঁর স্বভাব সুলভ গুণাবলীর কারণেই।

কুবের । যক্ষ- কিন্নর-রাক্ষসদের অধিপতি কুবের পুরাণ প্রসিদ্ধ দেবতা। দশ দিকপালের অন্যতম কুবের দেবতাদের ধনভান্ডারের অধ্যক্ষ এবং সকল ধনের প্রদানকারী। বৈদিক এবং পর্রবৈদিক নানাবিধ দেবসত্তার সম্মিলন হয়েছে কুবেরের আকৃতি ও প্রকৃতিতে । সূর্য ও অগ্নির নানা রূপ ও গুণের দ্বারা কল্পিত নানাবিধ দেবসত্তার সংমিশ্রণের ফলস্বরূপ কুবের স্বরূপতঃ সূর্যাগ্নির সাথে এক হয়ে যান।

কৈলাসে বসবাসকারী কুবেরের তিনটি পা ও আটটি দাঁত ছিল। তাঁর দেহের গঠন এরূপ অতি কুৎসিৎ ছিল বলে তাঁর নাম হয় কুবের। তাঁর পিতা বিশ্রবা, মাতা দেববর্ণিনী, স্ত্রী আহুতি, কন্যা মীনাক্ষী এবং পুত্রদ্বয় নলকুবর ও মণিগ্রীব। হিন্দুর নিত্য - নৈমিত্তিক কার্যে দশ দিকপালের অন্যতম হিসেবে কুবেরকেও পূজা করা হয়, যদিও পৃথকভাবে ধনাধিপতি হিসেবে তাঁর পূজার প্রচলন নেই। অবশ্য অন্নপূর্ণা পূজা কিংবা লক্ষ্মীপূজার সময়েও কুবের সংশ্লিষ্টদের সাথে পূজা পেয়ে থাকেন।

অনন্ত । শেষ নাগ অনন্তই হচ্ছেন নাগদের মধ্যে প্রধানতম। তাঁর পিতা কশ্যপ মুনি, মাতা কদ্রু, স্ত্রী তুষ্টি।[৪৪] তিনি ভাইদের অসৎ ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে তাদের ত্যাগ করে কঠোর তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। ব্রহ্মা অনন্ত নাগের তপস্যায় প্রীত হয়ে তাঁকে বর দেন এবং পৃথিবীকে তাঁর মস্তকের উপর এমনভাবে ধারণ করতে বলেন যে, যেন পৃথিবী বিচলিত না হয়। ব্রহ্মার এই আদেশকে শিরোধার্য করে অনন্ত পাতালে প্রবেশ করত পৃথিবীকে মাথায় ধারণ করেন। ব্রহ্মা এতে আরও সন্তুষ্ট হয়ে নাগশত্রু গরুড়কে অনন্ত নাগের বন্ধু করে দেন। শেষনাগ, বাসুকি , গোনস প্রভৃতি হচ্ছে অনন্তদেবের অন্যান্য নাম। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে অনন্তনাগ বলরামের অবতার। আবার, কালিকা পুরাণ অনুসারে, প্রলয়ের পর নারায়ণ লক্ষ্মীর সাথে অনন্তের মধ্যম ফণায় শয়ন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মদন - রতি। মদন বা কামদেব জীবসমূহের প্রধানতম জৈব প্রবৃত্তি কামের দেবতা। রতি তাঁর প্রিয়তমা পত্নী । কামের জন্ম সম্বন্ধে অথর্ববেদ থেকে জানা যায় যে, সেখানে কাম অর্থে যৌনাকাঙ্ক্ষা নয় সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা । তিনি সেখানে শ্রেষ্ঠ দেবতা বা স্রষ্টা হিসেবে পূজা পেয়েছেন।[৪৫]

মদন বা কামদেব ব্রহ্মার মানসপুত্র । আবার তিনি কৃষ্ণ - বিষ্ণুর পুত্র প্রদ্যুম্ন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে স্বরূপতঃ কোন পার্থক্য না থাকায় সূর্যাগ্নিরূপী ব্রহ্মার পুত্র মদন এবং সূর্যাগ্নির কৃষ্ণ - বিষ্ণুর পুত্র প্রদ্যুম্ন মদনের রূপান্তর। আবার মদনের স্ত্রী রতি দক্ষকন্যা। মদন নিজে ব্রহ্মাপুত্র । যিনি ব্রহ্মা, তিনিই দক্ষ - উভয়েই সূর্যরূপী বলে দক্ষকন্যা রতি তাই যথার্থই মদনশক্তি।

সসন্তে কামের প্রভাবে নারী পুরুষের রতিভাব জাগে বলে বসন্ত মদনের বন্ধু । পুষ্প রতিভাবের উদ্দীপনাকারী, তাই মদনের ধনুশর পুষ্প বা ফুলের তৈরী। অরবিন্দ, অশোক, চূত (বা আম্রমঞ্জরী), নবমল্লিকা ও রক্তোৎপল - এই পাঁচটি ফুল হচ্ছে মদনের বা কামদেবের পঞ্চবাণ। মদনকে তাই পঞ্চশর, ফুলশর, ফুলধনু প্রভৃতি নামেও ডাকা হয়। এছাড়াও তিনি মন্মথ, দর্পক, কন্দর্প, অনঙ্গ , মনোজ, কলকেলী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে খ্যাত।

মনসামঙ্গল কাব্যে মদন-রতির ভূমিকা বিশেষ করে মদনের ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়। তাছাড়া লখিন্দররূপী অনিরুদ্ধতো তাঁদেরই পুত্র এবং বেহুলারূপী ঊষা তাঁদেরই পুত্রবধূ । অনিরুদ্ধ ঊষা । শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র এবং প্রদ্যুম্নের পুত্র হচ্ছেন অনিরুদ্ধ । তিনি দৈত্যরাজ বাণের তনয়া ঊষাকে বিবাহ করেন। অবশ্য প্রহ্লাদের পৌত্র শোণিত পুরের রাজা বাণাসুরের রূপবতী কন্যা ঊষার সাথে অনিরুদ্ধের বিবাহটা স্বাভাবিক পথে সম্পন্ন হয়নি।

পুরাণাদিতে বর্ণিত দেবতাদের পুত্র পৌত্রগণ ইত্যাদিরূপে যে সমস্ত দেবতার আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়, তাঁরা মূলতঃ সংশ্লিষ্ট দেব - কল্পনার অংশ হিসেবেই গ্রহণযোগ্য। এই সূত্রে অনিরুদ্ধ যেমন কৃষ্ণ-বিষ্ণুর প্রকার ভেদ, তদ্রূপ কৃষ্ণ-বিষ্ণুর আকৃতি - গুণ-কর্মও অনিরুদ্ধতেই আরোপিত। যেমন - ভাগবত অনুসারে ঊষার মুখে অনিরুদ্ধের বর্ণনা - " শ্যামবর্ণ, পদ্মপলাশলোচন, পীতবসনধারী, দীর্ঘবাহু, নারীর হৃদয় হরণকারী কোনও পুরুষকে আমি দেখেছি।"[৪৬] সন্দেহ নেই অনিরুদ্ধের রূপ - বর্ণনা হলেও এর মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষ করা যায়, ইত্যাদি। আবার বলা যায়, পৌরাণিক অনিরুদ্ধ ও

Dhaka University Institutional Repository

ঊষার কাহিনী বৈদিক সূর্য ও ঊষার কাহিনীর রূপান্তর।[৪৭] অনিরুদ্ধ হচ্ছেন তিনিই যাঁর গতি কখনও রুদ্ধ হয় না। ঊষা সূর্যের প্রণয়িণী বা স্ত্রী। বৈদিক সূর্য প্রণয়ীর ন্যায় ঊষার অনুগমন করেন এবং ঊষাকে সাথে নিয়েই উপর আকাশে চলাচল করেন। ঊষা তাঁর মনোমুগ্ধকর রূপচ্ছটায় চারদিক আলোকিত করে অন্তর্হিত হন।

মনসামঙ্গলের কবিদের মধ্যে একমাত্র কেতকাদাস ক্ষেমানন্দই পুরোপোক্ত ঊষাহরণ উপাখ্যানকে তাঁর কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন ; অন্য কোন কবি তা করেননি, তবে মনসামঙ্গলের কাহিনীর সার অংশ মনসাপূজার প্রচারকার্যে স্বর্গলোক থেকে শাপগ্রস্থ ঊষা ও অনিরুদ্ধের মর্ত্যলোকে বেহুলা ও লখিন্দর রূপে ভূমিকা রাখার ব্যাপারটা প্রায় সকল কবিই তাঁদের কাব্যে এনেছেন।

জরৎকারু-আস্তীক । জরৎকারু হচ্ছেন মনসাদেবীর স্বামী এবং আস্তীক হচ্ছেন মনসাদেবীর পুত্র। জরা শব্দের অর্থ ক্ষয় এবং কারু শব্দের অর্থ দারুণ । কঠোর তপস্যার কারণে তাঁর শরীর ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল বলে নাম হয় জরৎকারু। উল্লেখ্য, মনসারও এক নাম জরৎকারু । জরৎকারু মুনির নিদ্রাভঙ্গ করে অপ্রিয় হওয়ার কারণে তিনি তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে যাবার সময় গর্ভস্থ সন্তানকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন - '' অস্ত্যায়ং সুভগে গর্ভস্তব,'' ইত্যাদি। ' অস্তি' পদাদি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন বিধায় তাঁর নাম আস্তিক। অর্জুনের পৌত্র এবং অভিসন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ মহারাজ ব্রহ্মশাপের কারণে তক্ষক দংশনে মারা গেলে তাঁর পুত্র জনমেজয় সর্পসত্র করে নাগবংশ তথা সর্পবংশ ধ্বংস করার প্রয়াস চালান। বাসুকী এই ঘটনা ভগ্নীর মাধ্যমে আস্তীককে জ্ঞাত করান। আস্তিক মুনি এ কথা শুনে যজ্ঞস্থানে পৌঁছে জনমেজয়কে সন্তুষ্ট করত ধ্বংসপ্রায় সর্পবংশকে বিলুপ্তির হাত থেকে উদ্ধার করেন। উল্লেখ্য, আস্তিকের নাম স্মরণ করলে সর্পভয় দূর হয়।[৪৮]

জরৎকারু এবং আস্তিক -পিতা ও পুত্র উভয়েই মুনি হওয়া সত্ত্বেও মনসাদেবীর সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে তাঁদের নাম দেবতা - পংক্তিতে সংকলিত হল। মনসামঙ্গল কাব্যে তাঁদের অবস্থান তথা উপস্থিতি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়-সেটা বলাই বাহুল্য।

এখানে প্রধান লৌকিক দেবতা প্রসঙ্গে আলোচনা করা যায়। ধর্মঠাকুরের উৎপত্তি নিয়ে যত গবেষণা হয়েছে অন্য কোন লৌকিক দেবতাকে নিয়ে তা হয়নি। ধর্মঠাকুরকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

Dhaka University Institutional Repository

''প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা ''[৪৯] এবং দীনেশচন্দ্র সেন '' বৌদ্ধধর্মের বিকৃত দেবতা ''[৫০] হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সুকুমার সেন ধর্মঠাকুরকে যথাক্রমে ''অনার্যেতর দেবতা''[৫১] এবং ''মিশ্রিত দেবতা''[৫২] মনে করেছেন।

আশুতোষ ভট্টাচার্য[৫৩] মনে করেন- পূর্বভারতীয় প্রাগৈতিহাসিক সূর্যোপাসনা পূর্ববঙ্গে যেমন 'সূর্যের ব্রত ' প্রভৃতি লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কোন রকমে আত্মরক্ষার মাধ্যমে জীবিত আছে, তেমনি রাঢ় অঞ্চলে একমাত্র ধর্মপূজার মধ্য দিয়ে এর অস্তিত্ব টিকে রয়েছে। তাই , ধর্মঠাকুরকে তিনি মূলতঃ ''প্রাগার্য সূর্য - দেবতা ''[৫৪] -র পাশাপাশি ''ডোম জাতিরই দেবতা''[৫৫] বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর কারণ হিসেবে আশুতোষ ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন যে, পশ্চিম বঙ্গ তথা রাঢ়ের অতি প্রাচীন অধিবাসী ডোম জাতি হিন্দু ও বৌদ্ধদের এদেশে আগমনের পূর্ব থেকেই তাদের নামে এই সূর্যদেবতার পূজা করে আসছিল। বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবিত যুগে তাদের সেই ' আদি নাম ' এর একটি বৌদ্ধ ব' হিন্দুরূপ দেওয়ার প্রয়াস স্বরূপ বর্তমানে তা 'ধর্ম ' বা ধর্মঠাকুরে রূপান্তরিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ধর্মঠাকুরের যে নানা রকম স্থানীয় নাম ব্যবহৃত হয়, তাতে সর্বদাই 'রায়' শব্দটি সংযুক্ত থাকে ; যেমন - কালু রায়, বাঁকুড়া রায়, বুড়া রায় ইত্যাদি। ' রায় ' শব্দটি ' রাজ ' শব্দ থেকে এসেছে এবং সম্ভবত হিন্দু প্রভাবের যুগেই ধর্মঠাকুরের স্থানীয় নামের সঙ্গে তা সংযুক্ত হয়েছে। মূলতঃ ডোম জাতির পূজিত দেবতা বলে রাঢ় অঞ্চলে নবাগত বৌদ্ধ ও হিন্দু অধিবাসীগণ মনে হয় এই দেবতাকে ' ডোম রায় ' বলেই ডাকত। ' ডোম রায় ' হিন্দু প্রভাবের যুগে ধ্বনিতত্ত্বের (Phonology) সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী প্রথমত বর্ণ বিপর্যয়ে এবং দ্বিতীয়ত সংস্কৃতকরণ (Sanskritisation) নীতি দ্বারা 'ধর্ম' কথাটিতে এই ভাবে রূপান্তরিত হয়ে থাকবে ; যেমন , ডোম রায় - ডোমরা Domra > ডোমরা < ডোরম - ধর্ম।[৫৬] বুঝা যাচ্ছে-বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রভাবিত যুগে রাঢ়ে প্রচলিত সূর্য দেবতা (তাদের কর্তৃক ডোম রায় বলে আখ্যায়িত)- এর সঙ্গে সম্পর্কিত অনার্য নামটির বদলে ধর্ম কথাটির ব্যাপক প্রচলন হয় - কারণ এক অর্থে ধর্ম হচ্ছেন বুদ্ধ, আবার হিন্দু পুরাণ অনুসারে ধর্ম হচ্ছেন যম। এরপর ধর্ম নামটিকে বৌদ্ধ সমাজ বুদ্ধ এবং হিন্দু সমাজ যম রূপে কল্পনা করতে থাকে। 'ক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম যখন হিন্দু ধর্মের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিল, তখন ধর্মঠাকুরের বুদ্ধ পরিকল্পনাও হিন্দু - পরিকল্পনার মধ্যে আসিয়া সংমিশ্রণ লাভ করিল ; সেইজন্য ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্তৃক বিষ্ণু কিংবা যম বলিয়া কল্পিত হইয়াও নিরঞ্জন বলিয়া অভিহিত হন।''[৫৭]

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মঠাকুর বাংলার নিম্নতর তথা আর্যেতর সমাজে অনেক আগে থেকেই স্থায়ী আসন লাভ করেন তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। ধর্মপূজার মধ্যে সূর্যোপাসনার তিনটি ধারার (আদিম, বৈদিক ও পারসিক) সংমিশ্রণ হয়েছে।[৫৮] ডোম জাতির ' পরমেশ্বর' সূর্য, বৌদ্ধ নিরঞ্জন ও হিন্দু বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন কল্পিত হলেও ধর্মঠাকুরকে বুদ্ধ কিংবা বিষ্ণু বলে দাবী করা ঠিক হবে না। গবেষকদের ধারণা - '' খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীতে ধর্ম ঠাকুরের পূজা হিন্দু সমাজে গৃহীত হয়েছিল।''[৫৯] হিন্দু সমাজে গৃহীত হবার পর আস্তে আস্তে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরাও (ডোম পুরোহিতদের পাশাপাশি) ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজের পূজায় অংশ নিতে শুরু করেন।

ধর্মঠাকুরের অনেক স্থানীয় নাম রয়েছে, যেমন - যাত্রাসিদ্ধি রায়, স্বরূপ রায়, বাঁকা রায়, চাঁদ রায়, ক্ষুদি রায়, সুন্দর রায়, কালু রায়, স্বরূপ নারায়ণ, বৃহদাক্ষ, মতিলাল, পুরন্দর ইত্যাদি। অন্য কোন লৌকিক দেবতারই এত বেশি নাম দেখা যায় না ; সে দিক থেকেও লৌকিক দেবতা শ্রেষ্ঠ হিসেবে ধর্ম ঠাকুরকে গ্রহণ করা যায়। গুপ্ত যুগে ব্রাহ্মণরা বাংলার অনেক প্রসিদ্ধ তথা জনপ্রিয় আশাস্থানীয় দেবতাদের যেমন- বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি এবং ঐরূপ দেবীদের যেমন - কালী, দুর্গা, পৌরাণিক চণ্ডী ইত্যাদির আকারভেদ বা সন্তান বলে প্রচারের মাধ্যমে যেভাবে আভিজাত্য প্রদান করেছেন, অনুরূপভাবে ধর্মপূজার প্রাধান্যকালে এঁর ভক্তরা পল্লী অঞ্চলে পূজিত বিভিন্ন লৌকিক দেবতাদের ধর্মঠাকুর এবং লৌকিক দেবীদের ধর্মঠাকুরের শক্তি বা কামিন্যা বলে প্রচার করতে থাকেন। সম্ভবত এই সময়েই মনসাদেবী ' ধর্মের কামিন্যা ' বলে প্রচারিত হন।[৬০]

ধর্মের কামিনী বা কামিন্যা মনসা - এই পৌরাণিক পরিকল্পনা বিশেষ করে রাঢ়ের জনজীবনে যথেষ্ট প্রভাব সঞ্চার করে। নাথপন্থী যোগীরা তাঁদের পুরাতন ছড়ায় আদ্যদেব ধর্মঠাকুর (নিরঞ্জন) - এর সাথে মনসার নাম উল্লেখ করেছেন এভাবে - '' মাতা হামারী মনসা বোলিয়ে / পিতা বোলিয়ে নিরঞ্জন নিরাকার।।''[৬১] কবি জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল কাব্যেও কে ধর্মের পত্নীরূপে মনসাদেবী দেখতে পাওয়া যায় -

'' গোসাঞি মনসায়ে বিভা ত্রিভুবনে জানি।
দেবাসুর নর তবে করে জয় ধ্বনি ।।''[৬২]

Dhaka University Institutional Repository

মনসামঙ্গল কাব্যে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যসমূহে ধর্মঠাকুরের উপস্থিতি চোখে পড়ার মত। উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গলের পথিকৃৎ খ্রীস্টীয় ষোল শতকের কবি তন্তুবিভূতির কাব্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করেই পরবর্তী কালে ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার সূচনা ঘটে - অনেক গবেষক এরকম অনুমান করেছেন।

ক্ষেত্রপাল। খ্রীস্টীয় শতকের প্রথম দিকে উত্তর - ভারতীয় দশ নামী শৈব সন্ন্যাসীরা এদেশে এসে তাঁদের ধর্ম প্রচার কেন্দ্র তথা শিবতীর্থ যখন তারকেশ্বরে প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁরা এখানকার পল্লী এলাকায় যে সমস্ত লৌকিক দেবতা দেখেন তাঁদের মধ্যে ক্ষেত্রপাল অন্যতম।[৬৩] গবেষকদের ধারণা, পনরদশ - ষোড়শ শতকের দিকে এদেশে ক্ষেত্রপালের পূজার প্রচলন ছিল।[৬৪] সেসময়ে তিনি বিশেষ জনপ্রিয় দেবতা রূপে সম্ভবত '' কৃষক কুলের দ্বারা পূজিত হতেন।''[৬৫]

কোন কোন মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত ক্ষেত্রপালের বন্দনা থেকে অনুমিত হয় যে, '' ক্ষেত্রপাল একজন নন, তিনি বিভিন্ন আকৃতি বা মূর্তিতে বিভিন্ন দেশের সকল দিক রক্ষা করেন।''[৬৬] অর্থাৎ, ক্ষেত্রপাল হচ্ছেন একজন দিকপাল দেবতা । বৌদ্ধ যুগে, মহাযানী বৌদ্ধরা এ দেশের কতিপয় প্রসিদ্ধ লৌকিক দেবতাকে তাঁদের দেবকুলভুক্ত করেছিলেন ; তাঁদের মধ্যে ক্ষেত্রপালও রয়েছেন।[৬৭] এ থেকে তাঁর প্রাচীনত্ব তথা প্রসিদ্ধির দৃঢ়তর অবস্থানই অনুমিত হয়। এক কালে যথেষ্ট প্রচলন থাকলেও বর্তমানে ক্ষেত্রপালের পূজার প্রচলন নেই বললেই চলে।

মনসামঙ্গল কাব্যে ক্ষেত্রপালের উপস্থিতি খুব একটা উজ্জ্বল নয়। তবে দু' একজনের কাব্যে (শ্রীধর বিনোদ প্রমুখ) তাঁর উপস্থিতি সহজেই নজর কাড়ে।

নেতা । নেতা পুরাণ-বহির্ভূত লৌকিক চরিত্র ও দেবী। তাঁকে দেবী বলা হচ্ছে এজন্যে যে, মনসামঙ্গল কাব্যে তাঁকে শুধু দেবী মনসার সহচরী রূপেই নয় , বরং তাঁর একজন নির্ভরযোগ্য পরামর্শদাত্রী হিসেবেই বেশি দেখা যায়। এছাড়াও নেতা স্বর্গের দেবতাদের ধোপানী, তাঁদের কাপড় - চোপড় ধুয়ে দেন ; এথেকেও তাঁর দেব- প্রভাব প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নেতা অপৌরাণিক চরিত্র ও প্রচলিত লৌকিক দেবতাগোষ্ঠীরও অন্তর্ভুক্ত নন বলে তাঁর উৎপত্তির ইতিহাস বের করা বেশ কষ্টকর। গবেষকরা অনুমান করেন, মনসামঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে দুটি পৃথক লৌকিক কাহিননীর ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে - (১) শঙ্কর গারুড়ী - নেতার কাহিনী ও (২) চাঁদ সদাগর - বেহুলার কাহিনী।৬৮

এক সময় উপমহাদেশে বৈদিক দেবতাদের প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে কিছু কিছু নতুন দেবতার অভ্যুদয় ঘটে, যাঁরা পৌরাণিক দেবতা হিসেবে পরিচিত। এই পৌরাণিক দেবতারা যখন বৈদিক দেবতাদের মতই শ্রদ্ধা এবং পূজা পেতে আরম্ভ করলেন তখনও উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানীয় বিশ্বাসসৃষ্ট দেবতার উদ্ভব হওয়া অব্যাহত থাকে। আবার কোথাও কোথাও পৌরাণিক দেবতাদের অবয়বে স্থানীয় বিশ্বাসের প্রলেপ দিয়ে নতুন দেবতার কল্পনা করা হতে থাকে, যাঁরা লৌকিক দেবতা নামে আখ্যায়িত হন। এই লৌকিক এবং স্থানীয় দেবতারাও পৌরাণিক দেবতাদের মতই সম্মান এবং পূজা লাভ করতে থাকেন। মনসামঙ্গল কাব্য সাধারণত এক মাস ধরে গীত হবার জন্যে লিখিত হত। তাই এই গেয় কাব্যের মৌলিক কাহিনীগুলোর মধ্যে নির্বিচারে পৌরাণিক কাহিনী সংযুক্ত হতে থাকে, সুদীর্ঘ একমাস কাল পূর্ণ করার প্রয়োজনে। অবশ্য প্রাচীনতম মনসামঙ্গল কাব্যের ধারাটা পরবর্তী কালে চন্ডী-মঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যেও অনুসৃত হয়েছে। সেজন্য মঙ্গলকাব্যের উপস্থাপনা পদ্ধতিতে পৌরাণিক চেতনা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ দেবদেবীর প্রশস্তিমূলক কাব্য (যেমন মনসাদেবীর প্রশস্তিমূলক মনসামঙ্গল ইত্যাদি) হলেও এর মধ্যে পুরাণের বিভিন্ন প্রকার দেবতা বন্দনা দৃষ্ট হয়। পুরাণের অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে সর্গ বা সৃষ্টিতত্ত্ব, যা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ন্যায় মনসামঙ্গলেও কাব্যের প্রাককথন হিসেবে সৃষ্টির বিবর্তন আলোচিত হয়েছে। এ পর্যায়ে সৃষ্টির আদিরূপ, প্রজাপতির প্রজাসৃষ্টি, দক্ষের শিবহীন যজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, পার্বতীর কঠোর তপস্যা, মদন ভস্ম, রতির বিলাপ, পার্বতীর বিবাহ, শিব-পার্বতীর সংসার জীবন প্রভৃতি পৌরাণিক বিষয় স্থান পেয়েছে। মূল কাহিনীর সাথে এগুলোর সংযোগ না থাকলেও পৌরাণিক আবহ সৃষ্টি করতে কাঙ্ক্ষিত দেবতার আগমন পথকে মসৃণ করাই ছিল এর আসল উদ্দেশ্য। অবশ্য সে সময় অলৌকিক কাহিনী ছাড়া কোন উচ্চ শ্রেণীর কাব্য রচনা করা অসম্ভব ছিল। এ কারণেই বেহুলা - লখিন্দরের মানবীয় কাহিনীর আকর্ষণ ছাড়া "মনসামঙ্গল অলৌকিক উপাখ্যানের দুর্ভেদ্য অরণ্য"৬৯ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে, যদিও এর মৌলিক কাহিনী অলৌকিকতা-বর্জিত মানবিক কাহিনীমাত্রই ছিল। আর অলৌকিক উপাখ্যানের দুর্ভেদ্য অরণ্য হওয়ার কারণে মনসামঙ্গল কাব্যে বিভিন্ন প্রকার দেবদেবীসহ অনেক পৌরাণিক, অতিলৌকিক,

Dhaka University Institutional Repository

অলৌকিক প্রভৃতি ঘটনা এসে ভিড় জমিয়েছে। পূর্বেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে - অত্র কাব্যের কেন্দ্রীয় দেবী মনসার স্বরূপ নির্ধারণের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট দেবদেবীরা এখানে প্রয়োজনমত আনাগোনা করবেন। তাই দুর্ভেদ্য অরণ্যে প্রবেশ করে পথ হারানোর ঝুঁকি না নিয়ে পরিচিত পথে পদচারণা করাই অধিকতর শ্রেয়।

''মঙ্গলকাব্যের বাইরের ছাঁচটা পৌরাণিক, কিন্তু তার অন্তর সম্পদ মানবিক।''[৭০] বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্ভব, ঘর-সংসার, দ্বন্দ্ব ও প্রাধান্য লাভের আখ্যায়িকা মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য - এ হচ্ছে বাহ্যিক ব্যাপার। কিন্তু, এই বাহ্যিক আবরণের মধ্যে যে কাহিনী বিবৃত হয়েছে, তা একান্তভাবে মানবিক ; এবং বিভিন্ন দেবদেবীর মধ্যে যে পারস্পরিক কলহ ও শক্তির দ্বন্দ্ব - সেটাও সংঘটিত হয়েছে এই মানবিক পটভূমিতেই। মানুষের পরিকল্পিত দেবতা মানুষেরই প্রতিবিম্ব সদৃশ, তাই তাদের স্বভাব-প্রকৃতি - ব্যবহার ইত্যাদি স্থান-কাল বিধৃত যে কোন সামাজিক মানুষের মত। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে গুণ বা বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তি দেখা যায় সেটাই দেবতাতেও আরোপিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য শাখার মত মনসামঙ্গলকাব্যেও দেবতাকে মানুষের মতই দোষ-গুণের , ভাল মন্দের অধিকারী করে চিত্রিত করা, অথবা ব্যবহারিক বাস্তব জগতের সীমার মধ্যে অলৌকিক -শক্তিকে আকৃষ্ট করার এই যে প্রয়াস, তা মানুষের চিন্তা - চেতনার উৎকর্ষতার বিবর্তনের এক উল্লেখযোগ্য স্তর। কেননা, প্রথমে অলীক অলৌকিক দেবদেবী পরিকল্পনা এবং পরে মিশ্রিত অলৌকিক মানবিক বিশ্বের বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে মানুষের অন্তর ও দৃষ্টি কালক্রমে পরিপূর্ণ মানবিক জগতের দিকে ধাবিত হতে থাকে।

বঙ্গদেশে আর্য সভ্যতা স্থাপিত হবার পূর্বে সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের অনেকটা কাছাকাছি ধর্মবিশ্বাস দেখা যায় মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে । মানব মনের একটি আদিম বৃত্তি ভয় - মানব সভ্যতার ঊষালগ্নেও সর্ব প্রথম ভয় থেকেই দেবতার পরিকল্পনা করা হয়েছিল - অনেক গবেষকই এটা মনে করেন। বাংলার প্রাচীনতম দেব-পরিকল্পনাও এদেশের প্রাগৈতিহাসিক আদিম সমাজের এই প্রবৃত্তি থেকেই উদ্ভাবিত হয়েছে। উন্নত আর্য সমাজ কর্তৃক পরিকল্পিত দেবতাগণের পরম কারুণিক মঙ্গলাদর্শ মঙ্গলকাব্যের নিম্নতর সমাজের এই অনুদার ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি দ্বারা যথার্থভাবে অনুভব করা যায়নি। তাই অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ন্যায় মনসামঙ্গলের দেবতাও নীচ, স্বার্থপর, ক্রূর, প্রতিহিংসাপরায়ণ, কৃতঘ্ন ও ছলনাময়। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায়- ভক্তিতে ভক্তের মাথা আপনা থেকে কখনো নত হয় না, তাঁর মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে কেউ তাঁর শরণাপন্ন হয় না , শুধু তাঁর অহেতুক নিগ্রহের আক্রমণ থেকে বাঁচার তাগিদে

Dhaka University Institutional Repository

ভয়ে তাঁর নামোচ্চারণ করে মাত্র। মনসামঙ্গলের মনসা একান্ত অনিচ্ছুক ভক্তের কাছ থেকে এক প্রকার জোরের মাধ্যমে পূজা আদায় করে তারপর ছেড়েছেন - স্বেচ্ছায় ভক্তি-পরায়ণ হয়ে তেমন কেউ তাঁর পূজা করেনি। বাংলার লৌকিক ধর্মের উপর একটা পৌরাণিক আভিজাত্যের প্রলেপ দেওয়া মঙ্গলকাব্য গুলোর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। মঙ্গলকাব্য তথা মনসামঙ্গলকাব্যে বর্ণিত দেবচরিত্রের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পৌরাণিক দেবদেবীর চরিত্রের মৌলিক পার্থক্যের কারণেই এই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। লৌকিক দেবতাদের মধ্যে শিব সবচেয়ে প্রাচীন। এর কারণ, পৌরাণিক দেবদেবীদের মধ্যে শিবকেই সবার আগে বাংলার লৌকিক ধর্মমতগুলোর প্রত্যক্ষ সন্নিধানে আসতে হয়।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অবসানের পর হিন্দুধর্মের পুররুত্থানের যুগে দেশের সাধারণ সমাজ হিন্দু পৌরাণিক শিব চরিত্রকে নিজেদের জাতীয় আদর্শ রূপে পুনর্গঠিত করে নেয়। তার ফলে এদেশে শিব-চরিত্রের পুরাণ - বহির্ভূত এক অভিনব পরিচয় ফুটে ওঠে। শিব বাঙালীর নিজস্ব সৃষ্টি, সম্পূর্ণ আভিজাত্য -বহির্ভূত বাংলার কৃষকের ঘরের লৌকিক দেবতা। বাংলার লোক সাহিত্যেও এই শিবের চরিত্র নিতান্ত সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন গ্রাম্য কবির স্থূল অবিষ্কার। বিভিন্ন কাব্যে বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যে শিবকে আহ্বান করা হয়েছে মনে হয় এজন্যেই যে, বাঙালীর জাতীয় জীবনের সংঘর্ষ ও শান্তি যেমনভাবে শিব চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনটি অন্য কোথাও হয়নি। সেজন্য সব কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্রের (দেবতার) সাথে তাঁর একটা আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। যেমন - মনসামঙ্গলের মনসা শিবের কন্যা, চন্ডীমঙ্গলের চন্ডী শিবের স্ত্রী ইত্যাদি। কোন কোন মঙ্গলকাব্যের মত মনসামঙ্গলকাব্যেও শিবের উপর পৌরাণিক প্রভাব আরোপিত হয়েছে। কিন্তু এতে শিবের পৌরাণিক ও লৌকিক চরিত্রের মধ্যে যে শুধু মাত্র সামঞ্জস্যের অভাব দেখা দিয়েছে, তাই নয় - জাতীয় আদর্শের কাছে পৌরাণিক আদর্শ ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে। শৈব ধর্ম যখন বাংলার স্থিতিশীল নিরুপদ্রব সমাজের উপর নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করবার উপযুক্ত সুযোগ পেয়েছিল তখনই এদেশের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে এক বিশৃঙ্খলা এসে উপস্থিত হয়েছিল।

খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথম থেকেই সম্পূর্ণ ভাবে বাংলার সমাজে নতুন করে শাক্তধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে। একমাত্র বাংলায় সমসাময়িক লৌকিক শাক্তধর্মের আদর্শই যে এতে প্রভাবিত হয়েছে, তা নয় এমনই সহায়হীন এবং শক্তিহীন সমাজ নিজেদের পরাজয়ের কলংক থেকে মুক্তির আশায় অদৃশ্য

Dhaka University Institutional Repository

দেবতার কল্পিত ধ্বংস শক্তির উদ্বোধনের মাধ্যমে জীবনে বেঁচে থাকবার সাধনা করে। এই কল্পিত ধ্বংসশক্তি সমন্বিত অদৃশ্য দেবতাদের অন্যতম প্রধান হচ্ছেন মনসা। তাঁর মাহাত্ম্য-কীর্তন করাই মনসামঙ্গলকাব্য রচনার উদ্দেশ্য । সমাজে সর্পপূজা আশ্রয় করেই এই জাতীয় সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। সেজন্যে, সমাজে সর্পদেবতার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে মনসামঙ্গলকাব্যের ইতিহাস জড়িয়ে আছে।

উপমহাদেশে সর্পপূজার উদ্ভব প্রসঙ্গে গবেষকদের মধ্যে মতভেদের শেষ নেই। পাশ্চাত্য পন্ডিত জে. ফার্গুসন তাঁর Tree and Serpent Worship নামক বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ''সর্পপূজা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের বাহিরে তুরাণীয় জাতির মধ্যে উদ্ভূত হয় ; অতঃপর তুরাণীয় জাতি ভারতের উত্তর পশ্চিম পথে এদেশে প্রবেশ করিয়া সর্পপূজা প্রবর্তিত করে, - সর্পপূজার সঙ্গে আর্যজাতির মৌলিক কোন সম্পর্ক ছিল না। আর্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়া তুরাণী জাতির নিকট হইতে এই সর্পপূজা শিক্ষা লাভ করে।''[৭১] প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারে নাগ ও সাপ একার্থবাচক শব্দ ছিল না বলেই অনুমিত হয়। নাগ বলতে সম্ভবত গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ এই শ্রেণীর কোন উপজাতিকে এবং সাপ বলতে প্রকৃত প্রাণীকে ইঙ্গিত করতো। আর্যেতর সমাজের মধ্যে সর্পপূজার প্রচলন থাকলেও প্রথম দিকে এর সঙ্গে আর্যসমাজের কোন রকম সম্পর্ক ছিল না। মহাভারতের মধ্যে নাগ একটি জাতি, যারা আর্যবিরোধী- আর্যদের সাথে সর্বক্ষণ সংগ্রামে লিপ্ত । এরা তখনও সমাজে দেবতা হিসেবে পূজা পেতে শুরু করেনি। এর পরবর্তী সময়ে আর্যেতর সমাজ থেকে জীবিত সর্পপূজার স্বতন্ত্র ধারাটি , সম্ভবত নাগ ও সর্প এই দুটি শব্দের অর্থ - সাদৃশ্যের কারণে নাগজাতির ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে যায়। তখন থেকেই মহাভারতোক্ত নাগজাতির অধিপতি বাসুকি সর্পরাজ হিসেবে পূজা পেতে শুরু করেন। সর্পগণের রাজা বাসুকি এবং নাগগণের রাজা অনন্ত বা শেষ নাগ । সম্ভবত নাগ ও সর্প এই দুটি শব্দের অর্থ-সাদৃশ্য ঘটার পরে পুরাণে[৭২] বাসুকি এবং অনন্ত (শেষ নাগ) অভিন্ন হয়ে যান।

এই উপমহাদেশে প্রচলিত জীবিত সর্পের পূজার একটি আদর্শ নাগপূজার সাথে পরবর্তী সময়ে মিশেছে বলেই এখন পর্যন্ত অত্র অঞ্চলের ধর্মসংস্কারের মধ্যে নাগপূজা এবং সর্পপূজা - এই দুটি আলাদা ধারার অস্তিত্ব অনুভূত হয়। প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্কর্যে এক দিকে নরনারীরূপ নাগনাগিনীমূর্তি এবং অন্যদিকে সরীসৃপরূপ সর্পমূর্তি - এই উভয়েরই অস্তিত্বের সম্ভবত এটাই কারণ। আবার, কোন কোন গবেষক অনুমান করেছেন যে, নাগ বলতে ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত বিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

করে তক্ষশীলা এলাকার এক জাতির লোককে বুঝায়। তারা সর্প ফণাকে জীবক (totem হিসেবে ব্যবহার করার কারণেই নাগ বলে পরিচিতি লাভ করে।

প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্য ঋগবেদের মধ্যে সর্পের উল্লেখ থাকলেও সর্পপূজার উল্লেখ নেই।[৭৩] প্রাক্-মহাভারতীয় কালে সর্প এবং নাগের মধ্যে পরিষ্কার ব্যবধান সবস্থানে পরিলক্ষিত হয়, যদিও বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী সময়ের সাহিত্যে নাগের তেমন একটা সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও সে সময় পর্যন্ত সরীসৃপ অর্থে নাগ শব্দের ব্যবহারের প্রচলন ছিল না। মহাভারতের মধ্যেই সর্ব প্রথম নাগ জাতির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। মনে হয় সর্পপূজক হিসেবে তারা সর্পের কোন অভিজ্ঞানধারী ছিল, কালক্রমে তারা সর্পের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন হয়ে যায়। সর্পপূজক থাকাবস্থাতেই তাদের উপর সর্প-চরিত্রে সমস্ত বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয়। সর্প মাটিতে গর্ত করে বাস করে বলে নাগজাতিকে পাতালের অধিবাসী বলে আখ্যায়িত করা হয়। নাগজাতি আকৃতি-প্রকৃতিতে আর্য ভাষাভাষী জাতি থেকে মনে হয় ভিন্ন ধরনের ছিল। কিন্তু মহাভারতে দেখা যায় তারা আর্যবংশ-সম্ভূত-তাদের পিতা কশ্যপ মুনি ও মাতা কদ্রু বলে উল্লেখিত হয়েছে। মহাভারতের পরবর্তী সময় থেকেই নাগ ও সর্প কখনও ভিন্ন, কখনও অভিন্ন হয়ে দেখা দিতে শুরু করে। অত্র অন্চলের বৌদ্ধ সাহিত্য এবং অন্যান্য কথা সাহিত্যেও নাগ ও সর্প বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

মনসামঙ্গলে মনসা শিবের কন্যা হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন । অবশ্য কবিগণ পুরাণের ধারাকেও যথাসম্ভব ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। এক অলৌকিক উপায়ে শিব-বীর্যে মনসার জন্ম হয়। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে, জালুয়া ডোমের স্ত্রী গৌরীর খেয়া পার হওয়ার সময় তাকে দেখে চিত্তচান্চল্যের মাঝে পুষ্পবনে প্রবেশ করে মকরকেতনের পুষ্পশরে শিবের অন্তঃকরণ বিদ্ধ হল। তখন

" কামেতে হইল ভোল শ্রীফল গাছে ছিল কোল
আচম্বিতে খসে মহারস।।"[৭৪]

শিব নিজের তেজ পদ্মপত্রে সংরক্ষণ করার পর এক পাখি সেই তেজ গলাধঃকরণ করলো। কিন্তু অনলসম তেজ ধারণে ব্যর্থ হয়ে সে তা পদ্মবনে পরিত্যাগ করলো। অতঃপর শিবতেজ পদ্মের মৃণাল বেয়ে পাতালপুরে প্রবেশ করল

"প্রবেশিল পাতাল পুরী জন্মিল নাগিনী নারী

Dhaka University Institutional Repository

দেবকন্যা সোন্দর দেখিল।।"[৭৫]

নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে চন্ডীই ডোমনী বেশ ধরে কামরসে মত্তা হয়েছিলেন। পরে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করত অন্তর্হিতা হয়েছিলেন। পুনরায় কালিদহের তীরে চন্ডীই বিল্ববৃক্ষ হয়েছিলেন। বিল্বফলযুগল দেখে শিব হলেন মদনাহত। পরে মনসার জন্মকাহিনী প্রায় একই রকম। সেখানে পাতালে শিবতেজ যাওয়ার পর নাগরাজ বাসুকি নির্মালি (মূর্তি নির্মাতা কারিগর) ডেকে তাকে দিয়ে মনসার দেহ তৈরী করিয়েছিলেন।

"বাসুকি কোলে নির্ম্মালি সুন হে উত্তর।
মহাদেবের বির্য্যে কন্যা গোটা নির্ম্মাণ কর।।
চারিখান হস্ত দেহ তিন নএ্যান।
সিবের লক্ষণ করি করহ নির্ম্মাণ।।
এত সুনি নির্ম্মালি হুঙ্কার মারিল।
ততক্ষণে পদ্মাবতি নির্ম্মাণ হইল।।"[৭৬]

নারায়ণ দেবের কাব্য অনুসারে বাসুকি ধ্যানে জেনে শিবের আকার অনুসারে মনসার কায়া নির্মাণ করালেন। মনসা চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না। মনসার এই জন্ম বৃত্তান্তের সাথে মহাভারতে-পুরাণে বর্ণিত শিবতেজে কার্তিকেয়ের জন্ম কাহিনীর মিল পরিলক্ষিত হয়।[৭৭]

বিপ্রদাস পিপলাইয়ের কাব্যেও মনসার জন্মকাহিনী প্রায় একই রকম। আবার কবি শ্রীরায় বিনোদ তাঁর কাব্যে মনসার জন্মবৃত্তান্তে পৌরাণিক ধারাটিকে যথাসম্ভব ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। এখানে কশ্যাপ মহামুনি কর্তৃক মনসা গঠিত হয়ে পরে রুদ্র কর্তৃক লালিত - পালিত হন।

"আসিছে শিবের চন্দ্র রসাতল পুরী।।
* * *
চন্দ্র সমুখে থুইয়া কশ্যপ মহামুনি
সংকল্প করিয়া কৈলা চারি বেদধ্বনি।।
সেহি চন্দ্রে হৈল মাংস পিন্ডের আকার।
দেখিয়া সকল মুনি আনন্দ অপার।।
উচ্চস্বরে করে মুনি চারি বেদধ্বনি।

Dhaka University Institutional Repository

চারিহস্ত ত্রিলোচন হৈল কন্যা খানি।।
শুভক্ষণে শুভলগ্নে জন্মিলা ব্রহ্মাণী।।''[৭৮]

এরপর -

''কদ্রু বনিতায় আনি বোলে তপোধন।
কদ্রু স্থানে পদ্মাবতী কৈলা সমর্পণ।।
বংশরক্ষা হৈবে তোর এহি কন্যা হনে।
প্রাণসম করি কন্যা পালিও জতনে।।

* * *

ছয় মাস পূর্ণ হৈল দেখি তপোধন।
বেদবিধানে কৈলা অষ্টনামকরণ।।

* * *

অষ্টনাম থুইলা জে কশ্যপ তপোধন।
প্রাণসম করি কন্যা করএ পালন।।''[৭৯]

মনসাদেবীর নামকরণের ক্ষেত্রেও কবিরা তাঁদের কাব্যে পৌরাণিক ঐতিহ্যটি রক্ষা করে চলেছেন।

''প্রথমে প্রধান নাম ধরে বিষ হরি।
দ্বিতীয়ে মনসা নাম ধরে জগৎ গৌরী।।
তৃতীয়ে ধরিলা নাম দেবী পদ্মাবতী।
পাতালে নাগিনী নাম হইল উৎপত্তি।।
আদ্যাশক্তি নিদ্রা হনে হৈলা অবতার।
স্তন্য দিলা কদ্রুয়ে জননী ব্যবহার।।
নাগমাতা কদ্রু হৈলা কশ্যপ বনিতা।
এই হেতু কদ্রু হৈলা মনসার মাতা।।''[৮০]

পৌরাণিক কাহিনী গ্রহণ করে কবিরা সুন্দরভাবে লৌকিক দেবী শিবকন্যা পদ্মা বা মনসার স্বরূপকে প্রকাশ করেছেন।

''সকল নাগে আসিয়া নামাইল মাথা।
আইজ হইতে বিসহরি সকল নাগের মাতা।।[৮১]

Dhaka University Institutional Repository

"নাগরাজা বোলে শুন দেবী পদ্মাবতী।
নাগ-বিষ রক্ষা হেতু তোমার উৎপত্তি।।
নাগ-বিষ পালন কর জয় ব্রহ্মাণী।
হরষিত পদ্মা বাসুকির কথা শুনি।।

* * *

পদ্মা বোলে অখনে বিদায় দেও ভাই।
বাপ মোর দেখি গিয়া ত্রিলোক্য - গোসাঞি।।
নাগরাজা বোলে তবে জোড় করি কর।
শুভক্ষণে দেখ গিয়া পিতা মহেশ্বর।।

০ ০ ০ ০

হরের বনিতা আছেন দেবী ভবানী।
তাহার সঙ্গে কিমতে রহিবা ব্রহ্মাণী।।
অতি বড় ক্রোধী দেবী জানে ত্রিভুবনে।
কিমতে থাকিবা পদ্মা তুমি তান সনে।।
শিশুকাল দেবী তোমার বুদ্ধি চঞ্চল ।
তাহান সঙ্গে থাকিতে বড়ই দুষ্কর।।

* * *

মহাজ্ঞান কহিলেন নাগের রাজন।
মন্ত্রের মাহিত্য কহি শুনহ বচন।।
মারিয়া জীয়াইতে পারিবা বিষহরী।।
আজি হৈতে হৈলা তুমি বিষ-অধিকারী।।
এহি মহাজ্ঞান দেবী জগতের সার।
তোমারে জিনিতে পারে শক্তি আছে কার।।
আজি হৈতে হৈলা তুমি জগতে পূজিত।
অখনে চলিয়া জাও কিছু নাহি ভীত।।"[৮১]

Dhaka University Institutional Repository

এয়োদশ শতকে বাঙলায় বৈদেশিক বিজয়ের পরে খুব স্বাভাবিকভাবেই সমাজের উচ্চ শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির উপরে একটি প্রচন্ড আঘাত লেগেছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উপরে আঘাতের সুযোগ নিয়ে লৌকিক ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্য নিদ্রা ভেঙ্গে জেগে উঠার সুযোগ লাভ করল। সেই সুযোগে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে যে সমস্ত দেবদেবী ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ ছিলেন, নিম্নস্তরের মধ্যে থেকে অখ্যাত, অবজ্ঞাত ছিলেন তাঁরাও ধীরে ধীরে উপরের স্তরে ভেসে উঠে যতটা সম্ভব প্রসারিত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগের অধিকারী হলেন। পাশাপাশি এই সব দেবদেবীকে অবলম্বনের মাধ্যমে সমাজে যে সমস্ত কিংবদন্তী ও লৌকিক কাহিনী গড়ে উঠেছিল তাহাও ভাষা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে শুরু করল। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে এই ধরনের লৌকিক দেবদেবীদের পদচারণাই চোখে পড়ে , যার শুরু খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতক থেকে।

নব প্রতিষ্ঠিতা দেবী মনসাকে কিভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, বিশেষ করে চন্ডীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে-সেটাই বাসুকি কর্তৃক মনসার অভিষেক কালে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। পুরাণের কিছুটা অনুসৃতি থাকলেও মূলতঃ লৌকিক আদলেই তা পরিকল্পিত হয়েছে। তাই হিসেবে কল্পিত বাসুকি বোন মনসার অমঙ্গল আশঙ্কায় বিশেষ করে সৎমা চন্ডী তথা ভবানীর কথা চিন্তা করে তাঁকে 'মহাজ্ঞান' দিয়ে দিচ্ছেন যাতে তাঁর প্রতিষ্ঠার পথ নিষ্কন্টক হয়। প্রকৃতপক্ষে এটাকে রূপকার্থে গ্রহণ করাই শ্রেয়। শিব-চন্ডীকে অপসারিত করে মনসার প্রবল প্রতাপে আসরে প্রবেশ করার সংকেত ধ্বনি এটি। যা হোক, মনসাদেবীর অভিষেক শেষে বাসুকি তাঁকে তাঁর পিতা শিব সন্দর্শনে পদ্মবনে বা কমলবনে পাঠিয়ে দিলেন পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থাসহ।

"নাগগণে পদ্মাবতী সঙ্গে করি দিয়া।
শিবের নিকটে পদ্মা দিল পাঠাইয়া।।"[৮৩]

এদিকে পদ্মবনে মনসার অপরূপ দেখে শিব আকুল হয়ে বলতে থাকেন,

"শিব বলে মোর বাক্য শুনহ সুন্দরী।
কোথা হৈতে আসিয়াছ কাহার কুমারী।।
তোর রূপ দেখি মোর দহে কলেবর।
আলিঙ্গন দিয়া মোর প্রাণরক্ষা কর।।"[৮৪]

Dhaka University Institutional Repository

শিবের এহেন অনুচিত কথা শ্রবণে দুঃখিত অন্তরে পিতার চরণ ধরে মনসা স্তুতি করতে লাগেনঃ

"শিবের চরণ ধরি স্তুতি করে বিষহরি
কেন বাপু বল হেন বাণী।
তুমি ত না জান কি আমি ত তোমার ঝি
তুমি বাপ দেব শূলপাণি।"

* * *

যুগধ্যান মনে রাখ মনেতে ভাবিয়া দেখ
কি ধন এড়িলা পুষ্পবনে।
নামিল পাতাল ভূমি তাহাতে জন্মিল আমি
মনসা নাম রাখে দেবগণে।।"[৮৫]

মনসার স্তুতি শুনে তখন শিব তাঁকে পরীক্ষা করার অভিলাষে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করতে বললেনঃ

"সিবে বোলে জদি হও আমার কুমারি।
এহিক্ষণে মূর্ত্তি ধর দেখিয়ে তোমারি।।"[৮৬]

তখন মনসা কালবিলম্ব না করে -

"এত সুনি পদ্যাবতি অন্তরিক্ষ হইল।
জত সব নাগ লয়া সাজিতে লাগিল।।

* * *

সাজিলেক পদ্যাবতি লইয়া নাগগণ।
বাল্লিস নাগে হইল পদ্যার সাজন।।
বিস নঞানে যদি চাহিলা বিসহরি।
ঢলিয়া পড়িল সিব উর্ত্তর সিয়রি।।"[৮৭]

এভাবে পিতা শিবের মৃত্যুতে কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হয়ে মনসাদেবী কাঁদতে থাকেনঃ

"জন্ম মোর পাতালে . আইনু বাপ দেখিবারে.
বাপ মোর কৈল অপমান।
সে কারণে রাগে. সেই অনুতাপে

Dhaka University Institutional Repository

কোপদৃষ্টি করি দান।।
আমি অভাগিনী, জনম তাপিনী,
জন্মিয়া কি কাম কৈনু।
ভাল মন্দ আমি, কিছুই না জানি,
আপনার বাপেরে বধিনু।।"৮৮

এদিকে শিবের মৃত্যুতে সৃষ্টি নাশের আশঙ্কায় দেবতা, মুনিরা মিলিত হয়ে তাঁকে বাঁচানোর জন্যে মনসার স্তুতি করতে লাগলেন ঃ

"ইন্দ্র আদি চলি আইল জত দেবগণ।
নারোদ আদি চলি আইল জত মুনিগণ।।
দেবগণ মিলিয়া পদ্মারে করে স্তুতি।
কেন হেন সৃষ্টি নাস করিলা পদ্মাবতি।।
দেবগণে বোলে সুন জয় বিসহরি।
বিলম্ব না কর মাও জিয়াও ত্রীপুরারি।"৮৯

এ অবস্থায় দেবতাদের স্তুতি শুনে মনসা বা পদ্মা নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না।

"দেবগণের স্তুতি পদ্মা সুনিয়া শ্রবণে।
সত্তরে চলিয়া গেল সিবের সদনে।।
অমৃত নঅনে জদি চাহিল বিসহরি।
উঠিয়া বসিলা তবে দেব ত্রিপুরারি।।"৯০

শিব তথা দেব ত্রিপুরারির জীবন প্রাপ্তিতে দেবতারা উল্লসিত হয়ে পদ্মার উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।

"ত্রিজগত হরসিত ই তিন ভুবন।
জয় ২ স্বব্দ করি নাচে দেবগণ।
পুষ্প বিষ্টি হুলাহুলি করে দেবগণ।
বিজয়া পদ্মার নাম থুইল ততক্ষণ।।"৯১

Dhaka University Institutional Repository

এরপর কন্যার পরিচয়ে মুগ্ধ হয়ে শিবও দেবতাদের সাথে নাচতে লাগলেন।

"বাপে ঝিয়ে পরিচয়, দেবগণে জয় জয়,
অন্তরীক্ষে পুষ্প বরিষণ।
পদ্মারে লইয়া কাঁখে, নাচে শিব ঘন পাকে,
বিজয় গুপ্তের মধুর বচন।"[৯২]

খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অসংখ্য কবি মনসার ভাসান গান তথা মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ কাব্য সৃজনে নিয়োজিত ছিলেন। বাস্তব জীবনের স্থির সত্য আবেদন এবং সৃষ্টির আকুলতায় অসংখ্য কবি -মন অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল। তাঁদের রচিত কাহিনীর মধ্যে সুরের উঠানামা, ঘটনার ব্যতিক্রম, প্রকাশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, এবং তা আছেও । কিন্তু, এই ব্যতিক্রম এবং ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি মনসামঙ্গল কাব্যের আবেদন, উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন, এদের মূল উৎস একই। বিভিন্ন কবি মন এবং কল্পনাকে আশ্রয় করে একটি চলমান বিশাল জীবন যেন একই কথা উচ্চারণ করতে চেয়েছে, একই সত্যকে বাঙ্ময় করে তুলেছে। মনসামঙ্গল কাব্যের ধারা চৈতন্য-পূর্ব, চৈতন্য এবং চৈতন্যোত্তর যুগে সমান ভাবেই বয়ে চলেছে। শ্রীচৈতন্যের প্রভাব মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত মনসামঙ্গল কাব্যের উপরও পড়ল। চৈতন্য-পূর্ব যুগের মনসামঙ্গলের ভাষায় গ্রাম্যতার যে প্রভাব দেখা যায়, চৈতন্যোত্তর যুগের মনসামঙ্গলের ভাষায় সেটা পরিলক্ষিত হয় না। চৈতন্য পূর্ব যুগের মনসামঙ্গলে মনসাচরিত্রের প্রতিহিংসা গ্রহণের প্রক্রিয়াটা যেমন হিংস্র হয়ে উঠেছে, চৈতন্যোত্তর যুগের মনসামঙ্গলে সেটা বহুলাংশে প্রশমিত হয়ে এসেছে। চৈতন্য-পূর্ব যুগের মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের ব্যক্তিত্ব তেমন সুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ় হয়ে উঠতে সক্ষম হয়নি যা চৈতন্যোত্তর যুগে সম্ভব হয়েছে। অবশ্য মধ্যযুগের শেষ দিকে চাঁদ সদাগরের ব্যক্তিত্বে পুনরায় অবসাদ গ্রস্ততা ভিড় করে। প্রথম দিককার মনসামঙ্গল গুলোর চেয়ে শেষের দিককার মনসামঙ্গল গুলোতে তুলনামূলকভাবে বেশি পৌরাণিক উপাদান পরিলক্ষিত হয়। মনসামঙ্গলে মনসার পাশপাশি বিশেষ করে শিব ও চন্ডীর চরিত্রে লৌকিক ও পৌরাণিক এই দুই ধারার অপূর্ব মিশ্রণ দেখা যায়। মনসা এবং চাঁদ সদাগরের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই মনসামঙ্গলের কাব্যকাহিনী গড়ে উঠেছে ; কিন্তু বিজয় গুপ্তের কাব্যে এর একটি মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি রচিত হয়েছে, যার মাধ্যমে মনসার স্বরূপটি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

মনসার '' জন্মই আজন্ম পাপ '' । শিবের এই অবৈধ কন্যা জন্মলগ্নেই অসহায় এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন, যার জন্যে তিনি নিজে সামান্যতমও দায়ী ছিলেন না। অবৈধ বিধায় মাতৃ পরিত্যক্তা বালিকা মনসা যে কোন ভাবে পিতা শিবকে খুঁজে বের করলেন। পিতা- পুত্রীর পরিচয় পর্বটাও যে খুব একটা সুখকর হয়নি সেটা ইতোপূর্বেই লক্ষিত হয়েছে। যা হোক, স্নেহ পরবশ পিতা শিব মনসাকে সানন্দে অথচ সভয়ে গ্রহণ করলেন। সভয়ে এজন্যে যে, তাঁর স্ত্রী চন্ডীর অতীব ক্রুদ্ধ-স্বভাব ; এই বালিকাকে বাড়ি নিয়ে গেলে না জানি কি বিপত্তি ঘটে ! শিব তাঁর ফুলের ঝুড়ির মধ্যে মনসাকে লুকিয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন। পথে এক শিষ্য বচাই - এর বাড়িতে ঝুড়িটি সাময়িকভাবে রেখে তিনি স্নানে বের হয়েছিলেন। শিবের অনুপস্থিতিতে বচাই অপরিচিতা সুন্দরী কিশোরী মনসাকে দেখতে পেয়ে তাঁর উপর অন্যায় শক্তি প্রয়োগের প্রয়াস চালাল। বাচাইয়ের হীন কামুকতা থেকে বাঁচার জন্যে অনেক অনুনয় করেও যখন মনসা পার পেলেন না তখন তিনি সর্পরূপে বাচাইকে দংশন করলেন।

শিব বাড়িতে এসে ফুলের সাজি সহ মনসাকে এমনভাবে লুকিয়ে রাখলেন যাতে সেখানে চন্ডীর চোখ না পড়ে। কিন্তু চন্ডীর চোখ ঠিকই পড়ল সেই ফুলের ঝুড়ির উপর। সন্দেহ পরায়ণা চন্ডী তৎক্ষণাৎ তন্ন তন্ন করে খুঁজে মনসার অস্তিত্ব সন্ধান করলেন এবং স্থির বিশ্বাসে উপনীত হলেন যে, এই মেয়ে তাঁর সপত্নী ; তাঁর দুর্বল চরিত্র স্বামী কোথাও থেকে একে নিয়ে এসেছেন। এই চিন্তা করে চন্ডী মনসার উপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু করে দিলেন। প্রথমে অকথ্য-কুকথ্য ভাষায় গালাগালি করে এর পরে নির্মম প্রহার চলল।

''আপন ইচ্ছায় গালি দেয় কারো ভয় নয়।
মুখে গালি পাড়ে দেবী যত মনে লয়।।
খলখলি হাসে দেবী হাতে দিয়া তালি।
চাপড় চোপড় মারে দেয় চুণ কালি।।
বুকে পৃষ্ঠে মারে দেবী বজ্র চাপড়।
মারণের বায়ে পদ্মা কাঁপে থরথর।
বিপরীত ডাকে পদ্মা প্রাণে লাগে ব্যথা।
নিষ্ঠুর হইয়া মারে কার্ত্তিকের মাতা।।''[৯৩]

Dhaka University Institutional Repository

'কার্ত্তিকের মাতা ' চন্ডীর এই বিশেষণটির প্রয়োগ করে কবি শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। কিশোরী মনসার বিমাতার হাতে এই নির্যাতনের বর্ণনার সঙ্গে বিমাতা চন্ডীর মাতৃত্বের পরিচয় বহনকারী এই শব্দ দুটি দ্বারা মনসার মাতৃহারা অসহায়ত্ব এবং সন্তানের জননী চন্ডীর এক কিশোরী কন্যার উপর নির্মমতাক বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। ব্যাধের হাতে পড়লে পাখির যে অবস্থা হয়, বিমাতা চন্ডীর হাতে পড়ে মনসা বা পদ্মারও একই অবস্থার সৃষ্টি হল। পদ্মার আকুল ক্রন্দন , বিনয় বচন প্রভৃতি কোন কিছুই উন্মত্তা চন্ডীকে নিবৃত্ত করতে পারল না । পদ্মা যখন চন্ডীকে ''সৎ মা '' বলে সম্বোধন করলেন তখন চন্ডীর মধ্যে আরও তীব্র প্রতিক্রিয়া হল।

''চন্ডী বলে মোর ঠাই না রহে নারীকলা।
মোর স্বামী লবা তাই পাতিয়াছ ছলা।।
চন্ডী বলে শুন পদ্মা আমার বচন।
মোর স্বামী লোভে তুমি আসিয়াছ কি কারণ।।''[৯৪]

''ঘর-পোড়া গরুর যেমন সিঁদুরে মেঘের ভয় '', চন্ডীর মনের মধ্যে সর্বদা ''সতীন ভয় '' বিদ্যমান। তাঁর স্বামী শিব এমনি করেই তো একদিন গঙ্গাকে বিয়ে করে ঘরে তুলেছিলেন। সেই সতীন গঙ্গা আসার প্রথম স্মৃতি তাঁর মনে এখনও জাজ্জ্বল্যমান। তাইতো মনসার কথায় তাঁর কোন বিশ্বাস নেই ; তিনি নিশ্চিত যে, মনসা আসলে তাঁর সতীন রূপেই এখানে আবির্ভূত হয়েছেন। এর মধ্যে কোলাহল, ক্রন্দন শুনে গঙ্গা বেরিয়ে এসে সার্বিক বিষয়টা পর্যালোচনা করত সতীন চন্ডীকে ধিক্কার জানাচ্ছেন ঃ

''তোমার মনে লয় কি, ও বলে শিবের ঝি,
না বুঝিয়া হেনজন মারি।
তুমি সাহসালী ঘরে, কলঙ্ক রাখিয়া কুলে,
শুনিয়া হাসিবে সর্বনারী।।
ত্যজিয়া ধর্ম্মের ভয়, পেটের ছাওয়াল নয়,
গৌরবিত সতীনের ঝি।
পদ্মারে ধরিয়া করে, আবিচারে মারে তারে,
স্বামী শুনিলে বলিবে কি ?''[৯৫]

Dhaka University Institutional Repository

গঙ্গার কথা শুনে চন্ডীর '' কাঁটা ঘায়ে লেবুর রস পড়া''র মত অবস্থা হল। ইতোমধ্যেই মনসার সাথে বিবাদ করে তাঁর গলা সপ্তমে রয়েছে। তাঁর গলা আরও সপ্তমে চড়িয়ে গঙ্গাকে শুধালেন ঃ

'' চন্ডী বোলে গঙ্গা শোন পর মন্দ বোল কেন
পর মন্দ বলিয়া কি বা বাস।
অনুচিত আমি করি শাস্তি দিবে ত্রিপুরারি।
তুমি নহে শাস্তির ভাজন।''[৯৬]

চন্ডীর প্রথম থেকেই সতীন গঙ্গার সাথে '' অঘোষিত যুদ্ধ '' চলছে। সুতরাং তাঁর কোন হিতোপদেশ চন্ডীর কাছে যে বিপরীতই ঠেকবে সেটা বলাই বাহুল্য। এখানে মনসাকে কেন্দ্র করেও তাঁদের দু'জনের পূর্ব বিবাদ পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠলো। চন্ডী মনে করছেন, গঙ্গা মনসার পক্ষ নিয়ে ওকালতি করতে এসেছেন। তাই তিনি যেন গঙ্গার সাথে কোমড়ে কাপড় জড়িয়ে নিয়ে বিবাদে প্রমত্তা হয়েছেন। অবশ্য গঙ্গাও কম যান না। এ যেন গ্রাম্য নারীদের স্বভাব ধর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তাঁরা যে দেবতা সেটা মনেই পড়ে না। চন্ডী - গঙ্গার কলহের[৯৭] অংশ বিশেষ নিম্নরূপঃ

চন্ডী - ওগো গঙ্গা তোরে আমি ভালমতে জানি
তোরে আনিতে ভগীরথে সুমেরু ঠেকিল মাথে
ঐরাবত মাগিল সুরতি।

গঙ্গা - ওগো ওগো ওগো চন্ডী
আশ্বিন মাস এলে পরে নরলোকে পূজা করে
প্রথমেতে যাও হাড়ির বাড়ি।
তার শূয়র দেয় বলিদান পাছে দেয় গুয়া পান
বড় তুষ্ট তাহে হও তুমি।।

চন্ডী - ওগো ওগো গঙ্গা গঙ্গা গো
সকল কাল যায় ভাল শ্রাবণেতে তোর যৌবন কাল
ভাদ্র মাসে নাম ধর বুড়ী।।

ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

দু'সতীনের তুমুল ঝগড়ার এক পর্যায়ে '' রণে ভঙ্গ '' দিয়ে গঙ্গা রাগ করে ঘরের ভেতর চলে গেলেন। তখন চন্ডীর সকল ক্রোধ গিয়ে পড়ল আবার পদ্মার উপর। তিনি মনসাকে আরও বেশি করে প্রহার করতে লাগলেন। শুধু প্রহারেই সন্তুষ্ট না হয়ে চন্ডী একটি লৌহ শলাকা দিয়ে মনসার এক চোখ কানা করে দিলেন। এ হেন অবস্থায় মনসার সর্পবুদ্ধি গর্জে উঠল। তিনি চন্ডীকে বিষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মেরে ফেললেন। অবশ্য পরে পিতা শিবের অনুরোধে মনসা বিমাতা চন্ডীকে বাঁচিয়ে তুললেন।

বিমাতা চন্ডীর এ রূঢ় ব্যবহারে কিশোরী মনসার সর রকম সুকুমার বৃত্তির যে অপমৃত্যু ঘটবে - সেটা খুবই স্বাভাবিক। মাতৃহীনা মনসা যেখানে প্রত্যাশা করছেন স্নেহের, সোহাগের, সেখানে তাঁর কপালে জুটছে নিদারুণ লাঞ্ছনা, গঞ্জনা। তাই মনসার অন্তরের অশুভ শক্তি এই সীমাহীন অত্যাচার - নির্যাতনে জেগে উঠে। মনসার অন্তরের শক্তি রূপ বাঞ্ছি স্বাতন্ত্র্য প্রতিকূল পরিবেশে বিকশিত হয়ে উঠে। বলা যায়, '' মনসার চরিত্রের মূলে এক স্বাতন্ত্র্যময়ী তেজোগর্ভ নারীত্বের বীজ সুপ্ত।[৯৮] তাই বিমাতার অত্যাচারে পদ্মার প্রতিরোধ হয়েছে মারাত্মক। বিক্রম দেখিয়েই তাঁকে চন্ডীর গৃহে আশ্রয় পেতে হয়েছেঃ

'' মা নাহি পদ্মাবতীর বাপের বড় দয়া।
বিক্রম জানিয়া পালেন দেবী মাহামায়া।।''[৯৯]

মনসার এই বিক্রম, প্রতাপ না থেকে দুর্বল, ভীরু মন থাকলে তাঁর পক্ষে প্রতিষ্ঠা পাওয়া সম্ভব হতো না। সে ক্ষেত্রে এক খ্যাতিহীন সাধারণ সমাপ্তিই তাঁর কপালে জুটত। এটাকে রূপক হিসেবে দেখলে বলতে হয় - ''অনার্য দেবী মনসাকে প্রধানত অভিজাত শৈব ও শাক্তদের সঙ্গে সংঘাতের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়।''[১০০] শিবের তনয়া হিসেবে তাঁর পৌরাণিক আর্যদেবতা মন্ডলীতে প্রতিষ্ঠার যে প্রচেষ্টা মনসামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত হয়েছে সেখানে আর্য-অনার্য লৌকিক-পৌরাণিক বিশ্বাসের জটিল মিশ্রণের লক্ষণ সুস্পষ্ট । উদাহরণ স্বরূপ মনসামঙ্গলের বিভিন্ন কবি কর্তৃক ব্যবহৃত মনসার নাম সমূহের কথা উল্লেখ করা যায়ঃ পদ্মাবতী (পদ্মা) , মনসা, জগদ গৌরী, বিষহরি, পাতাল নাগিনী, ব্রহ্মাণী, জরৎকারু, কমলৌঠা, পাতাল কুমারী, কেতকা, নাগেশ্বরী, তোতলা, পার্বতী, পর্বতবাসিনী, জরৎকার-পত্নী, জাগিয়া, জাগুলী, পতি মন্দদরী, কাণী/কানী, চেঙ্গমুড়ি, কমলা, নাগমাতা, আস্তিক জননী, ঈশান কুমারী, জগতি, জয়া, বিষ বিনোদিনী, মনসাকুমারী, জয় বিষহরি, ভুজঙ্গ জননী, বিশ্বমাতা, ব্রাহ্মণী, জরৎকারু জায়া, করুনীময়ী, হরের ঝিয়ারী, শিবসুতা, ঠাকুরাণী, দেবী ভগবতী, মহেশের ঝি, সাবিত্রী, বিজয়া, সনাতনী, খরতরী, জয় জয়কারী, ভয়ঙ্করী, দয়াময়ী, পদ্মমুনি, বিষাদেশ্বরী, জগতগৌরী,

Dhaka University Institutional Repository

শিবদুহিতা, শশীমুখী, ভুজঙ্গ মাতা, ভুবন মোহিনী, ঈশ্বরনন্দিনী, বিশালাক্ষী, ভয় বিনাশিনী, পুরাতনী, অনাদ্যা প্রকৃতি, জগত-মহিমা প্রকাশিনী, ত্রিনেত্র ধারিণী, নাগরাণী, বিষধরভয় নিস্তারিণী, ভুজঙ্গ-আভরণী, অভয়দায়িনী, অভয়া, অনন্তের আই, শ্রীমঙ্গলা, শ্রীজগাতি, কাল-ভুজঙ্গিনী, সর্পমাতা, ভুজঙ্গবাহিনী, বরদা, জগৎঈশ্বরী প্রভৃতি। এখানে আর্য-অনার্য, লৌকিক পৌরাণিক প্রভৃতির সমাবেশ ঘটেছে সেটা বলাই বাহুল্য। প্রসঙ্গক্রমে এখানে শিব ও দুর্গার বিভিন্ন নামও উল্লেখ করা যায়। এখানেও প্রায় একই অবস্থা। মনসা মঙ্গল কাব্যের কবিগন কর্তৃক উল্লেখিত শিব, মহেশ্বর, শিব, ত্রিপুরারি, শূলপাণি, ত্রিলোচন, শঙ্কর, মহাদেব, ভোলানাথ, হর, বিশ্বম্ভর, পশুপতি, মহেশ, পঞ্চানন, শঙ্খধর, শিবলিঙ্গ, ভগবান, ভূতপতি, নিরঞ্জন, বিশ্বেশ্বর , দিগম্বর, রুদ্র, রুদ্রাক্ষ, শিবানী, বিশ্বনাথ, শম্ভু, জটাধর, চন্দ্রধর, গঙ্গাধর, কপর্দী, সুধাকর, অর্ধ-নারীশ্বর, গিরিশ, সদাশিব, মৃত্যুঞ্জয়, আশুতোষ, যোগীন্দ্র, তপস, মহেন্দ্র, মহাযোগী, ভৈরব, পশুসখা, ত্রিশূলধারী, কল্পতরু, ভব, কৃত্তিবাস, গোসাঁই, পাগলা, শিবাই, ঈশ্বর , চূড়ামণি, ত্রিজগত-পতি, শূলপতি, জগৎ-নাথ, জগতমোহন, গদাধর, দেবেশ্বর, চন্দ্রচূড়ামণি, ত্রিজগতের নাথ, ত্রিলোকের নাথ, ভুবন কারণ, ত্রিলোকের পতি, নীলকণ্ঠ, পতিতপাবন, গোসাঞি, প্রমথ, জ্যোতির্ময়, বিশ্বপতি, অনাদ্য, বিভূতিভূষণ, মন্মথ, ভূতনাথ, দেবনাথ, পরমানন্দময়, ত্রিভুবনেশ্বর, জটাধর, মহারুদ্র, মহাযোগী, ত্রিভুবন নাথ, প্রমথ নাথ, ত্রৈলোক্য দেবতা, স্বামীনাথ, জগদীশ, ত্রিদশনাথ, কমললোচন, ত্রিলোকা সুন্দর, পীতাম্বর, অবিনাশী, অন্তর্যামী, যুগীশ্বর, দেবেশ্বর, গুরু, অনাদি, গৌরীনাথ, বিষম্ভর, যোগেশ্বর, যুগী, অনাদি পুরুষ, নীলকণ্ঠ, কপালি, আদি , রমনীমোহন, শূলধারী, কাশীনাথ, ঈশান, দেব হরিমর, ত্রিদশনাথ, শশিচূড়, শিবাই, বৃষারূঢ়, দেব ত্রিলোচন, গোরা ক্ষেত্রপাল, জগতগুরু, কীর্ত্তিবাস, ত্রিনয়ান , ত্রৈলোক্যনাথ, ব্যোমকেশ, দিগবাস, উমাপতি, মহারুদ্র, ভোলা, যোগী, বিশ্বেশ্বর, মদনমোহন, ত্রৈলোক্যদেবতা প্রভৃতি। চন্ডীর ক্ষেত্রে ঃ চন্ডিকা , ভগবতী, মহামায়া, গৌরী, পার্বতী, সর্ব মঙ্গলা, ভবানী, উমা, যোগমায়া, সতী, দশ মহাবিদ্যা (কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা), শারদা, আদ্যাশক্তি , অভয়াদেবী, গিরিসুতা, শশিমুখী, বিধুমুখী, কৃত্তিকা, কমলা দেবী, কাত্যায়নী, মহেশ্বরী, শঙ্করী, রুদ্রবতী, ঈশ্বরী, মা তারা, মা বরদা, কালিকা দেবী, চামুন্ডা, জগৎ-মাতা, মহাদেবী, দুর্গা, চন্ডী, শৈলসুতা, দশভুজা,হেমন্ত নন্দিনী, ত্রৈলোক্য জননী , হরপ্রিয়া, মাহেশ্বরী, জগত জননী, আদ্যাদেবী, আদ্যা ভগবতী, পর্বত নন্দিনী, হিমগিরি সুতা, বিপদনাশিনী, সিংহবাহিনী, ত্রিনয়নী, মহিষাসুর, মর্দিনী, হিমালয় কন্যা , অষ্টভুজা, দক্ষের কুমারী, ডোমনী, হেরম্বনন্দিণী, উগ্রতারা, জ্বালামুখী, মঙ্গল চন্ডিকা, মঙ্গল চন্ডী, দক্ষের দুহিতা, নবদুর্গা, সাবিত্রী, জগতমাতা, হেমন্ত ঋষির বেটী, দিগম্বরী, অভয়া, জয়দুর্গা, নারায়ণী দেবী, ত্রিনয়ানী, অসুরদলনী,

Dhaka University Institutional Repository

দিগাম্বরী, হেমন্তঝিয়ারী, হরের ঘরণী, সর্বমঙ্গলচন্ডী, মায়াবতী, অমঙ্গলা, ত্রিজগতমাতা, দক্ষসুতা, শ্রীদুর্গা, শ্যামা, আদি কুন্ডলিনী, ভৈরবী, দেবী ভদ্রকালী, গিরীশতনয়া, কৌশিকী, করুণাময়ী মাতা, অনাদ্যা প্রকৃতি, নিত্যা, সুখ-মোক্ষদাতা, মহালক্ষ্মী, জগদম্বা, দেবী বিশ্বমাতা, গিরিজা, গণেশ জননী, গয়া- গঙ্গা-গোদাবরী গর্বিত- রূপিণী, চিত্তচৈতন্য রূপিণী, চামুন্ডাখ্যায়িণী, ইচ্ছাময়ী, কৃপাময়ী, রমা, ভীমা, ভবানী, ভবজায়া , অনুপমা, জগদ্ধাত্রী, দেবী শক্তি বিধায়িনী , হৈমবতী, শিব-শক্তি, ত্রৈলোক্য-জননী, নগেন্দ্রনন্দিনী, সতী, শঙ্করী, শ্রীদুর্গা, মা দুর্গতিনাশিনী, হিমাদ্রিনন্দিনী, ভগবতী, মা দুর্গা, যোগিণী, শঙ্করমোহিনী প্রভৃতি।

দেবসমাজে স্থান করে নিয়ে মনসা শিব-চন্ডীর ঘরে দিনে দিনে বেড়ে উঠছেন। কন্যা যৌবনে পদার্পণ করলে পিতা শিব কন্যা মনসাকে পাত্রস্থ করার জন্যে উতলা হয়ে উঠলেন। নারদ মুনিকে ঘটকালিতে নিয়োগ করত তদুপরি কামদেব ও রতির সহায়তা নিয়ে শিব বিগত যৌবন সংসার বিরাগী জরৎকারু মুনিকে তাঁর কন্যার পাত্র হতে রাজী করালেন। দরিদ্র শিব বন্ধু ধনের ঈশ্বর কুবেরের কাছ থেকে ধন নিয়ে, বিশ্বকর্মাকে দিয়ে অলঙ্কারাদি নির্মাণ করিয়ে কন্যা মনসার বিয়ের আয়োজন করলেন। সর্ব দেবগণের উপস্থিতিতে শিব কন্যা-সম্প্রদান করলেন।

"সর্ব্ব দেবগণে চাহিতে আইল দেবী মনসার বিহা।।

* * *

হাতে কুশা জলে শিব পুরোহিত দেবগুরু ।
কন্যা উৎসর্গিয়া হস্তে সমর্পিয়া জরৎকারু।।"[১০১]

দেবকন্যা মনসার জন্যে দেবসমাজ থেকে পাত্র পাওয়া যায়নি। ঋষিবংশের থেকে যদিও এক পাত্র জরৎকারুকে পাওয়া গেল কিন্তু তিনি মনসার যাবতীয় কামনা - বাসনা পূরণ করতে রাজী এবং সক্ষম কোনটাই ছিলেন না। মনসার জীবনে তীব্রতম আঘাত এসেছে বিয়ের রাতে। স্বামী জরৎকারু শেষ রাতের দিকে মনসাকে অরণ্য থেকে কুশ সংগ্রহ করে আনতে বলেন তাঁর প্রভাতী পূজার জন্যে। সঙ্গত কারণেই মনসা এ কথায় রাজী হতে পারলেন না, ফলে দু'জনের মধ্যে বিয়ের রাতেই তীব্র ঝগড়া বেধে গেল। ঝগড়ার সময় জরৎকারু মনসার পিতা শিবকে কুৎসিত ভাষায় নিন্দা করায় তিনি সাপ হয়ে স্বামীকে দংশন করলেন। এতে জরৎকারুর মৃত্যু হলেও পরে সকলের অনুরোধে মনসা তাঁরে

Dhaka University Institutional Repository

বাঁচিয়ে তুললেন। এরপর জরৎকারু মনসাকে চিরদিনের মত ত্যাগ করে যান গেল। অবশ্য যাবার আগে তিনি স্ত্রীকে পুত্রবর দিয়ে যান, যার পরিণামে পরবর্তীকালে আস্তীকের জন্ম হয়।

মনসা ব্যক্তিত্বময়ী। অত্যাচার-অপবাদকে নীরবে হজম না করে প্রতিশোধপরায়ণা হয়ে উঠার কারণে তিনি বার বার প্রাণঘাতিনী হয়ে উঠেছেন। এভাবেই তিনি একটি অশুভ বৃত্তির মূর্ত প্রতীক রূপ পরিগ্রহ করেছেন। মর্ত্যলোকে চাঁদ সদাগরের কাছ থেকে পূজা পেতে গিয়ে তাঁর সাথে প্রত্যক্ষ বিবাদে জড়িয়ে পড়েছেন। জীবনের সব দিকে ব্যর্থ হলেও তিনি অন্ততঃ এদিক টাতে ব্যর্থ হতে চাননি। শিব চন্ডীর উপাসক চাঁদ সদাগরের পূজা তাকে পেতেই হবে। সে কারণে ছল-বল-কলা-কৌশল যখন যেটার প্রয়োজন সেটা প্রয়োগ করে তিন এক চরম সন্ত্রাসিনী এবং ধবংসকারিণী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। দয়া-মায়া -প্রীতি-ন্যায় প্রভৃতি কোন সদ্‌গুণই তাঁর কাঙ্কিত অভিযানের পালে হাওয়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

বিজয়গুপ্ত তাঁর পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গলে শেষ পর্যন্ত দেবতার আকৃতির বিভিন্নতাকে একত্বে নিয়ে এসেছেন। শক্তির রূপ মূলতঃ এক কিন্তু তা নানা আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে, - এই ধারণাটি বিজয় গুপ্ত তাঁর কাব্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাইত মনসার পূজাবিরোধী চন্দ্রধর বা চাঁদ সদাগরকে তাঁর উপাস্য দেবী চন্ডী অদ্বয় জ্ঞান দিচ্ছেন ঃ

" চান্দরে ডাকিয়া চন্ডী বলিল তখন।।
পদ্মাবতী পূজা কর চান্দ সদাগর।
একই মূর্ত্তি দেখ সব না ভাবিও পর।।
যেই জনা দেখ বিষ্ণু সেই মহেশ্বর।
কুবের বরুণ দেখ চন্দ্র দিবাকর।।
যেই জন ভগবতী সেই বিষহরী।"[১০২]

এতেও চাঁদ সদাগরের মনের সন্দেহ বিদূরিত হচ্ছিল না ; তিনি গোঁ ধরে বসলেন দেবী চন্ডীর কাছে ঃ

" পদ্মা দুর্গা সম দেখি নয়ন গোচর।
তবে সে পূজিব পদ্মা বলিল সদাগর।।"[১০৩]

Dhaka University Institutional Repository

চাঁদ সদাগরের এ কথা শোনার পর চন্ডী বা দুর্গা পদ্মার সাথে অন্তরীক্ষে একত্রে অবস্থান নিয়ে তার সম্মুখে আবির্ভূতা হলেন। তখন -

" এক রথে পদ্মা দুর্গা অন্তরীক্ষে থাকি।
দুইজনে দেখে চান্দ একই মুরতি।।
দোহার সমান বেশ দেখিয়া তখন।
চিনিতে না পারে চান্দ পদ্মা কোন জন।।
দক্ষিণেতে দশভুজা বামে পদ্মাবতী।
করযোড় করি চান্দ করিল মিনতি।।"[১০৪]

এমন অভুতপূর্ব রূপ দেখে চাঁদ হতবিহ্বল হয়ে পড়লেন। তার অন্তরের অনুশোচনা দেবীস্তুতিতে ফুটে উঠল -

" এমন মুরতি আমি কভু দেখি নাই।
এতকাল মোরে কেন না বলিলে আই।।
যেই মুখে বলিয়াছি লঘুজাতি কানী।
সেই মুখে ভস্ম দেও জগত জননী।"[১০৫]

চাঁদের মনসাদেবীর প্রতি এমন আত্মসমালোচনামূলক প্রার্থনা মৃত্যুপথযাত্রী রাবণ মহারাজের শ্রীরাম স্তুতিকে স্মরণ করিয়ে দেয় ঃ

" রাবণের সাক্ষাতে আইলা রঘুপতি।
বুঝি রাবণের মন উঠি শীঘ্রগতি।।
উঠিতে শকতি নাই রাজা দশাননে।
ভক্তিভাবে প্রণাম করিল মনে মনে।।
আঘাতে আকুল অঙ্গ বাক্য নাহি সরে।
বিনয় করিয়া কথা কয় ধীরে ধীরে।।
রামের সর্বাঙ্গ রাজা করে নিরীক্ষণ।
সাক্ষাৎ বিরাট মূর্তি ব্রহ্মা সনাতন।।
মায়াতে মানবদেহ বিশ্বময় তুমি।

Dhaka University Institutional Repository

তোমার মহিমা প্রভু কি জানিব আমি।।
অনাথের নাথ তুমি পতিত পাবন।
দয়া করে মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ।।
চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার।
শাপেতে রাক্ষসকুলে জনম আমার।।
মহীতলে ভ্রমিতে হয়েছে তিন জন্ম।
আসুরিক বুদ্ধে নাহি জানি ধর্মাধর্ম।।
অপরাধ ক্ষমা কর গোলকের পতি।
অনাদি পুরুষ তুমি আপনা বিস্মৃতি।।''[১০৬]

মনসামঙ্গল কাব্যে শিব ও চন্ডী ছাড়া পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতারা নামে আছেন কিন্তু চরিত্র বৈশিষ্টে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেন নি। কাব্যের মধ্যে একাধিকবার পৌরাণিক দেব সমাজের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়- মাঝে মাঝেই তাঁদের দলবদ্ধ প্রবেশ এবং প্রস্থান ঘোষিত হয়েছে।

মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম আলোচিত চরিত্র হচ্ছেন নেতা। আপাতদৃষ্টে নেতাকে গৌণ চরিত্র মনে হলেও, কাহিনীর গতি এবং পরিণতিতে তাঁর অবদান যথেষ্ট । মনসার নির্বাসনকালে শোকার্ত শিবের অশ্রু থেকে সৃষ্ট নেতা অনুক্ষণ মনসার সহচরী তথা পরামর্শদাত্রী হিসেবে নিয়োজিতা -কাব্যের মধ্যে এভাবেই তাঁর পরিচিতি রয়েছে। তিনি বুদ্ধিমতী, সঞ্জীবনী মন্ত্রের অধিকারিনী । পাশাপাশি তিনি স্নেহপরায়ণা এবং পরোপকারিনীও। স্বর্গের ধোবানী নেতা মনসা কর্তৃক চাঁদ সদাগরকে পীড়নের হোতা ; আবার তিনিই বেহুলা রূপী ঊষার দেবপুরে স্বামী লখিন্দররূপী অনিরুদ্ধকে মনসা কর্তৃক জিয়াতে প্রধান সহায়তাকারিনী। নেতার সাথে মনসার অনুরাগ, রাগ, বিরাগ সব ধরনের সম্পর্কই রয়েছে। চাঁদ সদাগর কর্তৃক অপমানিতা মনসা বেহুলার পক্ষ নেওয়ায় নেতাকে কিছুটা তিরষ্কৃত করেছেন। লখিন্দরকে জিয়ানোর প্রসঙ্গ এলে মনসা অন্য প্রসঙ্গ তুলে নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস চালিয়েছেন। আবার এই অন্য প্রসঙ্গের মধ্যেই ষষ্ঠীবর দত্তের কাব্যে সংস্কৃত পুরাণের কথা সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে -

'' আমি না জীয়াইমু চান্দের সুন্দর গো,
ও পাত্র, নেতাই, বল সুন্দরী দেশে যাউকা।

Dhaka University Institutional Repository

লখাইর অস্থি জলেতে পালাউকা গো ।।
সংসারের জীব যত ইতি সৃজিলেক প্রজাপতি
আমি নহি তনু গড়িবারে।
বেহুলার মড়া না দিও আমারে গো।।''[১০৭]

ইত্যাদি ।

পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গীয় মনসামঙ্গলের কবিদের কাব্যে স্বল্প পরিসরে হলেও বাংলার অন্যতম লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের আসনটি খুবই সম্মানজনক। সেখানে পুরাণের দেবাদিদেব মহাদেব বা শিবও ধর্মের পূজা করেন।

'' ধর্ম পূজিবারে শিব করিলেন মন।''[১০৮]

শুধু তাই নয় - পৌরাণিক দেবতা এয়ী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের স্রষ্টাও এই ধর্মঠাকুর।

''সৃষ্টিতে মন তবে করিল ধর্ম্মজ্ঞান।
* * *
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ সৃজিল তিন জন।
তিন পুরুষে করিবে পৃথিবী পালন।।''[১০৯]

শিবের ত্রিলোচন হবার ব্যাপারে এদেশে পুরাণ বহির্ভুত একটি লৌকিক কাহিনীর[১১০] প্রচলন আছে - নিরঞ্জন ধর্মের ঘাম থেকে আদ্যশক্তির জন্ম, আদ্যশক্তি থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জন্ম হয়, জন্মান্ধ এই তিনজনই ভুমিষ্ঠের পরপরই কারণ সমুদ্রের তীরে তপস্যাবর্থে চলে যান। তাঁদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে ধর্ম একদিন পূতিগন্ধময় শবরূপে জলে ভাসতে ভাসতে তাঁদের কাছে এসে হাজির হন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ধর্মকে চিনতে ব্যর্থ হলেও শিব তাঁকে চিনতে পেরে শব কাঁধে নিয়ে নাচতে থাকেন। এতে ধর্ম সন্তুষ্ট হয়ে শিবকে দৃষ্টি শক্তি দান করলেন এবং বললেন, ''তুমি আমাকে চিনিতে পারিয়াছ, অতএব তোমাকে আর একটি চক্ষু দিলাম।'' এটাই শিবের তৃতীয় লোচন হল। এরপর শিবের অনুরোধে ধর্ম নিরঞ্জন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরও দৃষ্টি শক্তি প্রদান করলেন।

ইতোপূর্বেই ধর্মঠাকুরের পত্নী হিসেবে মনসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবার ধর্মঠাকুর শিবের সাথে সাযুজ্য হওয়ায় শিবের পত্নী হিসেবেও মনসার নাম আলোচিত হয়েছে। মনসা মঙ্গলের অনেক কবি

Dhaka University Institutional Repository

মনসাকে আদ্যা প্রকৃতি তথা আদ্যাশক্তি রূপে অভিহিতা করেছেন। স্বাভাবিকভাবে মনসামঙ্গল কাহিনীতে মনসা হচ্ছেন শিবের কন্যা। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে এর বৈপরীত্যও দেখা যায়, অর্থাৎ অনেক স্থানে মনসা শিবের স্ত্রী হিসেবে বর্ণিতা বা কল্পিতা । যেমন কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগর মনসার স্তবে বলছেন-

" আদ্যাশক্তি সনাতনী মুক্তিপদ প্রদায়িনী
জগত পূজিতা তুমি জয়া।
যার সৃষ্টি ত্রিভুবন হর মহেশের মন
আর কে বুঝিব তব মায়া।।"[১০৯]

"হর মহেশের মন " উল্লেখ করার সময় চাঁদ সদাগর মনসার শিব বা মহেশের তনয়ার পরিচয় ভুলে গিয়েছেন। এ পরিচয় কি শুধু চাঁদ সদাগরই ভুলেছেন ? না , দেবী নিজেও ভুলেছেন। নিজের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে মনসা দেবী চাঁদ সদাগরকে বলছেন -

" আকাশ পাতাল ভূমি সৃজন সকল আমি
শক্তিরূপা সভাকার মাতা।
মহেশের মহেশ্বরী মনোরূপা সুকুমারী
লক্ষ্মীরূপা নারায়ণ যথা।।"[১১২]

অর্থাৎ মনসাদেবী নিজেই মহেশ্বরী তথা শিবের স্ত্রী হয়ে উঠেছেন। মনসা ও শিবের এই বিরুদ্ধ সম্পর্ক ব্রহ্মা-সরস্বতী, ব্রহ্মা-সন্ধ্যা, দক্ষ-অদিতি, অগ্নি-স্বাহা, সূর্য-ঊষা প্রভৃতি বৈদিক ও পৌরাণিক দেবদেবীদের কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[১১৩] আবার, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই মন্তব্য করেছেন - "মনসাদেবী যেমন লৌকিক সম্পর্কে চন্ডীর আত্মীয়া, তেমনি অধ্যাত্ম তাৎপর্যের দিক দিয়াও চন্ডী প্রকৃতির ক্রূর অংশেরই একটা সমগ্র রূপায়ণ।"[১১৪]

বেদে এবং পুরাণে বহু দেবতার উপাসনার প্রচলন থাকলেও সকল দেবতাই যে এক, অথবা একই দেবতার রূপভেদ এ তত্ত্ব ভারতীয় উপমহাদেশের মূলতত্ত্ব। এ জায়গার সাহিত্যে ও দর্শনে সর্বত্র এই তত্ত্ব প্রতিফলিত। দেবতাগণ বাহ্যত বিভিন্ন হলেও স্বরূপ এক ও অভিন্ন - এ পরম সত্য এখানকার আবহাওয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত । উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানের মত বাংলাদেশেও যে সমস্ত লৌকিক

Dhaka University Institutional Repository

দেবতা, স্থানীয় দেবতা প্রভৃতি পরবর্তীকালে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁরাও সকলে উপরোক্ত পরম সত্যে বিলীন হয়ে গিয়েছেন সেটা - বলাই বাহুল্য ।

মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবকালীন রচনাবলি দেখে প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সময়ে মনসা, চন্ডী ও ধর্মের উপাসকেরাই এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি তৎপর হয়েছিলেন। বিভিন্ন প্রকার অনার্য পরিকল্পনা থেকে জাত এই সকল দেব-দেবী তুর্কী আক্রমণের অব্যবহিত পরে সমাজ তথা জাতির মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আর্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। কালক্রমে উচ্চবর্ণের লোকেরা এ ধরে নব্য আর্যেতর তথা লৌকিক দেবতার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মনসামঙ্গল কাব্যও আর্যেতর তথা লৌকিক দেবদেবীদের পদভারে মুখরিত, পৌরাণিক দেবতারা সেখানে ম্রিয়মাণ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ঃ

০১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম খন্ড), পৃঃ ১৮০

০২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড ঃ ? - ষোড়শ শতাব্দী), পৃঃ ১৫৫

০৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ২৬৬

০৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড), পৃঃ ১৫৭

০৫। বিপ্রদাসের মনসাবিজয়, পৃঃ ৩

০৬। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ২৬১

০৭। প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা ২৬১

০৮। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০৩

০৯। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০৩

১০। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০৩

১১। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০৪

১২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড), পৃঃ ১৫৭

১৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৭

১৪। স্বামী নির্মলানন্দ, দেবদেবী ও তাঁদের বাহন, শ্রীশ্রীপ্রণব মঠ, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৯৫, পৃঃ ১৭৯

১৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড), পৃঃ ১৫৯

১৬। পল্লব সেন গুপ্ত, পূজা-পার্বণের উৎসকথা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯০, পৃঃ ৯২

১৭। বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার, পৃঃ ৫১

১৮। পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গ সাহিত্য, পৃঃ ১১

১৯। ডঃ অতুল সুর, মহাভারত ও সিন্ধুসভ্যতা, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৮, পৃঃ ৯৪-৯৫

২০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪-৩৫

২১। Sir Monier Williams , Bramanism and Hinduism, Ventnor, U. K. 1891, Page 73

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৪৩৩-৩৪

Dhaka University Institutional Repository

২৩। বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (প্রথম খন্ডঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগ), পৃঃ ১০৪

২৪। ডঃ হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবীঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (তৃতীয় পর্ব), ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০, পৃঃ ১১৮

২৫। দেবদেবী ও তাঁদের বাহন, পৃঃ ২৭৮

২৬। সুধীর চন্দ্র সরকার (সংকলিত), পৌরাণিক অভিধান, পৃঃ ১৩৫-৩৬, ১৮৯

২৭। হিন্দুদের দেবদেবী ঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (তৃতীয় পর্ব), পৃঃ ১২০-২১

২৮। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৪

২৯। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৮

৩০। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৬,৫০

৩১। ডঃ হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবীঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (প্রথম পর্ব), ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮২, পৃঃ ২৫৪

৩২। ডঃ হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবীঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (দ্বিতীয় পর্ব) ,ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা ২১৮

৩৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৫

৩৪। পৌরাণিক অভিধান, পৃঃ ৩৫৮

৩৫। প্রাগুক্ত , পৃঃ ৩৫৯

৩৬। পৌরাণিক অধিধান, পৃঃ ৩৫২

৩৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫৩

৩৮। পূজা-পার্বণের উৎসকথা কলকাতা, পৃঃ ৯৭

৩৯। পৌরাণিক অধিধান, পৃঃ ৪৪৩

৪০। পৌরাণিক অভিধ্যান, ১৪২

৪১। পৌরাণিক অভিধান, পৃঃ ৯৯-১০০

৪২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৬

৪৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭২

৪৪। প্রাগুক্ত , পৃঃ ১৯

৪৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১

৪৬। হিন্দুদের দেবদেবীঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (দ্বিতীয় পর্ব), পৃঃ ৩৫০

Dhaka University Institutional Repository

৪৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫০

৪৮। পৌরাণিক অভিধান, পৃঃ৪৪

৪৯। মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৮১

৫০। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দ্বিতীয় খন্ড), পৃঃ ৪৭৭

৫১। বাংলার লৌকিক দেবতা, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ, ১৯৭৮,পৃঃ ২০০

৫২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০০

৫৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৬৭৭-৭৮

৫৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯৩

৫৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯৫

৫৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০২

৫৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০২

৫৮। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৭০০

৫৯। ডঃ অতুল সুর, বাঙলার সামাজিক ইতিহাস, জিজ্ঞাসা কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৬, পৃঃ ৭৪

৬০। বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ ১৯৯

৬১। বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খন্ড), পৃঃ ৪০৬

৬২। কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল, পৃঃ ৯

৬৩। বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ ১৮৫

৬৪। শ্রীরায় বিনোদঃ কবি ও কাব্য, পৃঃ ১২৫

৬৫। হিন্দুদের দেবদেবী ঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (তৃতীয় পর্ব), পৃঃ ৩৮৮

৬৬। বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ ১৮৫

৬৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৬

৬৮। বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ২৮৬

৬৯। বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (প্রথম খন্ড), পৃঃ ৫৮

৭০। মানব ধর্ম ও বাংলা কাব্যের মধ্যযুগ, পৃঃ ৬৫

৭১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৯

৭২। পৌরাণিক অভিধান, পৃঃ ২০

Dhaka University Institutional Repository

৭৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ২৫৪

৭৪। জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত (সম্পাদিত), কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ১৮

৭৫। প্রাগুক্ত , পৃঃ ১৯

৭৬। সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ২০

৭৭। হিন্দুদেব দেবদেবী ঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (তৃতীয় পর্ব), পৃঃ ১৪৫

৭৮। শ্রীরায় বিনোদ প্রণীত পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ৪১

৭৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩-৪৪

৮০। সুকবি নারায়ণ দেব ও পন্ডিত জ্ঞানকী নাথ বিরচিত পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, পৃঃ ৫৬

৮১। সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ২২

৮২। শ্রীরায় বিনোদ প্রণীত পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ৪৬-৪৭

৮৩। দ্বিজ বংশী কৃত শ্রী শ্রী পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ৪৭

৮৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭

৮৫। কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ২৩-২৪

৮৬। সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ২৪

৮৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪

৮৮। দ্বিজ বংশীকৃত শ্রী শ্রী পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ৪৮

৮৯। সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, পৃঃ২৪

৯০। প্রাগুক্ত , পৃঃ ২৪

৯১। প্রাগুক্ত , পৃঃ ২৫

৯২। বসন্তকুমার ভট্টাচার্য (সঙ্কলিত), কবিবর বিজয় গুপ্ত প্রণীত পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, পৃঃ ৯

৯৩। কবিবর বিজয় গুপ্ত প্রণীত পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল , পৃঃ ১৭

৯৪। প্রাগুক্ত , পৃঃ ১৭-১৮

৯৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮

৯৬। কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ৫১

৯৭। বাংলা কাব্য প্রবাহ, পৃঃ ১১৭

৯৮। প্রাচীন কাব্য ঃ সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন, পৃঃ৯৩

৯৯। কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

১০০। মধ্য যুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৭৬

১০১। কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ৮১-৮২

১০২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৫

১০৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৫

১০৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৫

১০৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৫

১০৬। দীনেশ চন্দ্র সেন (সম্পাদিত), কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কলকাতা, ১৯১৬, পৃঃ ৪৭২

১০৭। বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা , পৃঃ ২৩৪-৩৫

১০৮। তন্ত্রবিভূতি বিরচিত মনসাপুরাণ , পৃঃ ৫

১০৯। কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল, পৃঃ ৬

১১০। বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা , পাদটীকা পৃঃ ২৯৭

১১১। কেতকাদাশ ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল, পৃঃ ৩৪৩

১১২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৮

১১৩। হিন্দুদের দেবদেবীঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (তৃতীয় পর্ব), পৃঃ ১৪৬

১১৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

গ্রীক পুরাণের দেবদেবীর সঙ্গে ভারতীয় পৌরাণিক দেবদেবীর তুলনামূলক আলোচনা

পুরাণ হচ্ছে অতি প্রাচীন কালের বিখ্যাত ব্যক্তি, সমাজ, ধর্ম, রাজা প্রভৃতি অবলম্বন করে রচিত আখ্যায়িকা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে (যেমন - ভারত, গ্রীস, রোম, ব্যাবিলন, মিশর, চীন, জাপান, জার্মান প্রভৃতি) গড়ে উঠা পুরাণ সমূহে সে দেশের লৌকিক সংস্কার - বিশ্বাস, আচার-বিচার, প্রথা-পদ্ধতি প্রভৃতি লৌকিক উপাদান অন্তর্ভুক্ত) সংশ্লিষ্ট দেশের পুরাণে সেখানকার বৃহত্তম জন-সমাজের বিশ্বাস, রুচি, ধ্যান মনন প্রভৃতি দিক প্রতিফলিত হয়।

মানব সভ্যতার শুরু আজ থেকে প্রায় দশ- পনেরো হাজার বছর আগে।[১] সে সময় মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা ছিল আহার সংগ্রহ করা। পশু এবং পশুশিকার ছিল প্রাত্যহিক জীবনের প্রধান ভাবনা, পশু শিকার নিজের জীবনের সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সেই ঘটনাকেই স্থায়িত্ব দেবার আশায় সে নিজের বাসস্থানে অর্থাৎ পাহাড়ের গুহায় মানুষের, পশুর এবং মানুষের পশু শিকারের ছবি এঁকে রাখতে শুরু করে। এই ছবিই হচ্ছে মানুষের প্রাচীনতম লিপি। বর্তমান সভ্যজগতে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালা তথা লিপিসমূহের উদ্ভব ঘটেছে মিশরীয়, ফিনিসিয়, চৈনিক এবং ভারতীয় - এই চারটি অতি প্রাচীন লিপিচিত্র থেকে।[২] পৃথিবীর আদিম অবস্থা থেকে শুরু করে সৃষ্টির বিবরণের নাম ছিল পুরাণ। " Mythology in all advanced civilisations contains many elements"[৩] - বিভিন্ন element বা উপাদানের অন্যতম হচ্ছে পুরাণের মধ্যে অলৌকিক কাহিনীর সমাবেশ। উন্নত সভ্যতার সব পুরাণেই এটি পরিলক্ষিত হয়, দেবকল্পনায় অলৌকিকতা বিচিত্রভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ভারতবর্ষের বাইরে যে সকল প্রাচনিতম সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায় তাদের মধ্যে ইরান, মিশর এবং গ্রীসের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বৈদিক সাহিত্যকে শুধু ভারতবর্ষের নয়, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় প্রাচীনতম সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়।[৪] বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদের অনুবাদ কালে ভূমিকায় পাশ্চাত্য গবেষক ম্যাক্সমূলার ঋগ্বেদ সম্পর্কে বলেছেন - "The most ancient of books in the library of mankind"[৫] ঋগ্বেদে নৈসর্গিক শক্তি সমূহ থেকেই দেবতাগুলো কল্পিত হয়েছেন। যেমন - ইন্দ্র বৃষ্টির, মরুৎ

Dhaka University Institutional Repository

ঝড়ের, সূর্য বা সবিতা আলোকের প্রভৃতি। অগ্নি ছাড়া যজ্ঞ হয় না, তাই তিনি হচ্ছেন সকল যজ্ঞের পুরোহিত ; তাঁকে যে হব্য দেওয়া হয় তা তিনি সকল দেবতাদের কাছে পৌঁছে দেন। এদিক থেকে দেখতে গেলে অগ্নিই হচ্ছেন ঋগবেদের প্রধান দেবতা। পৃথিবীর এই প্রাচীনতম মহাগ্রন্থ থেকে পাঁচ-সাত হাজার কিংবা তার পূর্বেকার মানুষের ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মচর্যার বিশ্বস্ত আলেখ্য পাওয়া যায়। ভারতীয় আর্যধর্মের প্রভাব কালক্রমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। অগ্নির উপাসনা যে ভারতবর্ষ থেকেই এশিয়া ইউরোপের নানা দেশে ছড়িয়েছে সেটা বলাই বাহুল্য। যেমন - ইরানীয়গণ অগ্নি উপাসক ছিলেন। জরথুস্ত্র পন্থীদের মধ্যে আতর (Atar) বা অগ্নির স্থান শীর্ষে । বৈদিক আর্যদের মত ইরানীয়গণ অগ্নিতে যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি প্রদান করতেন এই বিশ্বাসে যে অগ্নি দূতরূপে দেবতাদের নিকটে তা পৌঁছে দেবেন।[৬] আবার , অগ্নিকে ল্যাটিন ভাষায় ইগ্নিস্ (Ignis) এবং শ্লাভোনিক ভাষায় ওগ্নি (Ogni) বলে আখ্যায়িত করা হতো। প্রাচীন ইহুদীধর্মের প্রধান অঙ্গ স্বরূপ ছিল অগ্নিপূজা। তারা দেবতা ও পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি দিত। এ ছাড়া প্রাচীনকালে গ্রীক, প্রুতশিয়া, রুশ, লিথুনিয়ান প্রভৃতি জাতিও অগ্নি উপাসক ছিল। গ্রীকদের দ্বারা অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন (যেমন -Vulcan, Hephaistos, Hestia প্রভৃতি) নামে পূজিত হতেন।[৭]

প্রাচীন গ্রীকদের দেবতা, বীর এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সমূহের উপর ভিত্তি করে গ্রীক পুরাণ গড়ে উঠেছিল। খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতকের গ্রীক কবি হেসিওড (Hesiod) লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ ' থিওগোনি' (Theogony) হচ্ছে ''প্রাচীন গ্রীসের পৌরাণিক কাহিনীর মূল ভিত্তি।''[৮] এই গ্রন্থে প্রাচীন গ্রীসের ধর্মবিশ্বাস এবং দেবতাদের জন্ম সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য রয়েছে, যা ঐতিহাসিক হেরোডোটাসকেও আকৃষ্ট করেছে। ১২৬০ টি শ্লোক সম্বলিত থিওগোনির[৯] সূচনা হয়েছে সংগীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মিউজদের বন্দনা দিয়ে। এরপর পৃথিবী-সৃষ্টির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কবি হেসিওড তাঁর এই গ্রন্থে সন্তানকে নিয়ে আকাশরূপী ইউরেনাস ও পৃথিবীরূপী গেইয়ার সংঘাত, গেইয়া ও তার তনয় ক্রনাসের ষড়যন্ত্র এবং ক্রনাস কর্তৃক ইউরেনাসের নির্বীযকরণ, জিউসের জন্ম এবং শিশু জিউসের স্থানান্তরকরণ, জিউসের সঙ্গে টাইটানদের যুদ্ধ, প্রমিথিউসের শাস্তিভোগ, জিউস কর্তৃক টাইফনকে দমন প্রভৃতি ঘটনার বর্ণনা করেছেন।

গ্রীক পুরাণের সাথে গ্রীক মহাকবি হোমারের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। গ্রীক তথা ইউরোপীয় সাহিত্যের আদিকবি হোমার (Homer) ইলিয়াড (Iliad) এবং ওডিসি (Odyssey) - এই দু'টি মহাকাব্যের স্রষ্টা।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষকরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতকে আবির্ভূত হোমার আনুমানিক ৭৫০ খ্রীঃ পূর্বে ইলিয়াড এবং আনুমানিক ৭০০ খ্রীঃ পূর্বে ওডিসি রচনা করেন।[১০] ইলিয়াড এবং ওডিসি এই দুই মহাকাব্যই সর্বনাশা রূপের অধিকারিণী হেলেন অপহরণের কারণে সৃষ্ট ট্রয় যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত। ওডিসি মহাকাব্যের কাহিনী ইলিয়াড মহাকাব্যের কাহিনীর পরিশিষ্ট - ইলিয়াডে আছে যুদ্ধ, পক্ষান্তরে ওডিসিতে শান্তির চিত্র। উল্লেখ্য, ইলিয়াডে দশ বছরের যুদ্ধের চিত্র মাত্র ৪৭ দিনের মধ্যে এবং ওডিসিতে ওডিসিউসের দশ বছর ধরে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী মাত্র ৪২ দিনের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

ইলিয়াড ও ওডিসি ছাড়াও হোমারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে স্তোত্রমালা।[১১] মোট চৌত্রিশটি স্তোত্র সম্বলিত স্তোত্রমালায় এপোলো, হার্মিস, ডায়োনিসাস, আফ্রোদিতে, দিমিতির প্রমুখ দেবদেবীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

গ্রীক পুরাণে অলিম্পাস পর্বতকে দেবতাদের বাসভূমি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রীসের উত্তর থেসালীতে অবস্থিত এই পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়ার উচ্চতা ৯,৫৭০ ফুট।[১২]

বিধি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মান্ডকে শাসন এবং নিয়ন্ত্রণ করছেন। অলিম্পাস পর্বতের দেব-দেবী এবং মর্তের মানব-মানবী সবাই এই বিধির শাসনের অধীন। দৈব শক্তি এই বিধির আজ্ঞা পালনকারী এবং এর অলংঘনীয় নিয়ম-নীতি নিষ্ঠুর ভাগ্যের মতই দর্শনযোগ্য। এর গতি বা শক্তিকে আটকিয়ে রাখার ক্ষমতা কারো নেই।

লোক প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনাকারী হোমার দেব-দেবীদের ঐতিহ্য সূত্রে লাভ করেছেন। তাই তাঁদের চরিত্র সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। আপাত দৃষ্টে হোমারের দেব - দেবীদের দেখে মনে হতে পারে, তাঁরা যেন মানুষের আদলে বা ছাঁচে গড়া । মানুষের মতোই তাঁদের বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি, ভুল-ভ্রান্তি, ইচ্ছা-দ্বেষ রয়েছে। রাত্রি হলে দেবতারা মানুষের অনুকরণেই ঘুমুতে যান। মানুষের মতোই তাঁরাও ঈর্ষায় কাতর, ক্রোধে অন্ধ, কামনায় জর্জরিত এবং লোভে বশীভূত হয়ে পড়েন। হোমারের দেবতাদের সম্বন্ধে আপাতভাবে এ ধারণা সৃষ্টি হলেও এটা নিতান্তই বাহ্যিক এবং অনেক সময় ভ্রমাত্মকও বটে। কেননা, দেবতারা যে স্থানে বিধির ধারক ও

Dhaka University Institutional Repository

বাহক, সেস্থানে তাঁরা রীতি মতো ' সিরিয়াস'। মানুষের ভাগ্য নির্ধারণে তাঁরা কখনো লঘু বা চঞ্চল নন এবং এ নিয়ে তাঁরা কোন সময়ে ঠাট্টা বা রসিকতাও করেন না।

হোমারের কাব্যে দেখা যায়, দেবতারা মৃত্যুহীন হলেও সর্ব শক্তিমান নন। বিভিন্ন রকমের ভাগ্য তাঁদের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। দেবতারাও এমন কি দেবরাজ জিউসও নিয়তির অধীন। সার্পিডন জিউসেরই ছেলে অথচ নিয়তিনির্দিষ্ট যে, সার্পিডনকে প্যাট্রোক্লাসের দ্বারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়। যে বিধি অখন্ড বিশ্বব্রহ্মান্ডকে পরিচালনা করেন, দেবরাজ জিউস তারই ধারক ও বাহক। তাইতো তিনি দেবী হিরাকে বলেন , ''কাল সকালে তোমাদের দেখবার সুযোগ হবে, সর্বশক্তিমান ক্রোনস-পুত্রের ইচ্ছায় আর্গীব বাহিনীর বর্শা যোদ্ধাদের আরো অনেকেই নিহত হবে। কারণ আমি তোমাদের জানাচ্ছি, শক্তিমান হেক্টর শত্রু-নিধনে কখনো ক্ষান্ত হবে না, যতদিন না একিলিস আবার সচেতন হয়ে ওঠে। যুদ্ধ যখন একেবারে নৌবহরের পাশে এমন কি জাহাজের পশ্চাদভাগে এসে যাবে, সেই চরম হতাশাময় পরিস্থিতিতে প্যাট্রোক্লাসের শবদেহ উপলক্ষ করেই হবে একিলিসের জাগরণ এই হচ্ছে বিধির বিধান।''১৩

হেক্টর প্যাট্রোক্লাসকে হত্যা করলে একিলিস প্রতিহিংসায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন এবং নিষ্ক্রিয়াবস্থা ত্যাগ করে যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। একিলিসের নেতৃত্বে একিয়ানরা ট্রয় নগরী অধিকার করার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। কিন্তু একিয়ানদের ট্রয় নগরী দখলের সময় তখনও হয়ে ওঠেনি। নিয়তি নির্দিষ্ট সময়ের আগে যাতে ট্রয়ের পতন না ঘটে সে জন্যে দেবতারা সচেষ্ট । একিয়ানরা যাতে নির্দিষ্ট সময়ের আগে ট্রয় নগরী অধিকার করতে সক্ষম না হয়, তার জন্যে দেবরাজ জিউস দেবতাদের যুদ্ধে অংশ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে এপোলোর কি প্রাণান্তকর প্রয়াস ! নির্ধারিত সময়েই ট্রয় ধ্বংস হবে - তার পূর্বে নয়। যদি তা হয় তা হলে সমস্ত পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এখানে দেখা যাচ্ছে - বিশ্ববিধান ও বিধি সময় সচেতন এবং দেবতারা সময়েরই আজ্ঞা পালনকারী।

গ্রীক দেবতাদের এবং মানুষদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত মিল লক্ষণীয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও বিশ্বাস করা হতো উভয় জাতির উৎসের মধ্যে সংযোগ বিদ্যামান। গ্রীক দেবতারা এমন অনেক বৈশিষ্ট্যকে আকড়িয়ে ধরে রেখেছেন যা দেবতার নয় মানুষের জন্যে উপযুক্ত। শুধু তাই নয়, তাঁদের অধিকাংশই কামুক অথবা প্রতিহিংসাপরায়ণ। দেবতারা মরজগতে নেমে এসে প্রত্যক্ষভাবে মানুষদের

Dhaka University Institutional Repository

সাথে যে রকম আচার-আচরণ , উঠা-বসা করেছেন তাতে তাঁদের অনেক সময় দেবতা বলে চিনতে কষ্ট হয়। প্রসঙ্গক্রমে প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আফ্রোদিতির কথা উল্লেখ করা যায়। দেবতাদের অনেকের পাশাপাশি মর্তের মানুষের সাথেও তাঁর প্রণয়সম্পর্ক ছিল। অ্যাংকাইসীজের সাথে তাঁর মিলনের ফলস্বরূপ ঈনিয়াসের জন্ম হয়। মর্তের মানুষদের মধ্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রেমিক হচ্ছেন অ্যাডোনিস। ' শ্রেষ্ঠা সুন্দরীর প্রাপ্য ' বাক্য উৎকলিত স্বর্ণ - আপেল প্যারিস আফ্রোদিতিকে প্রদান করার উপঢৌকন হিসেবে আফ্রোদিতি প্যারিসকে হেলেন অপহরণে সক্রিয় ভাবে সহায়তা করেছেন। পরবর্তীতে এ ঘটনার সূত্র ধরেই ট্রয় এবং গ্রীসের মধ্যে বিখ্যাত যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে তিনি প্যারিস তথা ট্রোজানদের পক্ষ অবলম্বন করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত প্যারিসকে উদ্ধার করতে গিয়ে গ্রীকবীর ডায়োমিডিসের অস্ত্রের আঘাতে আঘাত প্রাপ্তও হন তিনি।

Felix Guirands এর ' GREEK MYTHOLOGY' 'র অনুবাদক Dalano Ames ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন, "The figures that people Greek mythology fall into three groups. The first is that of the gods of Olympus, may of whom owe some attributes to the primitive fertility gods which they supplanted. The ideals that the gods embodied developed and changed with the growing sophistication of Greek civilisation. ..... The second category of Greek myths seeks to explain natural phenomena such as the sun, the moon, the winds, sea storms, the sea sons, fertility, and so forth. These myths are generally straight forward, details of the stories being often directly related to the natural phenomena concerned. The third category of myth centres on the heroes. These were mortals, but they often had at least one immortal ancestor ; and though they could be killed they were sometimes, like Hercules, admitted to Olympus on their death."[১৪] নিচে গ্রীক পুরাণের উল্লেখযোগ্য দেবদেবীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হয়েছে।

জিউস ঃ

গ্রীক পুরাণের প্রধান দেবতা । সমগ্র মর্ত্যভূমি-অনন্ত বায়ুমন্ডল এবং স্বর্গস্থ অলিম্পাস - এই ত্রিভুবনের একচ্ছত্র অধিপতি। দেবরাজ জিউস (Zeus) ক্রানাস ও রিয়ার কনিষ্ঠ পুত্র । তাঁর মাথায় কুঞ্চিত

Dhaka University Institutional Repository

কেশরাশি, মুখমন্ডল শ্মশ্রুমন্ডিত। ওক পাতার মুকুটে মন্ডিত তাঁর মস্তকদেশ । তাঁর হস্তধৃত ব্রজ্রদন্ডের দ্বারা তিনি মর্ত্যমানবদের সকল অধর্মাচরণের শাস্তি প্রদান করেন।

নিজের বোন হেরাকে তিনি বিয়ে করেন। হেরা বা হিরা (Hera) ছিলেন জিউসের প্রধানা মহিষী। এছাড়া তাঁর আরও ছয়জন মহিষী ছিলেন - মেতিস বা মেটিস, থেমিস, ইউরিলোম, দিমেতার বা দিমিতির, মিনোসাইন এবং লিটো বা লেটো। হেরার গর্ভে রণদেবতা অ্যারেস বা আরিস, অগ্নিদেবতা হেফেস্টাস বা হেফাস্টাস এবং যৌবনের দেবী হীবির জন্ম হয়। দিমিতিরের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন পার্সিফোন ; লেটোর গর্ভে অ্যাপোলো বা এপোলো এবং আর্টেমিস বা আর্তেমিস ; সেটিসের গর্ভে অ্যাথিনী বা এথেনা ; থেমিসের গর্ভে সময় ও ঋতু। অন্যান্য দেবী, পরী এবং টাইটানের সঙ্গেও জিউসের প্রণয়সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এদের গর্ভেও জিউসের অনেক পুত্রকন্যা জন্মে। নিমোসিনির গর্ভে মিউজগণ, ইউরোনমির গর্ভে সুষমাদেবীত্রয় জন্মগ্রহণ করেন।

এছাড়াও মাঝে মাঝে ছদ্মবেশ ধারণ করে মর্ত্যে গিয়ে বহু মর্ত্য মানবীর সঙ্গে গোপন প্রণয়লীলায় মেতে উঠতেন জিউস। এই সব ছদ্মবেশের মধ্যে জীবজন্তুর রূপই তিনি বেশি ধারণ করতেন। একবার নাকি তিনি এক পশলা স্বর্ণবৃষ্টিরূপে ঝরে পড়েন ড্যানী নামের এক মর্ত্য নারীর উপর। জিউস কিন্তু একবার নিজমুখে একথা স্বীকার করেন যে, মর্ত্যনারীরা তাঁকে তাঁর যথার্থ স্বরূপে কখনো ভালবাসে না । তারা তাঁকে না চিনেই মিলিত হয় ; চিনতে পারলে তাঁকে তারা কেউ চাইত না।

প্রণয়কলাবিশারদ সুচতুর জিউসের কাছ থেকে ক্ষণ প্রণয়ের ছলনা ছাড়া আর কিছুই পায়নি মর্ত্য মানবীরা । প্রতি মুহূর্তেই তারা জিউসের প্রধানা মহিষী হেরার চক্রান্তের শিকার হয়েছে। হেরার ভয়ে জিউস তাদেরকে অনায়াসে পরিত্যাগ করেছেন।

অবশ্য শুধু প্রেম নয়, অনেক সময় অনেক ন্যায় বিচারের খাতিরে এবং অনেক মর্ত্যমানবের আমন্ত্রণে বা অভিযোগের প্রেক্ষিতেও দেবরাজ জিউস মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হতেন। মানুষ হিসেবে যারা অসৎ ও নিষ্ঠুর তাদেরকে যথোচিত শাস্তিও প্রদান করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

দেবরাজ হিসেবে তিনি মেঘ, বৃষ্টি ও বজ্র নিয়ন্ত্রণ করতেন। প্রকৃতিও ছিলো তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। জিউসের বাহন হলো ঈগল। অলিম্পিয়ার মন্দিরে উপাস্য দেবতারূপে তাঁর মূর্তি পূজিত হয়।

রোমান পুরাণে জিউসের নাম হলো জুপিটার (Jupiter) । রোমান পুরাণের দেবরাজ জুপিটার গ্রীক পুরাণের দেবরাজ জিউসের চেয়ে অনেক সংহত এবং সংযত চরিত্র।

হেরা ঃ

গ্রীক পুরাণের দেবরাণী হেরা ক্রনাস ও রিয়ার কন্যা । জিউস, হেডিস, পোসাইডন, দিমিতির ও হেস্টিয়ার বোন। সহোদর জিউসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। হেরা বা হিরা (Hera) দেবরাজ জিউসের বৈধ তথা প্রধানা মহিষী। জিউসের ঔরসে হেরার গর্ভে অগ্নিদেবতা হেফেস্টাস, রণদেবতা অ্যারেস এবং যৌবনদেবী হীবির জন্ম হয়।

স্বামী জিউসকে নিয়ে হেরা কখনো শান্তি পাননি। তিনি হতে চেয়েছিলেন দেবরাজ জিউসের একমাত্র দয়িতা, হেরার সে কামনা সফল হয়নি। সারা জীবন ধরে তাঁকে স্বামীর অসংখ্য প্রেমের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করে বেড়াতে হয়েছে। ব্যক্তিজীবনে তিনি নিজে ছিলেন বড় অহঙ্কারী । এক অপরিসীম অহঙ্কার আর আত্মপ্রসাদের দুচ্ছেদ্য আবরণে তিনি নিজেকে সব সময় এমন ভাবে ঢেকে রাখতেন, যেন কোন পাপ প্রবৃত্তি প্রবেশ করতে না পারে। আজীবন তিনি তাঁর সতীত্বের শুচিতা এবং বিশ্বস্ততা থেকে ক্ষণকালের জন্যেও বিচ্যুত হন নি কখনো। তবে অহঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এক অনমনীয় প্রতিহিংসাপরায়ণতা গড়ে উঠেছিল তাঁর চরিত্রে। কোন দেবতা বা মানুষ কখনো সামান্যতম কোন অন্যায় করে বসলেই তিনি ক্রোধের আগুনে জ্বলে উঠতেন সঙ্গে সঙ্গে শাস্তির শাণিত তরবারি প্রস্তুত থাকত সব সময়। প্রাচীন গ্রীসে কেবল দেবরাণী বলেই হেরার মর্যাদা ছিল তা নয়। হেরা নিজে ছিলেন নারীদের রক্ষাকর্তী দেবী। যদিও নিজের বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না, তবু বিয়ের সুখশান্তি রক্ষার ভারও ছিল তাঁর হাতে।

আইরিস বা রামধনু ছিল তাঁর প্রধানা সহচরী ও দূতী। মর্ত্য ভূমিতে তাঁর কখনো কোন প্রয়োজন দেখা দিলে বিশেষ দূত হিসেবে আইরিস তাঁর সকল খবরাখবর বহন করে নিয়ে যেত । হেবি নামে তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

এক কন্যা গ্যানিমীডের সঙ্গে ভোজসভার টেবিলে খাবার পরিবেশন করত। এছাড়া একটি ময়ূর তাঁর ভৃত্য হিসেবে কাজ করত। পাখি হিসেবে কোকিলদেরও তিনি ভালবাসতেন।

জিউসের সঙ্গে হেরার অবনিবনা নিয়ে গ্রীক পুরাণে অনেক কাহিনী রয়েছে। হেরার গুপ্তচরবৃত্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে জিউস একবার হেরাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে পুত্র হেফেস্টাসকে দিয়ে কাঠের এক নারীমূর্তি বানিয়ে সেই মূর্তিকে বিয়ে করার মহড়া দেন। খবর পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসেন হেরা। অবস্থা প্রতিকূল দেখে জিউস প্রকৃত ঘটনাটা ফাঁস করে দেন।

স্বর্গের রাণী হেরা সাধারণতঃ আর্গসের সামস আর অলিম্পিয়ার মন্দিরে পূজিত হন। রোমান পুরাণে হেরাকে জুনো (Juno) বলা হয়। সেখানে তিনি শান্ত ও আত্মস্থ প্রকৃতির। তিনি বিবাহিত নরনারীর সুখশান্তি রক্ষা করে চলেন। হেরার মত যত সব অবৈধ প্রেমের ঘটনার পেছনে ছুটে বেড়িয়ে ষড়যন্ত্র করে বেড়ান না।

ইউরেনাস ঃ

গ্রীক পুরাণের আদি দেবতা। আকাশ ও স্বর্গের প্রথম অধিপতি ইউরেনাস (Uranus)- এর সঙ্গে ধরিত্রীদেবী গেইয়ার বিয়ে হয়। গেইয়ার গর্ভে জন্ম নেয় তিন শ্রেণীর জীব - টাইটান, একচক্ষু সাইক্লোপস এবং শতহস্তধারী হেকাটনচেরী। ইউরেনাসের সঙ্গে গেইয়ার বনিবনা ছিল না এবং সেই কারণে গেইয়া তাঁর পুত্রদেরকে ইউরেনাসের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলেন।

সর্বকনিষ্ঠ টাইটান ক্রোনাস তাঁর মাতা গেইয়ার অনুরোধে একটি ধারালো কাস্তে দিয়ে নির্বীর্য করে পিতার সিংহাসন দখল করেন । ইউরেনাস ক্রোনাসকে অভিশাপ দিয়ে আকাশলোকে চলে যান।

হেসিওডের কাহিনীতে আছে ইউরেনাসের ক্ষতস্থানের পতিত রক্ত থেকে তিন এরিনিজ ও অ্যাশপরীর জন্ম হয়। ইউরেনাসের কর্তিত অন্ড সমুদ্রে পতিত হলে তা ফেনপুঞ্জ দিয়ে আবরিত হয় এবং তা থেকেই আফ্রোদিতি জন্ম লাভ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

গেইয়া ঃ

গ্রীক পুরাণের পৃথিবী দেবী হচ্ছেন গেইয়া (Gaea) হেসিওডের থিওগোনির বর্ণনা অনুযায়ী ক্যাওস থেকে তিনি ইউরেনাস, নিক্স, এরিবাস ও এরসের সঙ্গে জন্ম লাভ করেন। আকাশদেবতা ইউরেনাসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

পর্যায়ক্রমে তিনি বিভিন্ন জীব ও দেবতার জননী হন। ইউরেনাসের ঔরসে তাঁর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে তিন শ্রেণীর জীব - টাইটান, সাইক্লোপস ও হেকাটনচেরী। নিজ পুত্র সাগরদেবতা পন্টাসের সঙ্গে মিলনের ফলে গর্গনদের পিতামাতা ফোর্সিস ও কেটোর জন্ম হয়। আরেক পুত্র সমুদ্রদেবতা পোসাইডনের ঔরসে তিনি আন্তেউসের জননী হন।

এপোলো ঃ

গ্রীক ও রোমান পুরাণের সবচেয়ে সুদর্শন দেবতা । জিউস ও লেটোর পুত্র হচ্ছেন এপোলো বা অ্যাপোলো বা এ্যাপোলো (Apollo)। লেটো বা লিটো গর্ভবতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হেরা তা জেনে যান এবং তাঁর ভয়ঙ্কর রোষ থেকে বাঁচার জন্যে তিনি ডেলসে পালিয়ে যান। এই ডেলসেই তিনি যমজ সন্তান প্রসব করেন - এক পুত্র (এপোলো) এবং এক কন্যা (আর্টেমিস)।

এপোলো ' ফীবাস এপোলো ' নামেও পরিচিত। ফীবাস শব্দের অর্থ উজ্জ্বলতা। এজন্যে এপোলো প্রায়শই সূর্যদেবতা হেলিওস বা হেলিয়স (Helios)- এর সাথে অভিন্নরূপে পূজিত হতেন। এপোলোর আর এক নাম হলো হাইপীরিয়ন বা হাইপেরিয়ন।

এপোলো রোগ নিরাময়, ভবিষ্যদ্বাণী, সংগীত, ধনুর্বিদ্যা, যৌবন ও আলোকের দেবতা । তাঁর অধীনে ছিলেন শিল্পকলার ন'টি বিভাগের ন'জন অধিষ্ঠাত্রী দেবী - ক্লিও (ইতিহাস), ইউতারপে (গীতিকবিতা), থেনিয়া (মিলনান্ত নাটক), মেলপোমেলে (বিয়োগান্ত নাটক), তার্পিশোর (নাটক ও গান), ইরাতো (প্রেমসঙ্গীত), পলিমিয়া (গুরুগম্ভীর স্তোত্র গান), ইউরানিয়া (জ্যোতির্বিদ্যা) এবং ক্যালিওপ (মহাকাব্য) । এই সব দেবীদের প্রিয় মিলনস্থান হলো মাউন্ট হেলিকন আর পার্ণেসাস পাহাড় আর সেই সংলগ্ন কাস্টালিয়ন ঝর্ণা। এই ঝর্ণার জলে যত সব কবি ও শিল্পীরা স্নান করে তাদের আরাধ্য দেবতা পীবাস এপোলোর উপাসনা করে।

Dhaka University Institutional Repository

জিউসের বজ্রনির্মাণকারী সাইক্লোপসদের , মতান্তরে পবিত্রস্থান ডেলফির বিখ্যাত ড্রাগন পাইথনকে হত্যা করার অপরাধে এপোলোকে জিউসের আদেশে এক বছরের জন্যে রাজ অ্যাডমিটাসের দাসত্ব করতে হয়। ডেলফিতেই অ্যাপোলো তাঁর বিখ্যাত দৈববাণীর মন্দির স্থাপন করেন। স্বর্গ থেকে মর্ত্যলোকে যে সকল আকাশ বাণী শোনা যায় দৈববাণীর দেবতা এপোলোই তাঁর ব্যবস্থা করে থাকেন। এছাড়া এপোলো হলেন সকল প্রাণের উৎসস্বরূপ এবং রোগনিরাময়েরও দেবতা। তাঁর পুত্র এসক্যালাপিয়াস বা এসক্রেপিয়াস (এপোলোর ঔরসে করোনিসের গর্ভে জাত) - এর মধ্যে এই দুটি গুণের বেশি পরিচয় পাওয়া যায়।

মানুষের মত ভালমন্দ দুটি গুণই ছিল এপোলোর চরিত্রে। তাঁর এক হাতে বীণা এবং আর এক হাতে ধনুর্বাণ দেখা যায় । যে সকল শিল্পী এবং ভাস্করেরা এপোলোর ভক্ত তারা প্রায়ই এক বিশেষ মূর্তিতে মূর্ত করে তোলে এপোলোকে। অপূর্ব যৌবনশ্রীসম্পন্ন সে মূর্তি হলো সম্পূর্ণ নগ্ন । মাথায় লরেন পাতার মুকুট। রোমের ভাটিকানে এই ধরনের একটি মূর্তি আছে সূর্য দেবতা, শিল্পকলার দেবতা এপোলোর। চির যুবক, চির সুন্দর এপোলের শ্রেষ্ঠতম পরিচয় হলো তিনি মানবপ্রেমিক। মার্জিত রুচিসম্পন্ন ভক্তদের প্রতি বিশেষ ভাবে অনুগ্রহশীল তিনি। সার্বিক ভাবে গ্রীকধর্ম ও গ্রীক পুরাণের একটি দিককে নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল ও গৌরবময় করে তুলেছেন একা এপোলো।

আর্টেমিস ঃ

গ্রীক পুরাণের অরণ্যদেবী। জিউস ও লেটোর কন্যা । এপোলো এবং আর্টেমিস বা আর্তেমিস (Artemis) যমজ ভাইবোন । গ্রীক পুরাণে আর্টেমিসকে চিরকাল অরণ্যচারী এবং চিরকুমারী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে । বনপরীরা তাঁর সহচরী এবং তাঁরাও আর্টেমিসের মতো চিরকুমারী। দেবতা কিংবা মানুষ কেউই আর্টেমিস এবং তাঁর সহচরীদের ভালবাসা পাননি। তবে কিছুকালের জন্যে বিখ্যাত শিকারী ওরাইয়নের সঙ্গে আর্টেমিসের সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ওরাইয়ন এপোলোর চক্রান্তে আর্টেমিসের হাতেই নিহত হন।

আর্টেমিস অতি সামান্যেই উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁর বিরাগভাজনদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। নাইওবীর সাত কন্যাকে তিনি হত্যা করেন এবং তাঁর অভিশাপেই অ্যাকটিয়ন মৃগরূপ ধারণ

Dhaka University Institutional Repository

করে আপন শিকারী কুকুরদের দ্বারা নিহত হন। গ্রীস ও ট্রয়ের যুদ্ধে তিনি ভাই এপোলোর সঙ্গে ট্রোজানপক্ষ অবলম্বন করেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে হেরা কর্তৃক প্রহৃত হয়ে তিনি পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

রোমান পুরাণে আর্টেমিসকে ডায়ানা বা ডায়েনা (Diana) বলা হয় । সেখানে ডায়ানাকে নিয়ে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে।

এথেনী ঃ

গ্রীক পুরাণের জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুদ্ধবিগ্রহ ও চারুশিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এথেনী বা অ্যাথিনী বা এথেনা বা এথেন (Athene) - কে গ্রীক নগরসমূহের বিশেষ করে এথেন্সের প্রধান রক্ষক বলা হতো। তাঁর নামানুসারেই গ্রীস দেশের রাজধানী এথেন্সের নামকরণ করা হয়। দেবীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই কঠোরভাবে সতীত্ব রক্ষা করে চলতেন।

চিরকুমারী এথেনী 'প্যালাস এথেনী ' নামেও অভিহিত হয়ে থাকেন । কথিত আছে, প্যালাস নামে তাঁর এক প্রিয় সখী ছিল। একদিন খেলার সময় দুর্ঘটনাক্রমে তাঁর হাতেই প্যালাস নিহত হয়। শোকার্ত এথেনী নিহত সখীর স্মরণে নিজের নামের আগে তার নাম যুক্ত করে নেন। অন্য কাহিনীতে আছে, প্যালাস নামে এক টাইটানকে হত্যা করার পর তিনি এই ঘটনার স্মারক হিসেবে নিজের নামের আগে প্যালাস যুক্ত করে নেন।

এথেনী জিউসের প্রথম স্ত্রী মেটিসের কন্যা । মেটিসের গর্ভস্থ সন্তান জিউসের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে - এই দৈববাণীতে ভীত হয়ে জিউস গর্ভবতী মেটিসকে গিলে ফেলেন। এর কিছুদিন পর জিউস মাথায় অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকেন । তাঁর মনে হতে থাকে মাথা ভেদ করে কিছু যেন একটা বেরিয়ে আসতে চায় । দেব-কারিগর হেফেস্টাস তখন কুড়ুল দিয়ে জিউসের মাথা ফাঁক করে দেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই পূর্ণ যুবতী এথেনী রণরঙ্গিণী বেশে রণহুংকারে চ'রদিক কাঁপিয়ে আবির্ভূত হলেন।

এথেনীর প্রিয় প্রাণীরা হলো সাপ, মোরগ এবং পেঁচা । তাঁর মূর্তিটি সব সময় গম্ভীর এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। যে সব নিন্দা ও বদনামের দ্বারা অন্যান্য কুমারী দেবীদের নাম কলঙ্কিত, সে সমস্ত নিন্দা থেকে এথেনী সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। এমনকি কামদেবী কিওপিডও এথেনীর উপর ফুলশর হেনে তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

মনকে কখনো কামচঞ্চল করে তুলতে পারতেন না। উল্টো তিনি এথেনীর রণ মূর্তি দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তেন। তাঁর মূর্তিটিতে পৌরুষসুলভ এক তেজস্বিতা পরিষ্কার ফুটে আছে। যুদ্ধ - বিগ্রহ থেকে শুরু করে কোন ক্ষেত্রেই কোন সময়েও তিনি কখনও নারীসুলভ দুর্বলতার পরিচয় দেননি। রোমান পুরাণে এথেনীকে মিনার্ভা (Menerva) বলা হয়। সেখানে তিনি শুধু শিল্পকলারই অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে শিল্পীদের উৎসাহ দেন।

আফ্রোদিতি ঃ

গ্রীক পুরাণের প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী । হোমারের বর্ণনায় আফ্রোদিতি বা আফ্রোদিতে বা এ্যাফ্রোদিতে (Aphrodite) জিউস ও ডাইওনের কন্যা। কিন্তু হেসিওডের বর্ণনায় তিনি ' আফ্রোস ' বা সমুদ্র ফেনা থেকে উদ্ভুত। গ্রীক ভাষায় আফ্রোদিতে শব্দের অর্থই হলো সমুদ্রোদ্ভূতা। মাতার অনুরোধে ক্রোনাস পিতা ইউরেনাসকে একটি ধারালো কাস্তে দিয়ে নিবীর্য করে দেন। ইউরেনাসের কর্তিত অন্ড সমুদ্রে পতিত হলে তা সমুদ্রের ফেনপুঞ্জ দ্বারা আবরিত হয় এবং সেখান থেকেই উদ্ভূত হন আফ্রোদিতি। তাঁর জন্ম সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। তা হলো এই যে, ইউরেনাস গ্রহ কক্ষচ্যুত হয়ে পড়লে পৃথিবীর সপ্ত সমুদ্রের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। সেই বিক্ষোভকালে সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ ও উত্তাল তরঙ্গমালা থেকে উঠে আসেন আফ্রোদিতে । জন্ম মূহূর্তেই তিনি পূর্ণবিকশিতা ও স্ফুটযৌবনা।

দেবীরূপে আফ্রোদিতি প্রথম অভিষিক্ত হন সাইপ্রাসের সিথেরায়। সমুদ্রে জন্ম বলে তিনি সেখানে পূজিত হতেন নাবিকদের দেবীরূপে। স্পার্টায় তিনি পূজিত হন যুদ্ধদেবীরূপে। এর পর গ্রীক ও রোমান পুরাণে প্রথমে তিনি সৌন্দর্য , বিবাহ ও গৃহদেবীরূপে অধিষ্ঠিত হন এবং পরবর্তীকালে তিনি শুধু প্রেমের দেবীরূপেই পূজিত হতে থাকেন। উল্লেখ্য, রোমান পুরাণে আফ্রোদিতের নাম ভেনাস (Venus)

প্রেমের দেবী আফ্রোদিতের নিজেরই অসংখ্য প্রেমকাহিনী রয়েছে। অগ্নিদেবতা খঞ্জ হেফেস্টাসের সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ রণদেবতা অ্যারেস এবং বার্তাবাহী দেবতা হার্মিসের সঙ্গে তাঁর গভীর প্রণয় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অ্যারেসের ঔরসে তাঁর বিখ্যাত পুত্র কামদেবতা এরস বা কিউপিড ও কন্যা হারমোনিয়ার এবং হার্মিসের ঔরসে পুত্র হার্মাফ্রোদিতাসের জন্ম হয়। মর্ত্যের মানুষের সঙ্গেও আফ্রোদিতের প্রণয়সম্পর্ক ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

দেবী আফ্রোদিতের অন্যতম সহচরী হচ্ছে হাইমেন। হাইমেনের হাতে মশাল আছে। মশাল হাতে হাইমেন কোন বিয়ের সময় কোরাস দলের নেতৃত্ব করে । ইউফ্রাসিনে, আগলাইয়া ওথেলিয়া - এই তিন জিয়াস কন্যা ছিল আফ্রোদিতের অবিরাম সহচরী। প্রেমের দেবী হয়েও তিনি পুত্রবধূ সাইকিকে নিদারুণ কষ্ট দিয়েছিলেন।

হেফাস্টাস ঃ

গ্রীক পুরাণের দেবকারিগর ও অগ্নিদেবতা। জিউস ও হেরার পুত্র হচ্ছেন হেফাস্টাস বা হেফেস্টাস বা হিফাস্টাস (Hephaaestus) । অবশ্য হেফাস্টাসের জন্ম নিয়ে মতভেদ আছে। হেসিওডের বর্ণনা অনুযায়ী এথেনী জিউসের মস্তক ভেদ করে বেরিয়ে এলে হেরা জিউসের কাছে নিজ ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্যে জিউসের সংসর্গ ছাড়াই হেফাস্টাসের জন্ম দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হেফেস্টাস খঞ্জ হয়ে জন্ম গ্রহণ করায় শিশু হেফাস্টাসকে জিউস কিংবা হেরা কেউই ভালো চোখে দেখেননি। শেষ পর্যন্ত হেরা হেফেস্টাসের খঞ্জত্ব ও কদাকার চেহারা দেখে লজ্জা ও ঘৃণায় হেফাস্টাসকে স্বর্গ থেকে নিচে ফেলে দেন। মর্ত্যে পতিত হেফাস্টাসকে কুড়িয়ে নেন ইউরোনমি ও সাগরপরী থেটিস। তাঁরা গোপনে হেফেস্টাসকে লালন পালন করতে থাকেন।

বড়ো হওয়ার পর হেফেস্টাস মাতা হেরার জন্যে এক অদ্ভুত সুবর্ণ সিংহাসন তৈরি করে স্বর্গে পাঠিয়ে দেন। সিংহাসনটিতে বসলেই অদৃশ্য স্বর্ণতন্তুজাল এসে ঘিরে ধরতো উপবেশনকারীকে । কেউ এসে সেই জাল সরিয়ে না দিলে উপবেশনকারীর নিজের সিংহাসন থেকে ওঠার ক্ষমতা দিলো না। আর এই জাল সরানোর কৌশল শুধু হেফাস্টাসই জানতেন। ফলে সিংহাসনটি পেয়েই হেরা তাতে বসে পড়েন, কিন্তু আর উঠতে সক্ষম হননি। তখন ডাক পড়ে হেফাস্টাসের। হেফাস্টাস স্বর্গে এসে হেরাকে সিংহাসনমুক্ত করলে হেরা তাঁকে স্বর্গে থেকে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

কিন্তু এই অদ্ভুত সিংহাসন নিয়ে একদিন জিউস ও হেরার মধ্যে দ্বন্দ্ব বেধে যায়। সে দ্বন্দ্বে হেফাস্টাস মায়ের পক্ষ নেন। ফলে ক্রুদ্ধ জিউস আবার হেফেস্টাসকে স্বর্গ থেকে ফেলে দেন। অনেক পরে অবশ্য হেফাস্টাস পুনরায় স্বর্গে ফিরে আসার অনুমতি পান।

Dhaka University Institutional Repository

খঞ্জ এবং কদাকার চেহারার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হেফাস্টাসের স্ত্রীভাগ্য ছিলো খুবই ভালো। দুইজন চ্যারিটি এবং প্রেমের দেবী আফ্রোদিতেকে তিনি স্ত্রীরূপে লাভ করেন। এর মধ্যে আফ্রোদিতের সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয়নি। আপন স্বামী থাকা সত্ত্বেও আফ্রোদিতে অবাধে দেবতা ও মানুষদের সঙ্গে দেহমিলনে রত হয়েছেন।

হেফাস্টাসের দেহটা অন্যান্য দেবতাদের মত সৌম্য ও সুদর্শন না হলেও স্থাপত্য কারিগরী বিদ্যায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তিনি রসিকতা বা বিলাসব্যসন পছন্দ করতেন না। অলিম্পাসের মধ্যে যত রত্ন ও মণিমানিক্য মন্ডিত বড় বড় প্রাসাদ ছিল তা সব হেফাস্টাসের হাতে তৈরি । জিউসের অনেক বজ্রদন্ডও তিনিই নির্মাণ করেন। এছাড়া পৌরাণিক বীরদের যত সব অস্ত্র যেমন- একিলিসের বর্ম, এ্যাগামেননের রাজদন্ড ইত্যাদি তিনি নির্মাণ করেন।

প্রাচীন গ্রীসে হেফাস্টাস আগুন ও শিল্পকলার দেবতা হিসেবে চারুশিল্পের দেবী এথেনীর পাশাপাশি পূজিত হতেন। কর্মকার এবং স্বর্ণকারদের প্রধান দেবতা ছিলেন তিনি। রোমান পুরাণের ভালকান (Vulcan) হেফাস্টাসের সমতুল্য দেবতা।

পোসিডন ঃ

সমুদ্র ও মহাসমুদ্রের প্রধান অধিপতি দেবতা । ক্রনাস ও রিয়ার পুত্র এবং জিউস, হেরা, হেডিস, দিমিতির ও হেস্টিয়ার ভ্রাতা হচ্ছেন পোসিডন বা পসিডন বা পসেডন বা পোসাইডন (Poseidon)। অন্যতম সুপ্রাচীন গ্রীকদেবতা পোসিডন পৃথিবীর সকল সাগর, উপসাগর, নদ-নদী এবং ঝর্ণাধারার জন্মদাতা ।

পিতা ক্রনাসকে স্বর্গ থেকে বিতাড়নের পর জিউস, হেডিস এবং পোসিডন ক্রনাসের সাম্রাজ্য নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেন। এই বন্টনের সময় সমুদ্র ও মহাসমুদ্রের অধিপতি হন পোসিডন। এনিয়ে অবশ্য জিউসের উপর তাঁর তীব্র ক্ষোভ ছিল। আসলে পোসিডন চেয়েছিলেন স্বর্গশাসনের ভার। তাই জিউস কন্যা এথেনী এবং জিউস পত্নী হেরাকে হাত করে তিনি জিউসকে সিংহাসনচ্যুত করারও ষড়যন্ত্র করেছিলেন। জিউস এই প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেওয়ায় পোসিডনকে সমুদ্র নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সাম্রাজ্যের মালিকানা ও সীমানা নিয়ে শুধু জিউস নয়, অনেক দেব-দেবীর সঙ্গেই তাঁর বিরোধ ছিল। প্রথমদিকে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রী এথেনীর প্রচন্ড সমর্থক থাকলেও পরবর্তীতে এথেন্সের নামকরণ নিয়ে তাঁর সঙ্গে বিরোধ বাধে। এ ছাড়াও আর্গস নিয়ে হেরার সঙ্গে, করিন্থ প্রণালী নিয়ে সূর্যদেবতা হেলিওসের সঙ্গে, নাক্সোস দ্বীপ নিয়ে ডায়োনিসাপসের সঙ্গে এবং ডেলফি নিয়ে এপোলোর সঙ্গে তার সার্বক্ষণিক বিরোধ ছিল। মাঝে মাঝে তিনি বিপজ্জনক সামুদ্রিক ঝড় ও ভূমিকম্প সৃষ্টি করে অঘোষিত যুদ্ধ বাধিয়ে বসতেন দেবতাদের সঙ্গে। এজন্যে মানুষের কাছে তিনি খামখেয়ালী এক ভয়ংকর দেবতা হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন, যদিও তাঁর চেহারা ছিল খুব সুন্দর।

সুবিশাল সমুদ্রগর্ভে ফসফরাসের আলোয় আলোকিত এক সচল সুবর্ণ প্রাসাদের তিনি বাস করতেন। সাগরপরী অ্যাম্ফিত্রিতি তাঁর একমাত্র বৈধ মহিষী । অ্যাম্ফিত্রিতির গর্ভে ট্রাইটনের জন্ম হয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জিউসের মত পোসিডনও প্রণয় কলবিশারদ ছিলেন। কখনো দেববেশে, কখনো মানববেশে, আবার কখনো বা পশুবেশে বিভিন্ন নারীর সঙ্গে তাঁর ক্ষণপ্রণয়ের ফলশ্রুতিতে তিনি আন্তেউস, পলিফেমাস , এরাইয়ন, থিসিউস প্রমুখের পিতা হন।

পলিফেমাসকে অন্ধ করে দেওয়ার অপরাধে পোসিডন গ্রীকবীর ওডিসিউসকে সমুদ্র পথে নিদারুণ দুঃখ দুর্দশার মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন। পোসিডনের কোপের ফলেই ওডিসিউসকে দীর্ঘকাল বিভিন্ন বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে থাকতে হয়েছে।

গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারার অধিকারী ত্রিশূলধারী পোসিডন সমুদ্রদেবতা হলেও প্রাচীন গ্রীসের কোন কোন অঞ্চলে তিনি অন্যভাবেও পূজিত হতেন। মানুষের ব্যবহারের জন্যে তিনি ঘোড়াকে পোষ মানিয়ে দিয়েছিলেন এবং মানবজাতিকে ঘোড়ার ব্যবহার শিখিয়ে ছিলেন। এজন্যেও তাঁকে পূজা করা হতো।

রোমান পুরাণে পোসিডনের সমতুল্য দেবতা হলেন নেপচুন (Neptune)।

Dhaka University Institutional Repository

দিমেতার ঃ

গ্রীক পুরাণের ফলমূল ও শস্যের দেবী। একই সাথে দেবরাজ জিউসের ভগ্নি ও পত্নী । দিমেতার বা দিমিতির বা ডেমেটর (Demeter)- এর গর্ভে জিউসের ঔরসে কন্যা পার্সিফোনের জন্ম হয়। এ ছাড়া মর্ত্যমানব আয়াজিয়নের সঙ্গে মিলনের ফলে তিনি ধনদেবতা প্লুটাসের মাতা হন।

গ্রীক ক্ল্যাসিক সাহিত্যে পার্সিফোনের কারণেই দিমেতারের খ্যাতি সবচেয়ে বেশি। পাতালরাজ হেডিস পার্সিফোনকে গোপনে হরণ করে নিয়ে যান। একমাত্র কন্যা পার্সিফোনকে দিমেতার অত্যন্ত ভালবাসতেন। কন্যাকে হারিয়ে তিনি পাগলপ্রায় হয়ে মশাল হাতে স্বর্গ-মর্ত্য -পাতালের সবস্থানে পার্সিফোনকে খুঁজে বেড়াতে থাকেন। অবশেষে সূর্যদেবতা হেলিওস দিমিতিরকে পার্সিফোনের সন্ধান বলে দেন।

পার্সিফোনকে হেডিস অপহরণ করলেও দিমিতির সেই অপহরণের সমস্ত দোষ চাপান জিউসের ওপর। প্রচন্ড অভিমানে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকেন। ফলে পৃথিবীতে ফসলের ফলন বন্ধ হয়ে যায়। বুভুক্ষু মানুষ ও পশুর হাহাকারে ভরে ওঠে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস। মানুষ ও দেবতারা তখন বাধ্য হয়ে দেবরাজ জিউসের শরাণাপন্ন হন। তিনি পার্সিফোনকে ফিরিয়ে আনার জন্য হার্মিসকে মৃত্যুপুরীতে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পার্সিফোন পাতালপুরীর ফল খেয়ে ফেলায় হার্মিস ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। জিউস তখন বিধান দেন, বছরের মধ্যে আট মাস পার্সিফোন থাকবেন তার মায়ের কাছে আর বাকি চার মাস তিনি পাতালরাণী হয়ে থাকবেন স্বামী হেডিসের কাছে। দিমেতার বাধ্য হয়ে উক্ত বিধান মেনে নেন। সেই থেকে পার্সিফোন যে চার মাস পাতাল পুরীতে থাকে সেই চার মাস পৃথিবীতে থাকে শীতকাল।

ইলিউসিসের রাজা সেলিউসের পুত্র ডিমোফুন দিমিতিরের আশীর্বাদে পরে ট্রিপ্টলেমাস নামে বিখ্যাত হন। দিমেতার ট্রিপ্টলেমাসের মাধ্যমে মর্ত্যলোকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেন। ট্রিপ্টলেমাস কথাটির অর্থ হলো তিনবার কর্ষিত। পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা করা, দেবতাদের পূজা করা এবং মানুষের কোনো ক্ষতি না করা, এই তিনটি গুণের অনুশীলনের জন্য মানুষকে সকল সময় উৎসাহ দিতেন ট্রিপ্টলেমাস।

Dhaka University Institutional Repository

রোমান পুরাণে দিমেতারের সমতুল্য দেবীর নাম হলো সিরিস (Ceres)। প্রাচীন রোমে তাঁকে মাতৃদেবী হিসেবে উল্লেখ করা হতো।

অ্যারেস ঃ

গ্রীক পুরাণের রণদেবতা । জিউস ও হেরার পুত্র । অ্যারেস বা এ্যারেস বা আরিস (Ares) রণদেবতা হলে গ্রীক পুরাণে তার রণ বা যুদ্ধ বিষয়ক কাহিনীর উল্লেখ খুব বেশি পাওয়া যায় না। তাঁর বীরত্বও দেবতাদের জন্যে খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক ছিল না।

আলোয়াদাইরা স্বর্গ দখলের চেষ্টা করলে দেবতাদের সঙ্গে তাদের যে যুদ্ধ হয় সে যুদ্ধে রণদেবতা অ্যারেস নিজেই তাদের হাতে বন্দী হন। আলোয়াদাইরা একটি পিতলের পাত্রে অ্যারেসকে আটকে রাখেন। তেরো মাস আটক থাকার পর হার্মিসের কৌশলে অ্যারেস মুক্তি পান।

অ্যারেস এবং আফ্রোদিতিকে নিয়ে গ্রীক পুরাণে বহু উপাখ্যান রয়েছে। উভয়ের প্রেমঘটিত মাখামাখি প্রথমে লক্ষ্য করেন সূর্যদেবতা হেলিওস এবং তিনিই আফ্রোদিতির স্বামী দেবকারিগর হেফেস্টাসকে ঘটনাটা জানিয়ে দেন। হেফেস্টাস সুযোগমতো একদিন গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ অ্যারেস ও আফ্রোদিতিকে সূক্ষ্ম লোহার জালে আটকে ফেলে দেবতাদের কাছে বিচারের জন্যে উপস্থিত করেন। অ্যারেস ও আফ্রোদিতের মিলনের ফলে কামদেবতা এরস, বিরহদেবতা অ্যান্টিরস এবং হারমোনিয়ার জন্ম হয়।

রোমান পুরাণে অ্যারেসের নাম মার্স (Mars) । গ্রীক অ্যারেসের তুলনায় রোমান মার্স অনেক মর্যাদাসম্পন্ন ।

হার্মিস ঃ

দেবলোকের সংবাদ বহনকারী দেবতা । জিউস ও মাইয়ার পুত্র । হার্মিস (Hermes) দেবলোকের সংবাদ বহন করে স্বর্গ ও মর্ত্যলোকে সমান ভাবে বিচরণ করতেন। তিনি সুদর্শন উদ্যমশীল ও দ্রুতগামী এক যুবক ।তাঁর টুপি এবং পায়ের পাদুকা দুটিই ছিল পক্ষবিশিষ্ট। তিনি অ্যাপোলোর কাছ থেকে একটি মুকুট পান। মুকুটটি ছিল সাপে ভরা।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রীক পুরাণে হার্মিসকে ভাগ্য , সম্পদ এবং বণিক ও তস্করদের পৃষ্ঠপোষক দেবতারূপেও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন গ্রীসের কোন কোন অঞ্চলে তিনি উর্বরতার এবং সড়ক দেবতারূপেও পূজিত হতেন। দেবতা হার্মিসের আরেক দায়িত্ব হলো মৃতরা যাতে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হেডিসে চলে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করা। দেবরাজ জিউস হার্মিসকে বিশ্বাস করতেন সবচেয়ে বেশি। পুত্র হার্মিসকে তিনি প্রেম সম্পর্কিত দৌত্যকর্মে নিয়োগ করতেও সংকোচ করতেন না । দেবী আফ্রোদিতের সঙ্গে হার্মিসের প্রণয় সম্পর্ক ছিল। তাদের মিলনের ফলে হারমাফ্রোদিতাসের জন্ম হয়।

গ্রীক জনজীবনে হার্মিসের প্রভাব অপরিসীম। তার প্রমাণ শুধু অলিম্পিয়াতে নয় গ্রীস দেশের বিভিন্ন শহরের বড় বড় রাস্তার মোড়ে হার্মিসের মূর্তি স্থাপিত রয়েছে যুগ যুগ ধরে।

রোমান পুরাণে হার্মিসের সমতুল্য দেবতা হলেন মার্কারি (Mercury)

হেডিস ঃ

পাতালপুরীর অধিপতি দেবতা। গ্রীক পুরাণে পাতাল পুরীর নামও হেডিস। হেডিস (Hades) ক্রনাস ও রিয়ার পুত্র এবং জিউস, হেরা, পোসিডন, দিমিতির ও হেস্টিয়ার ভাই। পিতা ক্রনাসকে বিতাড়িত করে জিউস, পোসিডন এবং হেডিস -এই তিন ভাই মিলে স্বর্গমর্ত্য, সমুদ্র ও পাতালপুরী ভাগ করে নেন। হেডিসের ভাগে পড়ে পাতালপুরী।

জিউস ও দিমিতিরের কন্যা পার্সিফোনকে তিনি অপহরণ করে বিয়ে করেন। হেডিস কর্তৃক পার্সিফোন অপহরণ গ্রীক (এবং রোমান) পুরাণের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। দ্বিশূলধারী হেডিস অপর দু'ভাই জিউস ও পোসিডনের মতো নিজেও প্রেম করে বেড়াতেন এবং স্ত্রী পার্সিফোনের দ্বারা সর্বদা তিরস্কৃত হতেন। পার্সিফোনের ভয়ে হেডিসও বহু নারীকে জীবজন্তু ও গাছপালাতে রূপান্তরিত করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জনের সাথে প্রেম করে বেড়ানো সত্ত্বেও হেডিস ছিলেন সদা গম্ভীর। উল্লেখ্য, দেবতা এবং মানুষ সকলেই হেডিসকে ভয়ের চোখে দেখতেন। জিউস ও পোসিডনের মতো তাঁর মুখও ঘন শ্মশ্রুমন্ডিত এবং মাথায় কুঞ্চিত কেশরাশি । মনে হয় এক ধরনের বিষাদ যেন তাঁকে সব সময় ঘিরে রেখেছে। হেডিস তাঁর পাতালরাজ্যকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন - এরিবাস এবং টার্টারাস । এরিবাস হলো তমসারাজ্য এবং টার্টারাস হলো নিকৃষ্টতম পাপীদের শাস্তির স্থান। হেডিসের অধীনে তিনজন

Dhaka University Institutional Repository

বিচারক মৃত আত্মাদের পাপপুণ্যের বিচার করে থাকেন। বিচারকরা হলেন - মাইনস্, র‍্যাডামান্থিস এবং ঈয়াকাস। প্রথমে হেডিস নিজেই মৃত আত্মাদেরকে পাতালপুরীতে নিয়ে আসতেন। পরে হার্মিস এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হেডিসের পবিত্র গাছ সাইপ্রেস এবং পবিত্র ফুল নার্সিসাস।

হেডিসের অপর নাম প্লুটো। প্লুটো হিসেবে তিনি মাটির নিচের যাবতীয় খনিজ সম্পদের মালিক। এছাড়াও খাদ্যশস্য ও ফলমূল যেহেতু মাটির নিচের রস পেয়ে জন্মায় এবং বেঁচে থাকে, সেজন্য তিনি কখনো কখনো খাদ্য শস্যের দেবতারূপেও পূজিত হতেন।

রোমান পুরাণে হেসিসের প্লুটো (Pluto) নামকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হেস্টিয়া ঃ

গ্রীক পুরাণের পারিবারিক সুখ শান্তি এবং চুল্লির দেবী। ক্রনাস ও রিয়ার কন্যা এবং জিউস, হেডিস, পোসিডন, হেরা ও দিমিতিরের বোন। গ্রীক দেবদেবীদের মধ্যে হেস্টিয়া বা হেস্তিয়া (Hestia) ছিলেন অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় দেবী। দেবতা কিংবা মানুষের কোন ব্যাপারেই তিনি নিজেকে জড়িত করেন নি। এ ছাড়া কারো প্রেমের আহ্বানেও তিনি সাড়া দেননি। আজীবন তিনি কুমারীত্ব রক্ষা করেছেন।

প্রাচীন গ্রীসে হেস্টিয়ার সম্মানার্থে রাষ্ট্রীয়ভাবেও চুল্লি প্রজ্জলন করে রাখা হতো। গ্রীসের কোন কোন অঞ্চলে হেস্টিয়া গৃহদেবীরূপে ও পূজিত হতেন।

রোমান পুরাণে হেস্টিয়ার সমতুল্য দেবী হলেন ভেস্টা বা ভেস্তা (Vesta)

গ্রীক পুরাণের প্রধান প্রধান দেবদেবী সম্পর্কে আলোচনা করা হল। গ্রীক পুরাণের কাহিনী তথা গ্রীক দেবদেবীদের (যেমন - অ্যাপোলো, এথেনী, হার্মিস প্রমুখ) কাহিনী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

Max Mueller প্রমুখ গবেষকদের মতে গ্রীক দেবদেবী ভারতীয় ধর্মচর্যার প্রভাব-সৃষ্ট ।[১৫] গ্রীক দেবদেবীর মূর্তি কিংবা গ্রীক পৌরাণিক বীরদের মূর্তি কত ভাবেই না বিকশিত হয়েছে। গ্রীক প্রমুখদের

Dhaka University Institutional Repository

দেবদেবী কল্পনায় ভারতীয় প্রভাব থাকলেও মূর্তি বা ভাস্কর্য শিল্পে যে গ্রীকরাই পথিকৃৎ-এটা আজ দিবালোকের মত সত্য। ভারতবর্ষে বিভিন্ন সংস্কারগত কারণেই প্রথম থেকে মূর্তি শিল্প গড়ে উঠতে পারেনি। মূর্তি শিল্পর্কে এখানে গান্ধার শিল্প বলা হয়। '' গান্ধার (কান্দাহার Taxila) গ্রীক অধিকৃত হওয়ায় গ্রীক ভাস্কর্য এই অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়েছিল। সুতরাং মূর্তি গড়ার রীতি গ্রীকদের কাছ থেকেই গৃহীত হয়েছিল এ সত্য অস্বীকার করা চলে না।[১৬]

পুরাণ শব্দের অর্থ পুরাতন। পুরাকালে প্রাচীন কাহিনীর বিশেষ গ্রন্থকে বলা হতো পুরাণ। বেদাদি গ্রন্থে (যেমন অথর্ব দেব, বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ছান্দোগ্য উপনিষদ ইত্যাদি) পুরাণের কথার উল্লেখ আছে।[১৭] সে সময় ইতিহাস শব্দটিরও প্রচলন ছিল । তখন পৃথিবীর আদিম অবস্থা থেকে শুরু করে সৃষ্টির বিবরণের নাম ছিল পুরাণ এবং দেবাসুরের যুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনার নাম ছিল ইতিহাস। অর্থাৎ, যা অপরোক্ষ নহে তার নাম ইতিহাস এবং যা পরোক্ষ, কল্পনা বা অনুমানের উপর লেখা তার নাম পুরাণ। পরবর্তী কালে এ সমস্তই একই সাথে সঙ্কলন করে পুরাণ সংহিতা নামে প্রচার করা হয়েছিল।

''পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ হল সর্গ বা সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রতি সর্গ বা প্রলয় ও পুনঃসৃষ্টি, দেবতা রাজা ও পিতৃগণের বংশাবলী, মন্বন্তর বা কাল বিভাগ ও বংশানুচরিত বা ব্যক্তিবিশেষের কীর্তির কথা।''[১৮] সার্বিক ভাবে বলা যায় যে, পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে শুরু করে কালে কালে দেবতা, ঋষি ও রাজাদের বংশাবলী এবং তাঁদের কীর্তির বর্ণনা পূর্বক সৃষ্টির অন্তে প্রলয় পর্যন্ত বর্ণনা এবং আবার নতুন করে পৃথিবী সৃষ্টির কথা যে গ্রন্থে থাকে, তারই নাম পুরাণ। '' যে পুরাণে শুধু সৃষ্টি রহস্যের বিবরণ ছিল, নিঃসন্দেহে তা বৈদিক যুগের। বেদ যেমন আর্যঋষিদের কল্পনায় উদিত হয়েছিল, এই পুরাণও তেমনি তাঁদের তপস্যার ফল।..... বৈদিক পুরাণে শুধু সৃষ্টি বিষয়ের বর্ণনা ছিল বলে মেনে নিতে হয় যে পরবর্তী কালেই পুরাণের এই পঞ্চ লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়েছে।..... বর্তমানে প্রচলিত মহাপুরাণ ও উপপুরাণগুলি যে অনেক পরবর্তী কালের রচনা, তা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।''[১৯]

হিন্দু ধর্মে ১৮ খানা মহাপুরাণ এবং ১৮ খানা উপপুরাণ রয়েছে। এগুলো[২৮] হচ্ছে ঃ মহাপুরাণ - ১) ব্রহ্ম পুরাণ, ২) পদ্মপুরাণ, ৩) বিষ্ণু পুরাণ, ৪) শিব পুরাণ, ৫) ভাগবত পুরাণ, ৬) নারদীয় পুরাণ, ৭) মার্কন্ডেয় পুরাণ, ৮) অগ্নি পুরাণ, ৯) ভবিষ্য পুরাণ, ১০) ব্রহ্মবৈত পুরাণ, ১১) লিঙ্গপুরাণ, ১২) বরাহ পুরাণ, ১৩) স্কন্দ পুরাণ, ১৪) বামন পুরাণ, ১৫) কূর্ম পুরাণ, ১৬) মৎস পুরাণ, ১৭) গরুড় পুরাণ

Dhaka University Institutional Repository

এবং ১৮) ব্রহ্মান্ড পুরাণ ; উপপুরাণ ঃ - ১) সনৎকুমার , ২) নরসিংহ, ৩) বায়ু, ৪) শিবধর্ম, ৫) আশ্চর্য্য, ৬) নারদ, ৭) নন্দিকেশ্বর, ৮) উশনস, ৯) কপিল, ১০) বরুণ, ১১) শাম্ব, ১২) কালিকা, ১৩) মহেশ্বর, ১৪) কল্কি, ১৫) দেবী, ১৬) পরাশর, ১৭) মরীচি এবং ১৮) সৌর। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, মহাপুরাণ এবং উপপুরাণগুলো একই সময়ে রচিত হয়নি।

পুরাকালে ভারতে ইতিহাস রচনার জন্যে পৃথু রাজা তাঁর রাজত্ব কালে ঐতিহাসিক নিয়োগ করেছিলেন। এটি পুরাণ থেকেই জানা যায়। পৃথুর রাজত্বকাল হচ্ছে আনুমানিক ৪৯০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ।[২১] যীশুখ্রীস্টের জন্ম খুব বেশি দিনের পুরানো ঘটনা নয়। দু'হাজার বছরের বেশি পুরনো ঘটনা প্রসঙ্গে খ্রীস্ট পূর্বাব্দ উল্লেখ করতে হয় এবং নিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভব না হলে তার আগে ' আনুমানিক' শব্দটা যোগ করতে হয়। অর্থাৎ সঠিক কাল জানা না থাকার কারণেই অনুমান করা হচ্ছে ।

দেশ-বিদেশের পন্ডিত-গবেষকরা মেগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণকে ঐতিহাসিক দলিল বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। মেগাস্থিনিস ছিলেন পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক রাজা সেলিউকাসের দূত। রাজা তাঁকে ভারতে চন্দ্রগুপ্তের সভায় প্রেরণ করেছিলেন খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ দিকে । পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের সভায় অনেক দিন থেকেই তিনি ' ইন্ডিকা ' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তারই অংশ বিশেষকে বিশ্বাস যোগ্য ইতিহাস বলে ধরা হয়। ইউরোপের মেসিডোনিয়া প্রদেশের রাজা ফিলিপ গ্রীস জয় করেছিলেন। তাঁর পুত্র আলেকজান্ডার বিশ্বজয়ে বেরিয়ে প্রথমে পারস্যের সাম্রাজ্য জয় করেন, এরপর হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে ভারতে ঢুকেন। তিনি আফগানিস্তান ও ভারতে বিশাপার তীর অবধি ছোট ছোট রাজ্য গুলো করায়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেনাবাহিনী আর এগুতে ইচ্ছুক না হওয়ার কারণে তাঁকে ফিরে যেতে হয়। বেলুচিস্তানের মরুভূমি পেরিয়ে স্বদেশে ফেরার পথে ব্যবিলনে আলেকজান্ডারের মৃত্যু হয়। ইতিহাসে প্রাপ্ত তাঁর এই অভিযানের সময়কাল হচ্ছে এরূপ - ৩২৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দে তিনি স্বদেশ অভিমুখে ভারত ত্যাগ করেন এবং ৩২৩ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে যাত্রা পথে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

ভারতে আলেকজান্ডার মাত্র দু'বছর অবস্থান করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর পন্ঞ্চনদের পরাজিত রাজারা গ্রীকদের বিতাড়িত করে আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই অভিযানের নায়ক ছিলেন নন্দ বংশজাত চন্দ্রগুপ্ত। মগধ - রাজের বিরাগ ভাজন হয়ে তিনি পান্ঞ্জাবে অবস্থান করবছলেন। পরে তিনি মগধ ও দখল করেন। ওদিকে আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তাঁরই সেনাপতি

Dhaka University Institutional Repository

সেলিউকাস। ইনি পাঞ্জাবে পুররুদ্ধাবরে চেষ্টা করতে গিয়ে চন্দ্রগুপ্তের হাতে সাংঘাতিকভাবে পরাজিত হয়ে কাবুল, কান্দাহার ও হীরাট ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করেন। এর পরেই চন্দ্রগুপ্তের সভায় দূত মেগাস্থিনিসকে প্রেরণ করেছিলেন।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস এখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে। এর আগের সকল ঘটনাই হয় অনুমান করা হয়েছে নতুবা শিলালিপি, মুদ্রা ইত্যাদি প্রমাণ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতে ইতিহাস রচিত হয় নি বলে দুর্নাম আছে। কিন্তু অনেক গবেষক যুক্তি প্রমাণ সহকারে এ অভিযোগ খন্ডন করার প্রয়াস চালিয়েছেন এই বলে যে, '' পুরাণ কিংবদন্তী বা Mythology নয় , পুরাণ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বা history.''২২

পুরাণে ভূগোল ও ইতিহাসের সকল উপাদান রয়েছে। সৃষ্টি ও প্রলয় সম্পর্কে সে সময়কার ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। আরও আছে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয়। পুরাণের বর্ণনা থেকেই মহাপ্লাবনের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানা যায়। দক্ষিণ ভারতের রাজা সত্যব্রতকে বলে নৌকা নৌকায় সৃষ্টি সংরক্ষণ করেছিলেন মৎস্য অবতার। বাইবেলে এই কাহিনী ' নোয়ার নৌকা ' বলে খ্যাত। এছাড়াও এই নৌকার গল্প পৃথিবীর অনেক দেশেই আছে বলে শোনা যায়। পৃথিবীর তিনটি স্থানে সে সময় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। তার মধ্যে মহেঞ্জোদরো থেকে হরপ্পা পর্যন্ত বিস্তৃত সিন্ধুনদের উপত্যকায় গড়ে উঠা সভ্যতাও রয়েছে। অনুমান করা হয়, মহাপ্লাবনে হয়তো এই সভ্যতাও চাপা পড়ে গিয়েছিল, বর্তমানে মাটি খুঁড়ে যার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে । যে ভরত রাজার নামে ভারতবর্ষ নাম, তাঁর পিতা ঋষভের আচরিত ধর্ম পরবর্তীকালে ' জৈন ধর্ম ' হিসেবে আখ্যা পেয়েছে। এবং ঋষভ নিজেই ' আদিনাথ ' অভিধায় অভিহিত হয়েছেন। মহেঞ্জোদরোর মাটির নিচে ঋষভদেবকে পাওয়া গিয়েছে। এখানে লিঙ্গ পূজারও সন্ধান জানা গিয়েছে। '' সিন্ধুসভ্যতার ধারকরাই যে ঋগবেদে বর্ণিত সমৃদ্ধশালী নগর সমূহের ' শিল্পোপাসক ' সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।''২৩

বেশীরভাগ মহাপুরাণ ও উপপুরাণের মধ্যে বিভিন্ন দেবতার প্রসঙ্গ রয়েছে। পুরুষ দেবতাদের মধ্যে প্রধান তিনজন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ছাড়াও রয়েছেন গণেশ, কার্তিকেয়, সূর্য, চন্দ্র, পবন, বরুণ, ইন্দ্র, মদন, যম, কুবের, দক্ষ, অগ্নি প্রমুখ। শক্তি-দেবতা দুর্গা বা পার্বতীর রয়েছে কত রূপভেদ - কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি। পুরাণে যেমন বিষ্ণুর দশ অবতার আছেন, তেমনি আছেন দশ মহাবিদ্যা-

Dhaka University Institutional Repository

শক্তি দেবতার প্রকারভেদে। সরস্বতী, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, গঙ্গা, যমুনা প্রমুখ সহ আরও অনেক স্ত্রী-দেবতা শক্তি গোষ্ঠীর অনুর্ভুক্ত। কোন কোন পুরাণে ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা প্রভৃতি দেবীদের প্রসঙ্গও রয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখিত দেবদেবীদের উল্লেখযোগ্যদের পরিচিতি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

পুরাণে বিভিন্ন প্রকার দেবতার মাহাত্ম্য অন্তর্ভুক্ত হলেও বিষ্ণুই সকল পুরাণের অধিদেবতা। হিন্দুদের কাছে পুরাণ গ্রন্থসমূহ এতই পবিত্র যে, কোন কোন উপনিষদে এবং বিভিন্ন পুরাণে এদেরকে 'পঞ্চম বেদ ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় রচিত বেশির ভাগ কাব্য-নাটকই হয় পুরাণ কিংবা রামায়ণ অথবা মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এমন কি রামায়ণ ও মহাভারতেও পুরাণগুলো থেকে অনেক ঘটনা সংযোজিত হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যও পুরাণসমূহের কাছে বহুলাংশে ঋণী। পুরাণসমূহ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রচুর বিষয়ের যোগান দেওয়া ছাড়াও বাংলাদেশে মুসলমান অধিকার কালে হিন্দু ধর্মের রূপ ও প্রকৃতি বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। প্রতিনিধি স্থানীয় পুরাণ গ্রন্থ ভাগবতের প্রভাব অন্যান্যের তুলনায় সর্বোচ্চে । খ্রীস্টীয় পনেরশ-ষোড়শ শতকে যে ভক্তি ধর্ম বাংলাদেশ থেকে উৎসারিত হয়ে ভারতবর্ষকে প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করেছিল তার প্রধান শাস্ত্রভিত্তি ছিল দু'টি - গীতা এবং ভাগবত।

" ভারতীয় পুরাণের সঙ্গে গ্রীক পুরাণের পার্থক্য এই যে ভারতীয় পুরাণে শুধু দেবদেবীর জন্মবৃত্তান্ত, কীর্তিকলাপ ও মহিমা কীর্তিত হয়েছে, কিন্তু গ্রীক পুরাণে দেবদেবীদের জন্মবৃত্তান্ত ও বিচিত্র দৈব মহিমার সংগে সঙ্গে অসংখ্য মর্ত্যমানব মানবীর বীরত্বপূর্ণ কার্যাবলী ও জীবন কাহিনী কীর্তিত হয়েছে।"[২৪] গ্রীক পুরাণে দেবতা ও মানব, স্বর্গ ও মর্ত্য পরস্পরের সীমারেখা ভুলে এক পূর্ণাঙ্গ পরিমন্ডলে একাকার হয়ে এক বৃহত্তর জীবনাবর্তে ঘুরপাক খেয়েছে। পক্ষান্তরে ভারতীয় পুরাণে দেবদেবীরা মর্ত্যে আবির্ভূত হয়ে সেখানে তাঁদের পূজা প্রচার তথা মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যে মুনি ঋষি কিংবা সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ব্যবহার করেছেন। সে কারণেই গ্রীক পুরাণে পৌরাণিক যুগের সমাজ ব্যবস্থা যে ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, ভারতীয় পুরাণে সে ভাবে হয়নি।

গ্রীক পুরাণের দেব-দেবীদের সাথে ভারতীয় পুরাণের দেব-দেবীদের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য উভয়টিই বিদ্যমান। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে য, অনেক গবেষক গ্রীক দেব-দেবীকে ভারতীয় ধর্মচর্যা প্রভাবে উদ্ভুত বলে মত প্রকাশ করেছেন। এমন কি তাঁরা হোমারের ইলিয়ড কাব্যকে "বৈদিক কাহিনীর নবরূপায়ন[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। '' এ কাব্যের প্রথমে অগ্নি শেষেও অগ্নি''।[২৬] বৈদিক সাহিত্যেও অগ্নি প্রধান এবং প্রথমতম দেবতা।[২৭] ঋগবেদে অগ্নিকে ' যুবা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন স্থানে তিনি যবিষ্ঠ । অনেক গবেষক মনে করেন যে, গ্রীক দেবতা Hephaistos যবিষ্ঠ শব্দের অপভ্রংশ ; আবার গ্রীক দেবতা Prometheus এবং Phoroneus বৈদিক অগ্নিদেবতের বিশেষণ প্রমন্থ ও ভরণ্যু শব্দ থেকে আগত এবং Vulcun অগ্নির মূর্ত্যন্তর উল্কা শব্দেরই আকৃতিভেদ।[২৮]

গ্রীক দেবতাদের মধ্যে প্রধান, অলিম্পিক দেবভূমির অধিকর্তা সর্বশক্তিমান জিউসের (Zeus) সঙ্গে ভারতীয় পুরাণের স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের তুলনা করা চলে । ইন্দ্রের মতো জিউসও বজ্রধারী। ইন্দ্রের মতো জিউসের চরিত্রও বেশ কিছুটা কলঙ্কিত। অবশ্য আকৃতি প্রকৃতিতে জিউস ও ইন্দ্রের মধ্যে বৈসাদৃশ্যও যথেষ্ট। গ্রীক দেবশিল্পী হেফাস্টাস (Hephaestus)- এর সঙ্গে ত্বষ্টা - বিশ্বকর্মার বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি ত্বষ্টা-বিশ্বকর্মার মত সৌর দেবতা । গ্রীকদের Helios শব্দ ভারতীয় 'সূর্য' শব্দের রূপান্তর মাত্র। সুদর্শন গ্রীক দেবতা অ্যাপোলোই হেলিয়স বা সূর্যরূপে পূজিত হন। গ্রীক পুরাণের নির্মল জলের অধীশ্বর অপসু (Apsu) সংস্কৃত অপ্ (জল) শব্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

গ্রীক সভ্যতার উপরে বৈদিক সভ্যতার গভীর প্রভাবের কথা Maxmuller প্রমুখ উদারদৃষ্টি সম্পন্ন গবেষকগণ স্বীকার করেছেন - সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ঋগবেদের 'দ্যৌস্ ' দেবতা গ্রীক দেবতা 'Zeus' এ রূপান্তরিত হয়েছে। বেদে ইন্দ্রও দ্যৌস একই দেবতা-গুণকর্মের পার্থক্য হেতু পৃথক রূপে কল্পনা করা হয়েছে এই যা। বৃষ্টির অধিপতিরূপে ইন্দ্র সকলের প্রিয় হওয়ার কারণেই ইন্দ্রের পূজা পৌরাণিক যুগ অতিক্রম করে আধুনিক যুগেও অব্যাহত আছে। পক্ষান্তরে দ্যৌস শুধু মাত্র মহাকাশ পরিব্যাপ্ত সূর্যালোকরূপে ঋগবেদেই একজন অপ্রধান দেবতা হওয়ায় পরবর্তীকালে তাঁর উপাসনা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দ্যৌস এর সঙ্গে নামের সাদৃশ্য ছাড়া (Zeus) এর সঙ্গে প্রকৃতিগত তেমন কোন মিল নেই। বরং দেবরাজ বজ্রধারী (Zeus) এবং ইন্দ্রের সাদৃশ্য কিছুটা দেখা যায় যা পূর্বেই বলা হয়েছে। বেদে সরণ্যু ও সরমা ঊষারই নামান্তর। এথেন্স এর অধিষ্ঠাত্রী গ্রীক দেবী এথেনার সঙ্গে অহনা শব্দের মিল ছাড়া গুণ কর্মের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে তেমন কোন মিল নেই। বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কাত্রী, সংখ্যাবিজ্ঞান ও বিভিন্ন শিল্পদ্রব্যের নির্মাত্রী যুদ্ধদেবী এথেনার সঙ্গে বৈদিক সরস্বতীর মিল পরিলক্ষিত হয়। গ্রীক পুরাণের দেবতা তাইচি (Tyche) জিউস প্রদত্ত ক্ষমতার বলে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করেন, ভাগ্যবানকে একটি প্রাচুর্যের শিং (Horn of plenty)

Dhaka University Institutional Repository

থেকে ধন সম্পদ ঢেলে দেন এবং ভাগ্যহীনের সব সম্পদ তুলে নেন। তাইচির সঙ্গে লক্ষ্মীর কিছুটা মিল থাকলেও অমিলই বেশি। ভারতীয় পুরাণে লক্ষ্মীদেবীর পরিকল্পনা অনেক উচ্চস্বরের। লক্ষ্মী সম্পদ সৌভাগ্যদায়িনী বিষ্ণুর আনন্দ স্বরূপিণী শক্তি-আনন্দ প্রদায়িণী রমা। গ্রীক দেবী দিমিতির (Demeter) শস্যের দেবতা । কিন্তু দিমিতির বা ডেমেটরের সঙ্গে লক্ষ্মীর আকার ব' চরিত্রের কোন সাদৃশ্য নেই। ডেমেটর শুধুমাত্র শস্যেরই দেবতা, তাঁর আর কোন পরিচয় নেই।

মহাকবি হোমারের ইলিয়ড এবং ওডিসি থেকেই গ্রীক ধর্মবোধের উন্মষ ঘটে। হোমার ক্ষণ ভঙ্গুর, নশ্বর মানব জীবনের অমর মহিমা গানই করেছেন। এই নশ্বর জীবনেই মানুষ দেবতার অমর মহিমা অর্জন করতে সক্ষম, যদি তার আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস অক্ষুন্ন থাকে। তাইতো একিলিস বা হেক্টর মৃত্যুর মাধ্যমেও মৃত্যুহীন হয়ে আছে। পক্ষান্তরে, ভারতীয় পুরাণে মানুষের কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠার সুযোগ পায়নি। পুরাণের আদলে গড়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য গুলোর মধ্যে অন্যতম মঙ্গলকাব্য মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণের চাঁদ সদাগর এখানে ব্যতিক্রম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর অতুলনীয় পৌরুষ দৈব বিধানের বিরুদ্ধে এক প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে তাঁর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে এক বিরল দেবোপম মহিমায় উদ্ভাসিত করে তুলেছেন।

মনসামঙ্গল কাব্যে মনসা, শিব, চন্ডী, গঙ্গা, ইন্দ্র, যম, বিশ্বকর্মা, দক্ষ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মদন, কার্তিক, গণেশ, নারদ, ধর্ম, ঊষা, অনিরুদ্ধ নেতা প্রমুখ পৌরাণিক , লৌকিক, মিশ্র প্রভৃতি দেবতার সমাবেশ ঘটেছে। উল্লেখ্য এখানে লৌকিক দেবতাদের তথা লৌকিতারই প্রাধান্য সূচিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় দেবতা মনসার উৎপত্তি আর্যেতর সমাজে। পরবর্তীকালে রচিত পুরাণ উপপুরাণগুলো যেমন পদ্মপুরাণ, দেবী ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতির মধ্যে মনসা দেবীর উল্লেখ আছে। মনসা দেবী যে ধীরে ধীরে সমাজে অর্থাৎ পৌরাণিক সমাজে উঠে এসেছেন এতে সেটাই প্রমাণিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ঃ

১। অতীন্দ্র মজুমদার, ভাষাতত্ত্ব, নয়া প্রকাশ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭, পৃঃ ৭

২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯

৩। Delano Ames (translated) , Greek Mythology, Paul Hamlyn Limited , London, 1963 page 7

৪। সুবোধ কুমার চক্রবর্তী, বৈদিক উপনিষদ, মন্ডল বুক হাউস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯০ , পৃঃ ১

৫। ভাষাতত্ত্ব , পৃঃ ৩৩

৬। হিন্দুদের দেবদেবীঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (প্রথম পর্ব), পৃঃ ৯৪

৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫

৮। ফরহাদ খান, প্রতীচ্য পুরাণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৪, পৃঃ ১০৮

৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৭-০৮

১০। মোবাশ্বের আলী, হোমার (সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শীত ১৩৭৭, পৃঃ ১

১১। প্রতীচ্য পুরাণ, পৃঃ ২৩০

১২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫

১৩। হোমার, পৃঃ ৭৯

১৪। Greek Mythology page 7

১৫। হিন্দুদের দেবদেবীঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (প্রথম পর্ব) , পৃঃ ৩৩

১৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩

১৭। সুবোধ কুমার চক্রবর্তী, সৌর পুরাণ, এ , মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ , ১৩৮৯ , পৃঃ ১

১৮। সুবোধ কুমার চক্রবর্তী, পুরাভারতী, এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৮৯ , পৃঃ ৩১২

১৯। সুবোধ কুমার চক্রবর্তী, দেবী ভাগবত, এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৮৮, পৃঃ ৬

Dhaka University Institutional Repository

২০। রণজিৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস-পরিক্রমা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার ,কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯২ , পৃঃ ২০-২১

২১। পুরাভারতী, পৃঃ ২৯

২২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫

২৩। মহাভারত ও সিন্ধুসভ্যতা, পৃঃ ৯৬

২৪। সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ, গ্রীক পুরাণ কথা, তুলি-কমল, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮২, ভুমিকা পৃঃ (।)

২৫। হিন্দুদের দেবদেবীঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (প্রথম পর্ব), পৃঃ ৩৩

২৬। হোমার , পৃঃ ৮৬

২৭। হিন্দুদের দেবদেবীঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (প্রথম পর্ব), পৃঃ ৯৪

২৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

মনসামঙ্গল কাব্যে সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় পটভূমির স্বরূপ

যে সমস্ত উপকরেণের উপর ভিত্তি করে সমগ্র বঙ্গদেশে একটি পরিপূর্ণ লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, মনসামঙ্গল সেগুলোর অন্যতম। বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যের মধ্যে কাহিনীগত অখন্ড ঐক্যের একক অধিকারী মনসামঙ্গলের মধ্য দিয়েই বাঙালীর জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় হয়েছে।

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর ' প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, '' বাংলাদেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রথম আলোকরশ্মি পড়তে শুরু হয়েছে উত্তর - পশ্চিম থেকে আর্যদের আগমন ও বসতি-স্থাপনের পর হতে। তার পূর্বে এদেশে দ্রাবিড়, মঙ্গল, কোল প্রভৃতি যে- সব অনার্য জাতির বাস ছিল, তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইসারা পাই শুধু কতকগুলি স্থানের নাম এবং কয়েকটি চলিত শব্দে।''[১] বাংলা মঙ্গল কাব্যের উদ্ভব- উৎস উক্ত 'ইসারাময়' যুগের মধ্যেই নিহিত। অনুমান করা যায়, - আর্যদের অধিকারে যাবার আগেই বাংলাদেশের আদিম জনগণ নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী তাদের সমাজ-ব্যবস্থা, আচার-আচরণ এবং জীবনযাত্রা প্রণালীর অন্যান্য উপাদানের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা করতে সক্ষম হয়েছিল। এর মধ্যে ধর্মাদর্শ এবং দেবদেবীর পরিকল্পনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে , জৈন-বৌদ্ধ - ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মাধ্যমে আর্য-সংস্পর্শ লাভ করায় অনার্য লোক-সমাজের ঐ সকল আদিম দেব-পরিকল্পনা এবং ধর্ম-সংস্কার ভাবে এবং রূপে বিবর্তিত হলেও তার মূল - কাঠামোটি কখনো একেবারে বদলে যায়নি। এরূপ ধারণা করা অসংগত হবে না যে, সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশের জনসাধারণ তাদের নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী নিজ নিজ লৌকিক দেবতাদের পূজা-পদ্ধতি এবং মহিমা-প্রকাশকারী কাহিনী রচনা করেছিল ; উক্ত পূজা-পদ্ধতি এবং মহিমা প্রকাশের ভাব ও ভাষা দুই-ই কাল-পরিক্রমায় পরিবর্তিত হয়েছে।

রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় অভিজাত সমাজের মধ্যেই ব্রাহ্মণ্য - ধর্ম আচরণের প্রতাপ এবং মহিমা সীমাবদ্ধ ছিল। বিশেষ করে সেন - বংশের রাজত্ব কালে রাজ - সভার বিদগ্ধ পটভূমিকায় বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য- ধর্ম-সংস্কারের সফল অভ্যুত্থান এবং ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটেছিল ; পাশাপাশি সমকালীন সময়েই জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের স্বল্পাবশেষ লোক জীবনে সহজিয়া - সাধনার তলানির মধ্যে এসে আশ্রয়

Dhaka University Institutional Repository

নিয়েছিল। সমাজ ও ধর্মজীবনে এ অবস্থা চলাকালীন সময়েই অর্থাৎ খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের সূচনা-লগ্নেই বাংলাদেশে তুর্কী আক্রমণ সংঘটিত হয়। গবেষকগণ একে " রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতির অনিবার্য পরিণাম"[২] হিসেবে দেখেছেন। তুর্কী তথা মুসলমান আক্রমণের ফলস্বরূপ যে সমস্ত সামাজিক পরিবর্তন[৩] অনিবার্য হয়ে দেখা দিল সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ ঃ

(১) উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে ব্যবধান দূর হতে থাকে ;

(২) পরাজিত হিন্দু-সমাজ এক সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রচনার মাধ্যমে আত্মরক্ষায় যত্নবান হয় ; এবং

(৩) প্রথমে হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ মানুষের ঐক্য এবং ক্রমে ক্রমে হিন্দু-মুসলমান উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হলে পর মুসলমান বিজয়ীরা বাঙালী হয়ে ওঠায় আর বিদেশীয় থাকেননি।

উপরিউক্ত পরিবর্তনগুলো একদিনে কিংবা একবারে সংঘটিত হয়নি ; ক্রমপর্যায়ে বিবর্তনের ধারায় অগ্রসর হয়েছে। তুর্কী আক্রমণের পর বাংলাদেশে যে সমাজ-সংহতি সংঘটিত হয়েছিল, যে ভাব-সাঙ্কর্যের উদ্ভব ঘটেছিল, বাংলাদেশের মাটির-উপাদানের সাথে পৌরাণিক ও শাস্ত্রীয় বোধ বুদ্ধির যে সংমিশ্রণ হয়েছিল এবং এর ফলশ্রুতিতে বাংলা সাহিত্যে যে প্রবল উচ্ছ্বাসময়, প্রচন্ড স্রোত সহকারে বন্যা প্রবাহ সঞ্চারিত হয়েছিল মঙ্গলকাব্য তারই জ্বলন্ত সাক্ষী স্বরূপ। বাংলা সাহিত্যের এই শাখার কাহিনীধারার একদিকে রয়েছে বাংলাদেশের লৌকিক জীবন-যাত্রার রূপ, বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের শিল্পগত পরিণিত এবং অপরদিকে রয়েছে সংস্কৃত ভাবাদর্শের, কাব্যরীতির এবং পৌরাণিক চেতনার অনুসৃতি। বাঙালী- সমাজ মানসের পূর্ণাঙ্গ দর্পণ-স্বরূপ মঙ্গলকাব্য প্রায় অর্ধ-সহস্র বছর ধরে বাঙালীর চিত্তবিনোদন করেছে।

খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভেই বাংলাদেশে মুসলমান (তুর্কী) অভিযানে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে ইলিয়াস-শাহী বংশের স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় তখন দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হতে থাকে। চর্যাগীতির কথা বাদ দিলে, বাংলা সাহিত্যের শুরুও তখন থেকেই বলা যয়া। এই ইলিয়াস-শাহী বংশের রাজত্বকাল থেকেই এদেশে জ্ঞান চর্চা ও সাহিত্য অনুশীলনের পুনরারম্ভের (স্মর্তব্য, খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত, তুর্কী অভিযানের পূর্বে এদেশের জ্ঞান -চর্চা ও সাহিত্য - অনুশীলন ছিল মূলতঃ সংস্কৃত-নির্ভর) সুস্পষ্ট ফল খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে তুর্কী অভিযানের সময়ে চারটি প্রধান ধর্ম মতের[৪] প্রচলন ছিল, - (১) দেশীয় প্রাচীন ঐতিহ্যবাহিত গ্রামদেবদেবী পূজা (যার মধ্যে বৈদিক দেবতা আছেন, পৌরাণিক দেবতা আছেন, বাইরের

Dhaka University Institutional Repository

দেবতা এবং নতুন-পরিগৃহীত দেবতাও আছেন); (২) মহাযান বৌদ্ধমতের একটি বিশেষ ও স্থানীয় রূপ ; (৩) যোগী - মত (যার সাথে শৈবমতের সংস্রব ছিল) এবং (৪) পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যমত (যার মধ্যে প্রধান হচ্ছে বিষ্ণু- শিব - চন্ডী উপাসনা)। মুসলমান দখলের প্রথম দু'তিন শতকের মধ্যে এই চারটি ধারা মিলে-মিশে গিয়ে সাহিত্য-প্রবাহিত দুটি প্রধান ধারায়[৫] রূপান্তরিত হল , - (১) পৌরাণিক (অর্থাৎ অর্বাচীন, নবাগত, নবানীত শাস্ত্রলব্ধ) এবং (২) অ-পৌরাণিক (অর্থাৎ প্রাচীন, দেশীয় ঐতিহ্যাগত)। দেবদেবীদের ভিন্নতা প্রায় মিলে এল, যদিও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে তাঁদের যে রূপ দৃষ্ট হয় তাতে শাস্ত্রলব্ধ ও দেশীয় দুই প্রকৃতির মৌলিক অভিন্নতা স্পষ্ট নয়।

পাল, চন্দ্র ও সেন যুগের লিপিমালায় এবং আবিষ্কৃত মূর্তিগুলোতে শৈব মতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[৬] নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' নামক গ্রন্থে সেনবংশের পারিবারিক দেবতা হিসেবে 'সদাশিব'- এর অনুমান করে উল্লেখ করেছেন, ''বিজয় সেন শিবের আবাহন করিয়াছিলেন শম্ভু নামে, বল্লাল সেন করিয়াছেন ধূর্জটী এবং অর্ধনারীশ্বর নামে। লক্ষ্মণ সেন এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় নারায়ণের আবাহন করিলেও সদাশিবকে শ্রদ্ধা জানাইতে ভোলেন নাই।''[৭] কিন্তু তুর্কী অভিযানের ফলে সৃষ্ট মধ্যযুগের ঝড় - ঝঞ্ঝায় বিপর্যস্ত আবহাওয়ায় শিব বেমানান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, ''বস্তুত সাংসারিক সুখদুঃখ-বিপদ সম্পদের দ্বারা নিজের ইষ্ট দেবতার বিচার করতে গেলে, সেই অনিশ্চয়তার কালে শিবের পূজা টিকিতে পারে না। অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার তরঙ্গ যখন চারিদিকে জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন যে - দেবতা ইচ্ছা - সংযমের আদর্শ, তাহাকে সাংসারিক উন্নতির উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যায়না। দুর্গতি হইলেই মনে হয় আমার নিশ্চেষ্ট দেবতা আমার জন্য কিছুই করিতেছেন না, ভোলানাথ সমস্ত ভুলিয়া বসিয়া আছেন।..... কিন্তু শক্তিকে দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলাইবার উপায় থাকে। শক্তিপূজক দুর্গতির মধ্যেও শক্তি অনুভব করিয়া ভীত হয়, উন্নতিতেও শক্তি অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে।''[৮] লৌকিক মানুষ সে জন্যে শিবকে ত্যাগ করে শক্তিকে গ্রহণ করে-শক্তি, ক্ষমতা যার সীমাহীন, ইচ্ছা-অনিচ্ছা যার নিয়ন্ত্রণহীন, যা মানুষকে যেমন অতি সহজেই সর্বোচ্চ শিখরে তুলতে সক্ষম, তেমনি অতি সহজেই অতল গহ্বরেও ডুবাতে সক্ষম। এমন এক শক্তির কল্পনার মাধ্যমে তার অপ্রতিহত প্রভাবের কাছে নিজেকে সপে দিয়ে মানুষ তার পরিবেশের বিপর্যয় এবং আঘাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে ; সেই পরিবেশকে জয়ের চেষ্টা চালিয়েছে। এই শক্তির আবার ভিন্ন একটা দিক রয়েছে, সেটা হলো সৃষ্টির ; এই শক্তি নারী - দেবতা, তাই প্রচন্ড হলেও তা মাতৃরূপা। শক্তি-কল্পনার মধ্যে মানুষের দুটো সহজাত প্রবৃত্তি পরিশোধিত আকারে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে

Dhaka University Institutional Repository

- একদিকে তার বাঁচার আকুতি, আত্মরক্ষার এবং তার জন্যে প্রয়োজনীয় সংগ্রামের প্রেরণা ; এবং অপর দিকে সৃষ্টি ও পালনের আকুতি। তাইতো, বাংলাদেশ মুসলমান অধিকারে যাবার কিছুকালের মধ্যেই শক্তিসাধক বাঙালীর অন্যতম বেদ কালিকা-পুরাণ রচিত হবার পাশাপাশি খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের মধ্যেই শক্তিময়ী কালী বাঙালীর অন্যতম প্রধান উপাস্যা দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।[৯] বলা যায়, তুর্কী অভিযানের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পূর্ববর্তী হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজাদের আমলের বিরাজমান অবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন সূচিত না হলেও সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে সংঘটিত পরিবর্তনের মাধ্যমে বাঙালী জাতি একটি জাতীয় চরিত্র অর্জনে সক্ষম হয়েছে।[১০]

মুসলমান শাসনের প্রথম দিকে সমাজে অর্থাৎ হিন্দু সমাজে, ঝাঁকুনির কারণে উঁচুনীচু সমান হয়ে গেল। মহাযান-উপাস্য বহু দেবদেবী ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক উপাসনার মধ্যে স্থান পাবার পাশাপাশি ধ্বংসোন্মুখ (তান্ত্রিক) বৌদ্ধ মত ব্রাহ্মণ্য মতের ক্রোড়ে আশ্রয় নিল। গ্রামদেবদেবী যতদূর সম্ভব শাস্ত্রীয় দেবদেবীর নাম ও প্রকৃতি গ্রহণ করতে লাগলেন। গৃহস্থনারীর ব্রত-উপবাসের ঠাকুর-অন্যত্র অপদেবতা কিংবা উপদেবতা - শাস্ত্রপন্থী দেবতার মর্যাদান্বেষী হলেন। পাষাণ, ধাতব বা পট প্রতিমায় দেবপূজা প্রথমে বৌদ্ধ তান্ত্রিকমতে আরম্ভ হয়েছিল, এবং গুপ্তরাজাদের সময় থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে তা চালু হয়েছিল। সেন রাজাদের আমলে বিষ্ণু ও শিবের অস্ত্রীক ও সস্ত্রীক মূর্তি এবং মহিষমর্দিনী বা রাজেশ্বরী চন্ডী মূর্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূজার প্রচলন হয়েছিল। পাথরের মূর্তি গড়া এদেশে সহজসাধ্য না হওয়ায় বিষ্ণুর পূজায় শালগ্রাম শিলায় এবং শিবের পূজা লিঙ্গমূর্তিতেই চালু রইল। চন্ডীপূজা তথা দুর্গাপূজা শারদোৎসবে প্রতিষ্ঠিত হল। গ্রামদেব ধর্ম ঠাকুর রূপে এবং গ্রামদেবী মনসা-বাশুলী রূপে গ্রামের সকলের ভয় ভক্তির অধিকারী হয়ে রইলেন। ব্রত রূপে এবং স্থানীয় উৎসব রূপেও মনসার পূজা বিস্তার লাভ করল। বাংলাদেশে তুর্কী হামলার আগেই হামলাকারী যোদ্ধৃশক্তি কল্কি অবতার হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। তাই অদৃষ্টবাদীর এই বাংলাদেশে মুসলমান শাসককে দৈববিধান বলে মেনে নিতে সংকোচ বা দেরি হয়নি।

মানুষের সাথে দেবতার নতুন সম্পর্ক-স্থাপন-প্রয়াসের মধ্যে মঙ্গলকাব্য অন্যতম প্রধান। যে তিনজন নতুন দেব-দেবী - ধর্মঠাকুর, মনসা এবং চন্ডী প্রধানত মঙ্গলকাব্যে পূজ্যরূপে আসন পেয়েছেন -তাঁরা অনার্য-কল্পনা - প্রসূত এবং অ-হিন্দু - উৎস-সম্ভূত বলে মনে হয়।[১১] ত্রি-শরণের অন্যতম ' ধর্ম ' প্রমূর্তরূপে, অবলৌকিতেশ্বর বিষ্ণু রূপে , আদিনাথ শিবরূপে, প্রজ্ঞা - উপায় এবং বজ্রসত্ত্ব - বজ্রতারা

Dhaka University Institutional Repository

শিব-শিবানী রূপে, সিদ্ধারা যোগী - সন্ন্যাসী রূপে, শ্যামতারা চন্ডী - কালিকা রূপে এবং যক্ষ, মনসা (বিষহরী ও বিষালাক্ষী) রূপে গৃহীত হয়ে এবং যোগ, ভোগ ও জড়বাদ প্রতীক যোগীপাল-ভোগীপাল মহীপাল গীত দিয়েই বাঙালী জীবনের খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের আরম্ভ। ষোড়শ শতকে যে এ গুলো প্রবলতর হয়েছিল বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' থেকে তা জানা যায় ঃ

"ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে
মঙ্গল চন্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন
পুত্তলি করএ কেহো দিয়া বহু ধন।
বাশুলী পূজএ কেহো নানা উপচারে
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে।
যোগিপাল ভোগীপাল মহীপালগীত
ইহা শুনিবারে সব লোক আনন্দিত।"[১১]

মনসামঙ্গল থেকেই মঙ্গলকাব্যের দেবতা কল্পনার আদিম প্রেরণাটি বুঝতে পারা যায়। আদিম যুগের বর্বর মানুষের প্রতিবেশ সম্বন্ধে অনির্দ্দেশ্য ভীতিভাব, জাতিচিহ্নরূপে (Totem) নাগের যে বিশেষ মর্যাদা এবং কোন কোন পুরাণে উহাদের দেবতার ঘনিষ্ট আত্মীয় হিসেবে পরিচয় প্রদান - অতীত মানব গোষ্ঠীর এই সকল অস্পষ্ট স্মৃতি ও সংস্কার মনসার দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মূলীভূত কারণ। বাংলাদেশের আদিম জনসাধারণ যতই বৈদিক ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে, ততই তাদের নিজস্ব ধর্মের প্রভাব আর্য ধর্মকে গ্রহণ করতে হয়েছে। ফলে অসংখ্য অবৈদিক দেবদেবীরা কালক্রমে ব্রাহ্মণদের পূজা পেয়েছেন। যেমন -মনসাদেবীর কথাই ধরা যাক্ না কেন। বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের সর্প-উপদ্রুত অঞ্চলে বিশেষ করে নদী বহুল এবং জঙ্গলাকীর্ণ পূর্বাঞ্চলে সাপের অত্যাচার থেকে নিস্তার পাবার আশায় যে দেবীর সৃষ্টি হয় তিনিই হচ্ছেন মনসা দেবী। মূলতঃ তিনি গ্রাম দেবী । আর্য চন্দ্রধর বণিক ওরফে চাঁদ সদাগর মনসার দেবীত্বকে কিছুতেই স্বীকার করবেন না। মনসাও চাঁদের পূজা লাভের জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এতে উভয়ের মধ্যে সংঘটিত বিবাদে চাঁদ সদাগর তাঁর ছয় পুত্র এবং সমুদয় নৌবহর হারিয়েও তাঁর প্রতিজ্ঞায় অটল থাকলেন । অবশেষে চাঁদের কনিষ্ঠ তথা সপ্তম পুত্র লখিন্দরকেও মনসা প্রেরিত সর্পাঘাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হল। এতেও চাঁদ পরাজয় স্বীকার করলেন না। তাঁর কনিষ্ঠা পুত্রবধূ বেহুলা মৃত স্বামীকে মনসার বরে পুনর্জীবিত করাসহ ছয় ভাসুর এবং সমুদয় নৌবহর ফিরিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

এনে শ্বশুরকে মনসার পূজা করতে বাধ্য করলেন। এ ক্ষেত্রে লোকায়ত ধর্মের কাছে আর্য বৈদিক ধর্মের পরাজয় স্বীকার করার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়। তাই এখন মনসাকে শিবের মানস কন্যা অথবা সরস্বতীর সাথে অভিন্ন ধরে বৈদিক দেবী হিসেবে তাঁর যোগ্যতার দাবীকে দমিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ১৩

মনসামঙ্গল কাব্যের নায়ক হচ্ছেন চন্দ্রধর বণিক ওরফে চাঁদ সদাগর। শীতলামঙ্গল কাব্যের শৈব রাজা চন্দ্রকেতু চাঁদ সদাগরের আদর্শেই শীতলাদেবীর উদ্দেশ্যে অবজ্ঞা ভরে বলেছিলেন,

''রাজা বলেন শীতলা করেছে যদি বাদ।
কদাচিৎ আমি তার না ল'ব প্রসাদ।।''১৪

চন্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপতি সদাগর কিংবা ধর্মমঙ্গল কাব্যের ইছাই গোয়ালাও চাঁদ সদাগরের অনুকরণেই সৃষ্ট চরিত্র। চাঁদ সদাগরের চরিত্রের আদর্শেই পরবর্তী মঙ্গল কাব্যসমূহের দেববিদ্রোহী নায়কদের চরিত্রগুলোর পরিকল্পনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তৎকালীন বাঙালীর সামাজিক জীবনে মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। মঙ্গলকাব্য গোষ্ঠীর ইতিহাসে প্রাচীনতম 'মনসামঙ্গল' কাব্যই শুধুমাত্র শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই একটা সুসংহত রূপ পেয়েছিল। স্মতর্ব্য, মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য যাত্রার পালা এবং হাসান হোসেনের পালা একই কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও একই ঐতিহাসিক যুগের চিত্র নহে প্রথমটি বাংলাদেশে তুর্কী অভিযানের পূর্ববর্তী বিষয় এবং দ্বিতীয়টি এর পরবর্তী বিষয়। তাই স্বাভাবিক কারণেই এদের মধ্যে কালগত বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। আবার , কবিদের তাঁদের নিজস্ব যুগকে আশ্রয় করেই তাঁদের কাব্যের দেহ ও মন উভয়ই গঠন করতে হয়। সে জন্যে দু'শ বছরের পূর্ববর্তী বিজয় গুপ্তের চাঁদ সদাগর কিছুতেই দু'শ বছরের পরবর্তী চাঁদ সদাগর হয়ে দেখা দিতে পারেন না, একই কাব্যের একই ভূমিকায় থাকা সত্ত্বেও । কেননা প্রাক চৈতন্য যুগের মনসামঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে জীবনের যে স্থূল পরিচয় ছিল, চৈতন্যোত্তর যুগে তা ছিল না। অবশ্য, প্রত্যক্ষ সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের উপর ভিত্তি করেই মঙ্গলকাব্যগুলোর উন্মেষ ঘটেছিল বলে এদের উদ্ভবের যুগে (অর্থাৎ প্রাক-চৈতন্য যুগে) এই বিশিষ্ট যুগ - চেতনা যতখানি প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হত, পরবর্তী যুগে (অর্থাৎ চৈতন্যোত্তর যুগে চৈতন্য ধর্মের প্রভাবে) তা বহুলাংশে থিতিয়ে পড়েছিল - সেটা বলাই বাহুল্য ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীনকালে, বৌদ্ধ রাজাদের সময়ে বাঙালী সদাগররা সপ্তডিঙ্গা, চৌদ্দ ডিঙ্গার বহর নিয়ে বিভিন্ন পাটনে বাণিজ্যে বের হতেন। তাঁদের এই সাড়ম্বর দুঃসাহসিক অভিযান নিয়ে প্রচলিত কাহিনীই সম্ভবত মনসামঙ্গল কাব্যের মূল আখ্যায়িকার অস্থি-কংকাল রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। তা হলে, অনুমিত হচ্ছে - মনসামঙ্গলের কাহিনী প্রধানত বাঙালীর নিজের জীবন -অভিজ্ঞতা এবং ভাগ্যবিপর্যয়ের উপাদানে রচিত। জাতীয় স্মৃতিতে সদাগর তথা বণিক পরিবারগুলোর ঐতিহ্য-কথায়, অন্তর্বাণিজ্যের অভিজ্ঞতায় এবং লৌকিক গল্পকথায় রক্ষিত নানা প্রসঙ্গ থেকে চাঁদ সদাগরের চরিত্রের সাহস ও বীর্যের ভিত্তিভূমিটি হয়তো সংগৃহীত হয়ে থাকবে। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরকে দিয়ে মনসাদেবী (এবং চন্ডীমঙ্গলে ধনপতি সদাগরকে দিয়ে চন্ডীদেবী) পূজা করিয়েছেন। '' বণিক সম্প্রদায়কে দিয়ে অনার্য মেয়ে দেবতার পূজো আদায় থেকে মনে হয় যে, তৎকালীন সমাজে বণিক সম্প্রদায় সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল, অথবা এই সম্প্রদায়ই ছিল ব্রাহ্মণ্য সংস্কার-সংস্কৃতির প্রধান সহায়ক ও ধারক।''[১৫] সে জন্যে তাদের দিয়ে অনার্য দেবতা এবং দেবতার অন্তরালে অনার্যদের সামাজিক স্বীকৃতি লাভের চেষ্টা এত প্রকট এবং এর মাধ্যমে বিশেষ করে মনসামঙ্গল (এবং চন্ডীমঙ্গল) রচনার পেছনে গভীর সামাজিক ইতিহাসের স্বাক্ষর পরিস্ফুট হয়েছে।

হিন্দু চতুর্বর্ণের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকারী বৈশ্যের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বণিক ।[১৬] বিশেষ করে মনসামঙ্গল এবং চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী হচ্ছে বণিক শ্রেণীর কাছে মনসা ও চন্ডী - এই দু'দেবীর প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, এ হচ্ছে সেই সমাজের কাহিনী যে সমাজে বণিকরা নিয়ামক শক্তি, অথবা এদের প্রতিপত্তি, সামাজিক মর্যাদাই সমাজে প্রধান বিষয় ছিল, যার কারণে তাদের স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির উপরই নির্ভর করতো সমাজের বহু বিষয়ের টিকে থাকা না থাকা। তাই মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের উপাখ্যানের এ সত্যটুকু অবশ্যই স্বীকার্য যে, যাঁরা শৈবধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে লৌকিক ধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, চাঁদ সদাগর তাঁদের এক দলের নেতা ছিলেন এবং পরিশেষে তিনি মনসাদেবীর পূজা অনুমোদনে স্বীকৃত হয়েছিলেন। অনেক পল্লীগীতিকা ও রূপকথায় চাঁদ বণিকের উল্লেখ আছে ; সমুদ্র পথে যাতায়াতকারী বণিকদের মধ্যে চাঁদ সদাগর যে অগ্রণী ছিলেন এবং দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, এটা তারই সাক্ষ্য দেয়। ''হয়ত খ্রীস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে তিনি বিদ্যমান ছিলেন তখন বাঙ্গালার বাণিজ্য জগৎ-ব্যাপক প্রসারতা লাভ করিয়াছিল এবং আর্য-ধর্ম্মের সঙ্গে লৌকিক ধর্ম্ম গুলির একটা সংঘর্ষ ও বোঝাপড়া হইতেছিল।''[১৭] চাঁদ সদাগরের

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা বিভিন্ন কবির মনসামঙ্গলেই ফুটে উঠেছে। বিজয় গুপ্তের কাব্যে মনসা চাঁদ সম্পর্কে বলেছেন -

'' নগর-মন্ডল চান্দ চম্পকের রাজা ।
চম্পক নগরে মোর মানা করে পূজা।।''[১৮]

ভারতীয় উপমহাদেশের বর্ণাশ্রম প্রথা যেহেতু বৃত্তিবাচক, সেজন্যে বণিক শ্রেণীর সুযোগ-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির অর্থ সমাজের একটি বিশেষ বর্ণের অর্থনৈতিক তথা সামাজিক জয়যাত্রা অব্যাহত থাকার ইঙ্গিতবাহী।[১৯] বাংলাদেশসহ এ উপমহাদেশে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বণিক ব্যবসায়ীদের বিশেষ করে 'শ্রেষ্ঠী', 'মহাজন' প্রভৃতি উপাধি যে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে সেটা তাদের অর্থ - সম্পদ - বিত্তের বিবেচনা থেকেই।[২০] মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগরের ক্ষেত্রেও এরূপ পরিলক্ষিত হয় ঃ

''ডাক দিয়া বলে তবে রোঙ্গাই ব্রাহ্মণ।
তোমার দেশেতে আইল সাধু মহাজন।।
চম্পক নগরে রাজা চান্দ সদাগর।
বাণিজ্য করিতে আইল কহিল সত্বর।।''[২১]

সমকালীন সমাজে ধনী-নির্ধনে এবং উচ্চ-নীচে ভেদ বুদ্ধির প্রখর ছিল । প্রধানত অর্থ-সম্পদ, পেশা এবং বংশ ভেদে কেউ ঘৃণ্য - অবজ্ঞেয়, কেউবা শ্রদ্ধেয় - সম্মানিত হত। হিন্দুসমাজে মানুষ জন্মসূত্রে জাতবর্ণ - অনুসারে ঘৃণা কিংবা সম্মান পেত। যেমন- ডোম, পাটনী, কৈবর্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ সমাজে অবজ্ঞা বা করুণার পাত্র ছিল। জেলে (কৈবর্ত) জালু-মালুদের বাড়ীতে মনসাপূজার শঙ্খ - ঘন্টাদি বাদ্যধ্বনি শুনে চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সনকা অবজ্ঞার সুরে উচ্চারণ করেছিলেন ঃ

''কৈবর্তের বাড়ী শুনি কিসের হুলস্থূলি ।।''[২২]

এখানে আরকেটি বিষয় লক্ষণীয় । তৎকালীন বেশির ভাগ উচ্চ বিত্ত ব্যক্তি গরীব, অসহায়, সম্বলহীন প্রতিবেশীদের সম্পর্কে একটা অবজ্ঞামিশ্রিতভাব মনে পোষণ করত। দুপা এগিয়ে গরীব প্রতিবেশীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্পর্কে কোনরকম খোঁজ খবর রাখার আগ্রহও তাদের ছিল না। গরীব প্রতিবেশী জালুদের মানবেতর জীবনযাত্রা সম্পর্কে স্বাভাবিক অবস্থায় সনকার কোন কৌতুহল লক্ষ্য করা যায়নি। কিন্তু জালুদের পরিবর্তিত আর্থিক অবস্থায় যখন তারা বাড়ীতে সাড়ম্বরে, সবাদ্য পূজানুষ্ঠান শুরু

Dhaka University Institutional Repository

করেছে তখন মনকা জাত্যাভিমানী হয়েও নীচু জাতির বাড়ীতে তথ্য সংগ্রহের জন্যে দাসীকে পাঠিয়েছেন, এবং সনসার বরে জালু-মালুদের দারিদ্র্য দূরীভূত হয়ে উল্লেখযোগ্য সচ্ছলতা আসার সংবাদ জেনে পরবর্তীতে তিনি ছয় পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে কৈবর্ত জালুদের বাড়ীতে গিয়েছেন ঃ

"জালুমালুর সম্পদ সনকা শুনিয়া।
বাড়ীর ভিতরে গেল ছয়বধূ লৈয়া।।
* * *
মনসার ঘট দেখি দন্ডবৎ হৈয়া।
জালুর মায়েরে পুছে আদর করিয়া।।"[২৩]

সনকা শুধু প্রথমবারের মত জালুদের বাড়ী বেড়াতেই এলেন না ; কোন দিন বাক্যালাপ নেই, সেই জালুর মাকেও তিনি যথেষ্ট আদর করলেন। অর্থাৎ তৎকালীন সমাজে আভিজাত্যের অন্যতম উৎস ছিল অর্থ-সম্পদ। তাইতো ধন-সম্পদ জালুমালুদের বেশ-ভুষার দীনতা ঘোচানোর পাশাপাশি জাতিগত নীচত্বও ঘুচিয়ে দিয়েছিল।

মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগর শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি নন, উচ্চ অভিজাত সমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ। কোন ব্রাহ্মণ কিংবা ভু-স্বামীকে না দিয়ে চাঁদ বণিককেই উচ্চবর্গের প্রতিনিধির সম্মান দেওয়া থেকে প্রমাণিত হয় যে, তৎকালীন সমাজে বণিক সম্প্রদায়ের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চে ছিল।[২৪] কুলীন প্রবর চাঁদ সদাগর তার মনসা বা পদ্মাকে পূজা না করবার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন ঃ

"কষ্ট করহ জে জদি সত্য কহিতে উচিত।
হও তোমি সিবের কন্যা হইয়াছ পতিত।।
জাতিহিন জাতি তোমি না কর বিচার।
জেই পূজা পূজে তোমি জাও খাইবার।।
পন্চ কোলিন মধ্যে আমি যে কোলিন।
কোন কালে কোন কর্ম্ম না করিচি হিন।।"[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন সমাজের শিক্ষাদান রীতির পরিচয় পাওয়া যায় বিপ্রদাসের কাব্যে। লখিন্দরের শিক্ষালাভ প্রসঙ্গে কবি বিপ্রদাস উল্লেখ করেছেন ঃ

"লখাইর হাথে খড়ি দিল শুভক্ষণে।
ক খ গ ঘ ঙ পড়ে হরিষ অন্তরে
চৌত্রিশ অক্ষর পড়ে বালা লখিন্দরে।
অষ্টদশ ফলা পড়ে হরষিত-মন
চৌত্রিশ অক্ষরে ফলা করিল পঠন।
অষ্ট ধাতু অষ্ট শব্দ পড়িল সত্বরে
সোমাই পন্ডিত দ্বিজ শুভদিন করে।
শাস্ত্রশাল লইলেক বালা লখিন্দর
প্রথমে পড়ায় সূত্র সুখে দ্বিজবর।
তারপর ব্যাকরণ পড়ে রাজসুতে
ভট্টি রঘু সাহিত্য পড়িল হরষিতে।
অলঙ্কার কুমার পড়িল অভিধান
জ্যোতিষ নাটক কাব্য পড়িল বিধান।
অষ্টদশ পুরাণ পুড়িয়া অনিবার
হইল পন্ডিত বড়ো রাজার কুমার।"[২৬]

সে সময়ে সীমিত পরিসরে নারীশিক্ষারও (মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত ঘরে) প্রচলন ছিল।[২৭] সাধারণত পাঁচ বছর বয়সে কোন কোন মেয়েকে বিদ্যা শিক্ষার্থে গুরুগৃহে টোলে ছেলেদের সাথে ভর্তি করা হত। তবে প্রাথমিক স্তরের পরে মেয়েদেরকে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের অনাগ্রহই প্রকাশ পেত। শ্রীরায় বিনোদের কাব্যে দেখা যায় - বাসর ঘরে সর্পে দংশিত হয়ে মারা যাওয়ার আগে লখিন্দর ঘুমে অচেতন বেহুলার কাছে ভূর্জ পাতায় তাঁর মৃত্যুর কারণসহ আরও কিছু নির্দেশ লিখে রেখে যায়। এর মধ্যে লখিন্দর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে বেহুলা ঘুম থেকে জেগে সেই লেখা দেখে সমস্ত বুঝতে পারে।

"বাটীর উপরে কন্যা দেখিল লিখন।।
পত্র পড়িয়া কন্যা জানিল বিবরণ।"[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

এর থেকে বুঝা যায় শ্রীরায় বিনোদের বেহুলা (বিপুলা) অন্তত সাক্ষর ছিলেন। তাঁর কাব্যে শৈশবে মনসা বা পদ্মাবতীর বিদ্যা লাভ সম্পর্কে উক্ত হয়েছে ঃ

"পঞ্চ বৎসরে তান খড়ি দিল হাতে।
গুরুস্থানে পদ্মাবতী পড়ে সানন্দিতে।।"[২৯]

বঙ্গদেশের সমকালীন নিরক্ষর মনসামঙ্গলের কবিদের মধ্যেও সমাজ- সচেতনতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। মনসার পূজা মর্ত্য ভূমিতে প্রচার করার জন্যে কবি বিষ্ণু পাল বেহুলারূপে জন্মগ্রহণের আগে ঊষা মনসাদেবীকে দিয়ে তিনটি সত্য তথা শপথ করিয়ে নিয়েছেন -

"গোহত্যা ব্রহ্ম হত্যা সুরাপান করে।
তুমি না তরাল্যে, বাছা সেই পাপ ধরে।।
শূদ্র না হইঞা যেবা নীল বস্ত্র পরে।
তুমি না তরাইলে, বাছা, সেই পাপ ধরে।।
কুইলা বলদ যেবা রাখিবে গোহালে।
তুমি না তরাইলে, বাছা, সেই পাপ ধরে।।"[৩০]

কবির সমাজ - অভিজ্ঞতায় গোহত্যা, ব্রহ্ম হত্যা, সুরাপান , দ্বিজের নীলবস্ত্র ধারণ ইত্যাদি পাপাচরণের মতই কইলা বাছুর (২১ দিনের কম বয়স্ক) গোয়ালে বেধে রাখাও পাপ - এটা বুঝিয়েছেন। বীর ভূমের সুবর্ণবণিকদের বিবাহানুষ্ঠানের একটি প্রথা বা আচারকে 'গাছবেড়া ' বলা হয়। বিবাহের দিন বা বিবাহের আগের দিন অথবা গায়ে হলুদের দিন সম্পূর্ণ ভাবে মনসাদেবীকে নিয়ে অনুষ্ঠিত এই প্রথাটি এখনও বীরভূমের সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায় কর্তৃক পালিত হয়ে থাকে । বীরভূম জেলার কবি বিষ্ণু পাল তাঁর কাব্যে 'গাছবেড়া ' অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েও (মূল কাহিনীর সাথে যার কোন সংযোগ নেই) সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন।

"এস্য গো সমান লোক এক চিত্ত মনে।
গাছ মঙ্গলিব গো বেউলার শুভক্ষণে।
গোড়ায় বিষ্ণু আগ্লিলা গাছে ভগবতী।
পাতে সরস্বতী আগ্লিল সিসে পার্বতী।
ভূত না পেরেত দক্ষি থাকে এই গাছে।

Dhaka University Institutional Repository

আন্তরে পালাল্যা তারা মনসার ডরে।''৩১

তৎকালে তাম্বুলসহকারে নিমন্ত্রণ করার প্রথার প্রচলন ছিল। যেমন - বেহুলার বিয়ের অনুষ্ঠান - উপলক্ষে এয়োগণের নিমন্ত্রণের সময় ঃ

''হরিষ হৈল তবে সুমিত্রা পাটেশ্বরী।
অইওগণ আনিতে পাঠাইল অনুচরী।।
আড়ি ভরিয়া তবে তাম্বুল লৈল কাঁখে।
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রিয়া বেড়াএ কৌতুকে।।''৩২

এছাড়া আপ্যায়নে কিংবা কোন কর্মে নিয়োগের চিহ্ন হিসেবে সেকালে তাম্বুলের ব্যাপক প্রচলন ছিল ঃ

'' ধর লেহ বাঘা তাম্বুল ধর খাও।''৩৩

বর্তমান কালের মত সেকালেও অভাব - দারিদ্র্য ছিল। সাধারণ মানুষ কোন রকমে বেঁচে থাকাতেই সন্তুষ্ট থাকত। সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি থাকলেও তাকে ঘৃণার চোখে দেখা হত। ছদ্মবেশিনী চন্ডীর শিবকে কথিত উক্তি থেকে তার প্রমাণ মেলে ঃ

''গালাগালি কর কেনে ভিখারী হইয়া।''৩৪

তৎকালীন সময়ে অপরাধীকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে শাস্তি৩৫ প্রদান করা হত ঃ শূলে ও শালে বিদ্ধ করা, কেটে ফেলা, পেষণ করা, পুড়িয়ে মারা, মাথা মুড়িয়ে চুনকালি দেওয়া, কারাগারে আটকিয়ে রাখা ইত্যাদি। অপরাধের প্রকৃতি বুঝে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হত ; যেমন - চুরি ডাকাতি ঘটিত অপরাধে শালে চড়িয়ে শাস্তি দেওয়া হত ইত্যাদি। গুরুতর অপরাধের শাস্তি হিসেবে কারাগারে আটকিয়ে রাখার রীতি সেকালেও প্রচলিত ছিল। লঙ্কারাজ (চন্দ্রকেতু)। এর সাথে প্রতারণা করার কল্পিত অপরাধে চাঁদ সদাগরকে কারাগার তথা বন্দীশালায় আটকিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন লঙ্কেশ্বরঃ

''চন্দ্রকেতু বোলে সাধু কর নিয়া বন্দি।।''৩৬

সেকালের কবিরা পরিবেশ-সচেতন ছিলেন। তুর্কী তথা মুসলমান অভিযানের পর বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। নও-মুসলিমরা আসছিল মূলতঃ নিম্ন শ্রেণীর

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু যেমন - তাঁতী বা জোলা প্রভৃতি সম্প্রদায় থেকে। প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্য মনসামঙ্গলের কবিগণ মধ্যযুগের বাংলার সামগ্রিক অবস্থা দৃষ্টে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন - এক জাতের লোক দেবতা - বিদ্বেষী কিংবা দেবতার প্রতি উদাসীন থাকলে চলবে না ; তাই তাঁরা তাঁদের কাব্যে ' হাসান-হোসেন ' পালার অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়েছেন। এ পালায় প্রথমে নিন্দা - অবজ্ঞা-দ্বন্দ্ব, সবশেষে স্বীকৃতি ও শান্তি এবং সহাবস্থান। কবিগণ গরীব মুসলিম জোলার জীবনযাত্রা -প্রণালীও অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন জোলা নারী আক্ষেপের মধ্য দিয়ে ঃ

''তোর জত কামাই কহিব কাহার ঠাঞি
দিনে বুনাও একখান কোঁচা।
আতুল সম্পদ ঘরে তুমি দিয়া জাও কারে
তিন কাঠা ধানের তিন মাচা।।''[৩৭]

হাসান ভক্তিভরে মনসাদেবীর পূজা দিয়ে তাঁর বন্দনা - গান করেছেন এভাবে ঃ

''শুনিয়া হাসন রাজা দ্রবিদ্র-হৃদয়
ক্ষিতি লুটি অষ্টাঙ্গ প্রণাম করি কয়।
অপরাধ ক্ষেম মোরে জগত - জননী
পাপ মুখে কতেক বলিল মন্দ বাণী।
জগত - ঈশ্বরী তুমি আদি নিরাঞ্জন
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি নারায়ণ।
স্বর্গ মর্ত রসাতল এ তিন ভুবন
চন্দ্র সূর্য্য ইন্দ্র আদি তুমি সে কারণ।
বরুণ আনল বায়ু সিদ্ধ সাধ্য জত
স্থাবর জঙ্গম তরু তোমাতে মিশ্রিত।
কি বলিতে জানি আমি অতি দুরাচার
কহিতে না পারে বিধি মহিমা তোমার
পুলকে আকুল হৈয়া বল এ হাসন
বৃথা কেন ধরি আমি এ ছার জীবন।
অধম দুর্মতি দুষ্ট আমি হীনজাতি

Dhaka University Institutional Repository

তব নিন্দা দোষে মোর হব অধগতি।
নিজগুণে কৃপা যদি কর একবার
পাপিষ্ঠ হাসন-মাথে চরণ - প্রহার।''[৩৮]

হাসানের ভক্তি - স্তুতিতে মনসার অন্তর করুণায় দ্রবীভূত হয়ে উঠেছে ঃ

''হরিষে মনসাদেবী তুষ্ট হৈয়া অতি
আধিক বাড়িল দয়া হাসনের প্রতি।
কহিতে লাগিলা মাতা হাসনের তরে
ধন্য ধন্য ক্ষিতি মাঝে তুমি নৃপবরে।
অচিরাতে রাজ্য কর নিজ মন-সুখে
মোর বরে জরামৃত্যু নাহি শোক - দুখে।
ছত্রিশ আশ্রম লৈয়া সুখে ভুঞ্জ রাজ্য
প্রচার করিহ ক্ষিতি মোর পূজাকার্য্য।
বর দিলা হাসনেরে ভকতবৎসলা
পদাঘাত কৈলা শিরে হাসিয়া কমলা।
আচম্বিতে অন্তর্ধান হৈলা তথা হৈতে
এথায় হাসন রাজা রহে হরষিতে।''[৩৯]

মনসামঙ্গলের কবিগণ পরিবেশ সচেতন ছিলেন বলেই সম্যকভাবে বুঝে ছিলেন যে, ধর্মীয় সহনশীলতার ভিত্তিতে গ্রামে গ্রামে পরস্পরের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের মনোভাব নিয়ে সহাবস্থানের মাধ্যমেই সমাজ তথা দেশে বিরাজ করবে স্বস্তি, শান্তি এবং কল্যাণ। তাই, তাঁরা মুসলমানের কণ্ঠেও বাণী দিয়েছেন এভাবে ঃ

''তার মাঝে একজন জাতি মুসলমান।
সে বলে, ''উচিত নহে, রাখ হিন্দুয়ানি।
একই ঈশ্বর দেখ হিন্দু মুসলমানে.
যার তার কর্ম, সেই করে ধর্মজ্ঞানে।।
সকলের কুলাচার সৃজিলা গোঁসাই।

Dhaka University Institutional Repository

পাষন্ড হইয়া তাতে কোন কার্য নাই।''[৪০]

মধ্যযুগে, যখন ধর্ম দিয়েই জাতিরও পরিচয় নির্ধারিত হত সে সময়ে রাজার ধর্ম ও প্রজার ধর্ম যদি এক না হয় তা হলে ' রাজার জাতি' যে 'প্রজার জাতি'র উপর বিভিন্ন অজুহাতে উৎপীড়ন করবে সেটাইতো স্বাভাবিক। বিজয়ে গুপ্তের মনসামঙ্গলে, মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গলে , ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে তার আভাস আছে। কিন্তু রাজনৈতিক পরিবেশে যে একটা মারাত্মক পর্যায়ের অনিশ্চয়তার পরিস্থিতি কিংবা ব্যাপক মাৎস্যন্যায় অব্যাহত ছিল, সেটা মনে করার কারণ নেই। বহু মুসলমান নবাব রাজকীয় স্বার্থে এবং অর্থনৈতিক কারণে হিন্দু ভূস্বামীদের উপরে উৎপীড়ন-নির্যাতন করেছেন, এর দ্বারা হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সংঘাত প্রমাণিত হয় না। স্বাভাবিক ভাবে অপদার্থ নবাব এবং সামন্তদের সংখ্যা ছিল বেশি, প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল খুবই দুর্বল। এই সুযোগে দেশে দস্যু - তস্করের উৎপীড়নের পাশাপাশি ভূস্বামী সামন্তদের নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। অপর দিকে অত্যুৎসাহী উগ্র ধর্ম প্রচারকরা মুসলমান শাসনব্যবস্থাকে ঢাল ধরে ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে কিছু জোরজবরদস্তি করে থাকবে। এদিকে যোগ্য শাসকেরা হিন্দু প্রধান এই দেশের জনগণের সাথে ঝগড়া - বিবাদে লিপ্ত হতে চাননি ; বরং তাদের রাজকীয় এবং অর্থ-সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্বে ব্যাপক সংখ্যক হিন্দুকে নিয়োগ করার নজির আছে। হিসাব রক্ষায়, রাজনৈতিক মন্ত্রণায়, এমন কি যুদ্ধ বিষয়ক নীতি নির্ধারণেও গুণী হিন্দুরা নিযুক্ত হয়েছেন - এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। আবার কোন কোন মুসলমান নবাব এবং সামন্ত হিন্দু কবিদের সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে উৎসাহ জুগিয়েছেন। তাই বলা যায়, ''বাঙালী জাতির নিজস্ব ধর্মীয় পরিমন্ডল সুস্পষ্ট করে তুলতে তুর্ক বিজয়ের ভূমিকা খুবই বেশী।''[৪১]

বাংলাদেশের লোক সমাজ এবং লোক সাহিত্য হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষের মিলন - মিশ্রণের ফলেই গড়ে উঠেছে। মনসামঙ্গলেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার পর ঘূর্ণিবাত্যা কেটে গেলে যখন সাহিত্য-চর্চা শুরু হয় তখন কবিগণ বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার করতে থাকেন । মনসামঙ্গলের বেশ কিছু কবিও (যেমন - বিপ্রদাস, দ্বিজ বংশীদাস প্রমুখ) এ ব্যাপারে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এর দ্বারা ইসলামী জীবনচর্চার সাথে কবিদের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। আরেকটি বিশেষ দিক লক্ষনীয়-সেটা হচ্ছে মুসলমানী প্রভাবযুক্ত সামাজিক প্রথা । খ্রীস্টীয় পনেরদল শতকের কবি জয়ানন্দ লিখেছিলেন যে, মুসলমানদের প্রভাবে সে যুগে ব্রাহ্মণগণ দাঁড়ি রাখতেন।[৪২] মনসামঙ্গল কাব্য পাঠে জানা যায়, এর নায়ক চাঁদ

Dhaka University Institutional Repository

সদাগরেরও দাঁড়ি ছিল। আবার, কবি জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল থেকে জানা যায় - লখিন্দর বিয়ে করতে গিয়েছিল ' কশিদার পাগড়ী ' মাথায় দিয়ে ; বরযাত্রীরাও অনেকে পাগড়ী পরেছিলেন।

''লেঙ্গা বোলে শিরে যার পাগ আছে কশিদার
মুখ যেন চন্দ্রের আকার।
তুমার জামাতা হয় কর যায়া পরিচয়
চতুর্দ্দিগে ঘোড়া আসোয়ার।।
বাছো বোলে সভার শিরে পাগ কশিদার
সভার মুখ চন্দ্রের আকার।
আমার জামাতাকে সত্বরে দেখায়া দে
কুন জন চান্দোর কুমার।।''৪৩

মুসলমানী প্রভাব সমকালীন হিন্দু সমাজের কতখানি গভীরে ঢুকে পড়েছিল, এখানে তারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে । সুকুমার সেন তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন, '' জাতি হিসাবে মূর্ত রূপ ধারণ করিবার পক্ষে বাঙ্গালায় বাহ্য সংঘাত যোগাইয়াছিল তুর্কী অভিযান ও মুসলমান শাসন, আর আভ্যন্তর শক্তি বিচ্ছুরিত করিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্য।''৪৪

মনসামঙ্গলের কবিরা চাঁদ সদাগরকে দেব-বিদ্বেষী নয়, শুধু মনসা - বিদ্বেষী রূপেই চিত্রিত করেছেন। কুলীন চাঁদ সদাগর অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের দেবতা মনসাকে পূজা করতে চাননি। বিজয় গুপ্তের চাঁদ তাই বাণিজ্য যাত্রাকালে -

''কার্ত্তিকে করিলা প্রভু বিষ্ণুর পূজন।
ফাল্গুনে চলিলা সাধু দক্ষিণ পাটন।।
বাড়াহি যমুনা পোজে গঙ্গা ভাগীরথী।
অষ্ট লোক পূজিলেক লক্ষ্মী সরস্বতী।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু পূজিলেক উমা মহেশ্বর।
অষ্ট লোকপাল পোজে দেব দিবাকর।।
একে একে পূজিলেক দেব দিবাকর।
নানা বাদ্য বাজে তাহে শুনি মনোহর।।

Dhaka University Institutional Repository

পদ্মাবতী না পূজিল সাধুর কুমার।''৪৫

বিপ্রদাসের কাব্যে চাঁদের বাণিজ্য যাত্রাকালে শোকাকুল সনকা স্বামীসহ সকলকে কাতরভাবে দেবী মনসার পূজা করার অনুরোধ জানালে -

''সভে মিলি যুক্তি করি পূজিবে জে বিষহরি
যত্ন করি বুঝাবে রাজারে।''৪৬

কিন্তু বাস্তবে স্ত্রী-চাকরাদির একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও চাঁদ মনসাদেবীর পূজা করলেন না। বরং বাণিজ্য যাত্রাকালে -

''গন্ধেশ্বরী প্রথমে বরিল সাবধানে
অনেক ছাগল করিয়া বলিদানে।''৪৭

এবং বাণিজ্য যাত্রাপথে -

''দেখিয়া ত্রিবেণী গাঙ্গ চাঁদো রাজা মনে রঙ্গ
কূলেতে চাপায় মধুকর
আনন্দিত মহারাজ করে নৃপ তীর্থ - কাজ
ভক্তিভাবে পূজে মহেশ্বর।''৪৮

''পূজিল নিমাই - তীর্থ করিয়া উত্তম

* * *

খড়দহে শ্রীপাটে করিয়া দন্ডবত

* * *

চিতপুরে পূজে রাজা সর্বমঙ্গলা

* * *

স্নান তর্পণ করি কৈল ইষ্টি-পূজা
পূজিল বেতাই চন্ডী চাঁদো মহারাজা

* * *

কালিঘাটে চাঁদো রাজা কালিকা পূজিয়া

Dhaka University Institutional Repository

চূড়াঘাটি বাহি যায় জয়ধ্বনি দিয়া।''৪৯

* * *

''সঙ্কেত মাধবে পূজে হইয়া একমন
তীর্থ কার্য্য শ্রাদ্ধ কৈল পিত্রির তর্পণ।''৫০

লখিন্দরের জন্মের পর জাতকর্মাদি থেকেও তৎকালীন সমাজের পূজার্চনা প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা করা যায় ঃ

''গ্রহ লগ্ন জতো সব শুভক্ষণ হইল
হেন কালে সনকা তনয় প্রসবিল।

* * *

ছয় দিনে সুতিকা পূজিল সুবিধান
অষ্ট দিনে আট কলাই কৈল শিশুগণ:
নবম বাসরে নত্তা করিল হরিষে
ত্রিশ দিনে অশোচন্তি করিল বিশেষে।
একত্রিশ দিনে করে ষষ্ঠীর পূজন
নানা পরকারে কৈল নানা আয়োজন:

* * *

ছয় মাস হইল যদি রাজার নন্দন
অন্ন দিতে করিল প্রচুর আয়োজন।

* * *

দেবার্চনা কৈল তবে হরষিত মনে
নান্দী মুখ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিল বিধানে।
নানারত্ন বিভুষণ পুত্র কৈল কোলে
নানাবিধি বাদ্য বাজে মহাকোলাহলে।
শুভক্ষণে অন্ন দিল পুত্রের বদনে
লক্ষিন্দর নাম রাখে রাজার বিধানে।''৫১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে সত্যিকার মৌলিক কবিত্ব বিকাশ শুধুমাত্র লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য- সূচক মঙ্গলকাব্য (বিশেষ করে প্রাক-চৈতন্য যুগের) - এর ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে। এদিক থেকে সূক্ষ্ম ভাবে কেবল মনসামঙ্গল (নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত এবং বিপ্রদাস রচিত) কাব্যকেই পাওয়া যায়। মধ্যযুগের এই প্রেক্ষাপটে সমগ্র হিন্দু সমাজটি চাঁদ সদাগরের চরিত্রের মধ্যে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। এখানে মনসা অত্যাচারী রাষ্ট্র শক্তির প্রতীক এবং চাঁদ সদাগর অত্যাচারিত হিন্দু সমাজের প্রতীক । তাই দেবতা হিসেবে কল্পিতা হওয়া সত্ত্বেও একদিক দিয়ে মনসার প্রতি সমাজের ঘৃণা এবং অপর দিক দিয়ে অত্যাচারিত চাঁদ সদাগরের প্রতি সমাজের সহনাভূতি বিচ্ছুরিত হয়েছে। সমাজমন কি পরিমাণ ভয়চকিত হলে এবং সম্ভ্রমবোধ বিসর্জন দিলে দেবত্ব পরিকল্পনা এরকম হীন রূপ পরিগ্রহ করতে পারে সেটা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। এটা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্য মনসামঙ্গলেই বাংলাদেশে মুসলমান-বিজয়ের পরোক্ষ ছদ্মবেশী প্রভাব পড়েছে।

বলা হয়ে থাকে, ''মঙ্গলকাব্যগুলো বাঙালী হিন্দুর মন-মনন ও সংস্কৃতির প্রসূন।''[৫২] বাঙালী চরিত্রের আসল পরিচয় মিলে তার মানস - প্রবণতানুযায়ী লৌকিক দেব কল্পনায়। তার জীবন-জীবিকার ইষ্ট এবং অরিদেবতার সৃষ্টির কল্পনায়, আদর্শে ও তত্ত্বে বিকশিত হয়েছে তার চারিত্রিক স্বরূপ লক্ষণ, সমাজ-সংস্কৃতির নকশা। এখানে দেবতাও বিশাল ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ, মঙ্গলকাব্যে তাই মানুষ এবং মানবীয় রসেরই সন্ধান পাওয়া যায়। মনসামঙ্গলও এর থেকে ব্যতিক্রম নয়। স্থূলভাবে বললে দাঁড়ায় - অর্থ -সম্পদই হচ্ছে শক্তির উৎস, ধন যার, মান তার। রাজা শক্তিমান ধনী হওয়ার কারণে, রাজার পরে সমাজে সদাগরই ধনী। তাইতো মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরই হচ্ছেন ব্রাহ্মণ্য আদর্শের ধারক এবং রক্ষক। অনুরূপ ভাবে লৌকিক দেবতা মনসার লক্ষ্যও তিনিই। মানুষ মুখে যত বড় মহৎ কথাই বলুক, জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার চিন্তায় তারা অহর্নিশি চিন্তায়মান। তাই প্রকৃত শক্তির প্রসন্নতাকামী কৃষি নির্ভর রোগভীরু, অজ্ঞ এবং সহায়হীন জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে নিয়তিরূপ দেবতার প্রভাবকে যখন উপলব্ধি করল, তখন তাঁর নিকটে আত্ম-সমর্পণ না করে উপায় রইল না তাদের। মনসামঙ্গলের প্রতি স্তরে স্তরে ছড়িয়ে রয়েছে এই মাটিকে এই জীবনকে ভালবাসার স্বাক্ষর ; সুখ ও শান্তিলাভের প্রাণান্তকর প্রয়াস। মনসামঙ্গল তাই তৎকালীন বাংলাদেশের এবং বাঙালীজীবনের অন্তরঙ্গ ইতিহাস। বেহুলা - লখিন্দর - সনকা - চাঁদ - মনসা - চন্ডী - শিব প্রমুখ ভালয় - মন্দয় নাম ভেদে এ সমাজের প্রতিবেশী- এ সমাজেরই ঘরের লোক।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ঃ

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়), পৃঃ ১৮৭

২। বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), পৃঃ ২৭৪

৩। বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (প্রথম খন্ড ঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগ), মুক্ত ধারা, ঢাকা, বাংলাদেশে দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮০, পৃঃ ৩৯

৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড ঃ ? - ষোড়শ শতাব্দী), পৃঃ ৭৮

৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮

৬। মমতাজুর রহমান তরফদার, বাংলার ধর্মজীবন, (আনিসুজ্জামান সম্পাদিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড), এর পঞ্চম অধ্যায়), পৃঃ ২৭১

৭। বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), পৃঃ ৩৪৫

৮। মানব ধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্য যুগ, পৃঃ ৫৭

৯। বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), পৃঃ ৪৫১

১০। মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৪৪

১১। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (প্রথম খন্ড ঃ আদি ও মধ্য যুগ), পৃঃ ৫৪

১২। বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খন্ড) পৃঃ ৩৯৯-৪০০

১৩। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (সম্পাদিত), কবি শুকুর মাহমুদ বিরচিত গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস , বাংলা একাডেমী, ঢাকা , প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৪, পৃঃ ৮০

১৪। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৪২০

১৫। মানব ধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ , পৃঃ ৬৩

১৬। গোপিকারঞ্জন চক্রবর্তী, বাংলা মঙ্গলকাব্যে শ্রমজীবী মানুষ, অপ্রকাশিত পি, এইচ, ডি, অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬, পৃঃ ২৭

১৭। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম খন্ড), পৃঃ ২০২-০৩

১৮। বসন্তকুমার ভট্টাচার্য (সঙ্কলিত), বিজয়গুপ্ত প্রণীত পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, পৃঃ ২২৮

১৯। মনসামঙ্গল কাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী পৃঃ ৩৮

২০। মোহাম্মদ হাননান, মনসামঙ্গল কাব্য ঃ চাঁদ সদাগরের শ্রেণী-চরিত্র , (সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফাল্গুন ১৩৯৭), পৃঃ ১৯১

Dhaka University Institutional Repository

২১। বিজয় গুপ্ত প্রণীত পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল (বসন্তকুমার ভট্টাচার্য সংকলিত), পৃঃ ১২৮

২২। শ্রীরায় বিনোদ প্রণীত পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ১২৮

২৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৮

২৪। ডঃ শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে পুরুষ - চরিত্র, অমর নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশিত, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ , ১৯৯২, পৃঃ ৩৬

২৫। সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ৩৩২

২৬। বিপ্রদাসের মনসাবিজয় , পৃঃ ১৫৩

২৭। শ্রীরায় বিনোদঃ কবি ও কাব্য , পৃঃ ২৪১

২৮। শ্রীরায় বিনোদ প্রণীত পদ্মপুরাণ, পৃঃ ২৯৪

২৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪

৩০। বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা, পৃঃ ১৩৭

৩১। বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল, পৃঃ ১২৬

৩২। শ্রীরায় বিনোদ প্রণীত পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ২৬৫

৩৩। তন্ত্রবিভূতি -বিরচিত মনসাপুরাণ, পৃঃ ৯৯

৩৪। শ্রীরায় বিনোদ প্রণীত পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ৩১

৩৫। শ্রীরায় বিনোদ ঃ কবি ও কাব্য, পৃঃ ২০৪

৩৬। সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ২০৪

৩৭। শ্রীরায় বিনোদ প্রণীত পদ্মপুরাণ, পৃঃ ১১৭

৩৮। বিপ্রদাসের মনসাবিজয়, পৃঃ ৮১-৮২

৩৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২

৪০। বাইশ কবির মনসা - মঙ্গল বা বাইশা, পৃঃ ৬৯

৪১। মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১০

৪২। সাঈদ উর রহমান, মনসামঙ্গল কাব্য ও ইসলামধর্ম, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন ১৯৮৫), পৃঃ ১৯৫

৪৩। কবি জগজ্জীবন - বিরচিত মনসামঙ্গল , পৃঃ ১৮৭

৪৪। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড ঃ ? ষোড়শ শতাব্দী), পৃঃ ৮০

৪৫। জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত (সম্পাদিত), কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ২৪০-৪১

Dhaka University Institutional Repository

৪৬। বিপ্রদাসের মনসাবিজয়, পৃঃ ১৪১

৪৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪২

৪৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪২

৪৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৪

৫০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৬

৫১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫১

৫২। আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫, পৃঃ ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

মনসামঙ্গল কাব্যে দেবদেবীর স্বরূপ সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে। দেখা গিয়েছে দেব-দেবীরা বহিরঙ্গে দেবতা, কিছু কিছু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অন্তরঙ্গে অধিকাংশই মানবিক লক্ষণযুক্ত। মনসা-চরিত্রের জটিল মনস্তত্ত্ব সব কবির কাব্যে না হলেও বিজয় গুপ্ত প্রমুখ কবিদের কাব্যে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে ।

গবেষকরা সুদীর্ঘকাল অমানুষিক পরিশ্রম করে গবেষণার মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সিন্ধু সভ্যতা প্রাক্-বৈদিক সভ্যতা, বৈদিক আর্য সভ্যতা নয়।[১] বৈদিক আর্য সভ্যতায় নারী - দেবতার বিশেষ কোন স্থান যে ছিল না, সেটা বৈদিক সাহিত্যই সাক্ষ্য দেয় । কিন্তু ''সিন্ধুসভ্যতার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মাতৃদেবীর পূজা।''[২] গবেষকরা আরও অভিমত রেখেছেন যে, বাঙালী বণিকরাই (বাংলা মঙ্গল কাব্য সমূহে যাদের কথা বর্ণিত হয়েছে) বাণিজ্য উপলক্ষে সমুদ্র পথে যাতায়াতের সময় মাতৃদেবীর পূজার বীজ পৃথিবীর সর্বত্র নিয়ে গিয়েছিলেন ; গ্রীক , রোমান ও সিংহলদেশীয় সাহিত্যে বাঙালীদের উল্লেখ থেকে যার সত্যতা প্রমাণিত হয়।[৩] মনে করা হয়, আর্যভাষিগণ ভারতীয় প্রাক্-আর্যসভ্যতা থেকেই মাতৃদেবীর পূজা তথা মাতৃকা পূজার (cult of Mother Goddess) আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন।[৪] এ উপমহাদেশে আর্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হবার পর এখানকার পূর্ববর্তী সভ্যতার আদর্শও যে আর্য-সমাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যে শক্তি দেবতার পরিকল্পনা থেকে সেটাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। বাংলাদেশের সর্পদেবী মনসা বা পদ্মার পরিকল্পনায় এই অনার্যধর্ম সম্ভূত মাতৃকা-পূজা বা শক্তি পূজারই অন্যতম বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য, ''বৈদিক আর্যগণ সমাজ ব্যবস্থায় পিতৃতান্ত্রিক ছিলেন বলিয়া বৈদিক ধর্মে পুরুষদেবতার প্রাধান্য ; আবার আর্যেতর সমাজের এই মাতৃতান্ত্রিকতার প্রাধান্যের জন্য তাহাদের ভিতরে মাতৃদেবতার এবং মাতৃউপাসনার প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়।''[৫]

এটা প্রমাণিত যে, বাংলাদেশ মূলতঃ আর্য-অধ্যুষিত দেশ নয় ; এদেশের সমাজ দেহে আর্যরক্তের মিশ্রণ খুব বেশি নয় এবং সম্ভবত এই কারণেই এ দেশের ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে বৈদিক আর্য প্রভাবের আতিশয্য পরিলক্ষিত হয় না। এদেশে গুপ্ত - আমল থেকে উচ্চ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতিতে যে কিছু কিছু আর্য প্রভাব দেখা যায়, তাকেও বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য প্রভাব না বলে একটা

Dhaka University Institutional Repository

সমন্বয়জাত মিশ্র হিন্দু প্রভাব বলাই যুক্তিযুক্ত। এই হিন্দু প্রভাবের পাশাপাশি কিছু জৈন এবং বৌদ্ধ প্রভাবও পরিলক্ষিত হয় এই বাংলাদেশে। পাল-আমলে বৌদ্ধ - প্রভাব মোটামুটি প্রাধান্য বিস্তার করলেও সেন-আমলে হিন্দু-প্রভাবের পুনরুত্থান ঘটে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে শক্তিধর্ম এবং মাতৃপূজার চিহ্ন গৌণভাবে বিভিন্ন স্থানে প্রক্ষিপ্ত থাকতে দেখা যায়। তুর্কী বিজয়ের পর থেকে উচ্চ শ্রেণীর ধর্মমতের উপরে যখন প্রবল আঘাত আসে, তখন স্বাভাবিকভাবেই সমাজের নিম্নকোটির মাধ্যমে বিশেষ করে মাতৃতান্ত্রিকতা এবং শক্তিসাধনা সমাজদেহের সর্বত্র দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে।

বৌদ্ধ প্রধান দেবী তারার সহচরী হচ্ছেন জাঙ্গুলি , যিনি কৌম সমাজ থেকে আগতা এবং যাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণ্য তথা হিন্দু ধর্মের সরস্বতী এবং মনসার মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।[৬] মনসা বা বিষহরী বা পদ্মার সঙ্গে সরস্বতীর সমীভবনের প্রেক্ষাপটে এ উপমহাদেশের নদী-উপাসনার বিষয়টিও এসে পড়ে স্বাভাবিক কারণেই। পৌরাণিক যুগে গঙ্গা নদী পবিত্রতার আধার বলে গণ্য হয়েছিল (গঙ্গাকে আবার বিষহারিণী বলেও গণ্য করা হয়েছে), যে ভাবে বৈদিক যুগে সরস্বতী নদী গণ্য হয়েছিল। বুঝা যায়, সরস্বতী নদীর উত্তরাধিকার গঙ্গা নদীতে আরোপিত হয়েছে এবং বাংলাদেশে গঙ্গানদীর ব্যাপকতোয়া শাখাটি 'পদ্মা' নামে খ্যাতি পেয়েছে। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গে (যেখানে তুলনামূলক ভাবে মনসা বা পদ্মাপূজার প্রভাব অধিকতর) মনসা-তন্ত্রের ব্যাপক প্রসারের প্রেক্ষাপটে এই নামকরণের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। বলা যায়, ''মনসা-কালটের মধ্যে প্রাচীনতর নদী-উপাসনার ধারাটি এইভাবে সুপ্রচ্ছন্নরূপে বহমান রয়েছে।''[৭]

সর্প বা সাপ প্রজনন - শক্তির প্রতীক। কৌম সমাজের প্রজনন-শক্তির পূজা থেকেই সর্পদেবী মনসা বা পদ্মার পূজার সূচনা ঘটে। মাতৃকাদেবী মনসার ঘট-প্রতীকে পূজিত হবার বিধি সর্বজনবিদিত। ঘটে পূজিতা হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য মাতৃকাদেবী (যেমন চণ্ডী) - এর সাথে মনসার অনন্যতা হচ্ছে - অন্যান্যরা যেখানে শুধু ঘটরূপেই পূজিতা হন, সেখানে মনসা ঘটের গায়ে অঙ্কিতা গর্ভবতী নারীর মূর্তিতে অর্চিতা হন। এই সংযোজন সম্ভবত পৌরাণিক মনসা তথা জরৎকারু পত্নীর (যিনি কশ্যপের কন্যা, বাসুকীর ভগ্নী এবং আস্তিকের জননী) সঙ্গে লৌকিক মনসার একীভূতকরণের প্রয়াস। পতি জরৎকারু পত্নী মনসাকে (উল্লেখ্য, মনসারও এক নাম জরৎকারু) পরিত্যাগ করতে উদ্যত হলে, দেবতাদের পরামর্শে জরৎকারু স্ত্রীকে গর্ভবতী করে ছেড়ে চলে যান। সম্ভবত সচরাচর মনসার গর্ভবতী মূর্তি দেখার এটাই হচ্ছে কারণ। তাই ঘটরূপা মনসার প্রতীক-ধর্ম বাস্তবতার সাথে যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ । উত্তরবঙ্গে এবং রাঢ় দেশে বিয়ের আগে মনসাপূজা তথা 'গাছে বেড়া' উৎসবটি তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

প্রজনয়িত্রী রূপকেই বাঙ্ময় করে তোলে। রাঢ় তথা বীরভূমের মনসামঙ্গলের কবি বিষ্ণু পালের কাব্যে এ উৎসবের বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ

"এস্য গো সমান লোক এক চিত্ত মনে।
গাছ মঙ্গালিব গো বেউলার শুভক্ষণে।
* * *
মনসা আইল কেমনে জানি।
বাসি কাপড় মা এর হড়বড়ি শুনি।
গাঞের বাহিরে মণ্ডপখানি তায় বসন্তের বারা।
খেলনে বেড়ায় জগতি অষ্টনাগের মা।"[৮]

সকল সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে সর্পদংশনে প্রিয় পরিজনের, সন্তান-সন্ততির জীবনহানির আশঙ্কা থাকে না - এই দৃঢ় সরল বিশ্বাসেই সেই সুদূর অতীত থেকে বাঙালী হিন্দু নরনারী তাঁর পূজার্চনা করে আসছে। মনসা বাঙালীর ঘরের দেবতা। কেননা সর্প ভয়ে ভীত, দুর্বল চিত্ত বাঙালীই এক সময় মনসাদেবীর আবিষ্কার ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। সংস্কৃত পুরাণে বর্নিত বিষয়বস্তু বা আখ্যানভাগের সঙ্গে বাঙালীর মনসামঙ্গলের মিল সামান্যই। বাঙালী তার নিজস্ব জ্ঞান-বিশ্বাস এবং চরিত্রানুযায়ী তাদের আরাধ্যা দেবীকে গড়েছে, বিভিন্ন চরিত্র নির্মান করেছে। লখিন্দর, বেহুলা, সনকা প্রভৃতি নামগুলোও আর্যেতর। এই বেহুলা-লখিন্দর-চাঁদ সদাগরের কাহিনী বাঙালীর অনেক আদরের ও কাছের সামগ্রী। শত শত বছর ধরে চোখের জলধারায় 'মনসার ভাসান' কে তারা ভাসিয়েছে, মা মা ধ্বনিতে লুটিয়ে পড়েছে। প্রথম দিকে আর্যেরা তথা উচ্চ কোটির লোকেরা মনসার প্রতি বিরূপ থাকলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তাঁরা বাঙালীর এই দেবীকে অস্বীকার করতে পারেননি, 'শিব-দুহিতা' বলে বরণ করে নিয়েছেন।

গ্রীষ্ম প্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশের মানুষ সর্পকে গুরুত্ব না দিয়ে পারেনি। সাপের দ্রুত সর্পিল গতি, জলে-স্থলে সর্বত্র অবাধে চলাচল, জীবন-নাশকারী বিষ, বর্ণালী রূপ , ফণার সৌন্দর্য, দৈহিক শক্তি, আত্মরক্ষার কৌশল, ত্বক বদলানো, প্রজনন সামর্থ্য প্রভৃতি আদিম মানব সমাজ ভয়-শ্রদ্ধা-কৌতূহল মিশ্রিত দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করেছে। তাই অতীত কালে এদেশের আত্মপ্রত্যয়হীন এবং শঙ্কের ভঙ্গ মানুষ প্রাণের নিরাপত্তা কামনায় জীবন ও জীবিকার অরি-শক্তিকে (যেমন মনসা) প্রমূর্ত করে স্তব-

Dhaka University Institutional Repository

স্মৃতি করেছে। প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন কবির মনসাঙ্গল বা পদ্মাপুরাণে প্রাপ্ত মনসার নামান্তরগুলোর কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যায়। অনার্য নাম ' জাঙ্গুলী ' '(বিপ্রদাসে 'জাগুলি') ; ব্যাজোক্তিমূলক সাধারণ নাম ' বিষহরি' ; 'বিশাল অক্ষি' বা ' বিষাল অক্ষি' অর্থে 'বিশালাক্ষী' ও ' বিষালাক্ষী' ; 'কেতকা' (স্মৃতর্ব্য, আদ্যাদেবীর নামও 'কেতকা') ; পৌরাণিক মর্যাদাদানের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নাম 'মনসা' (শিবের মনোজ তথা কামজ বলে) ; 'ব্রহ্মাণী ' (ব্রহ্মজ্ঞান অথবা ব্রহ্মশক্তি সম্পন্না বলে) ; 'পদ্মা ' বা 'পদ্মাবতী ' (কালিদহে পদ্মপত্রে স্খলিত শিবের বীর্য থেকে জন্ম বলে) ইত্যাদি।

মনসামঙ্গল কাব্যের পুরুষ-দেবতারা বিশেষ করে শিব গৃহী নন ; বাস্তব জীবন সম্পর্কেও উদাসীন। পক্ষান্তরে, মহিলা-দেবতারা বিশেষ করে মনসা ও চণ্ডী অত্যন্ত সক্রিয় এবং জীবন মুখী। আবার পৌরাণিক সংস্কৃতির সঙ্গে লোক-সংস্কৃতির মিলনের শ্রেষ্ঠ সূত্র হিসেবে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত মনসামঙ্গল কাব্যেও শিবের ওপরে নির্ভর করা হয়েছে বেশি। কোপনস্বভাব উগ্রমূর্তি হিসেবে সর্পের দেবী মনসা যথার্থ স্বরূপে মনসামঙ্গল কাব্যে ফুটে উঠলেও কবিরা তাঁকে শিবের 'অযোনিসম্ভবা কন্যা' রূপেই প্রতিষ্ঠিতা করেছেন। ''অনার্য দেবী মনসাকে প্রধানত অভিজাত শৈব ও শাক্তদের সঙ্গে সংঘাতের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়।''[৯] চাঁদ সদাগর শিব এবং চণ্ডী বা ভবানী উভয়েরই উপাসক ছিলেন, যার উল্লেখ মনসামঙ্গল কাব্যের একাধিক স্থানে রয়েছে। সেই চাঁদ সদাগরকে নানা ভাবে কষ্ট-দুঃখ-শোক দিয়ে এবং নিজেও চাঁদের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে অপমানিতা, বিড়ম্বিতা হওয়ার পরেও মনসা আবারও চাঁদকে কাতরভাবে অনুরোধ করেছেন -

''তুমি পূজিলে মোকে পূজিব সর্ব্বলোকে।
তে কারণে এতেক বলিএ তোমাকে।।''[১০]

অবশ্য এর পূর্বেই মনসা বা পদ্মা চাঁদকে হুঁশিয়ারীও দিয়েছেন এই বলে -

''আপনার ভাল মন্দ বুঝিয়া আপন।
চন্দ্রধর নাম তোমি ধর কি কারণ।।
স্বর্গ মৈর্ত্ত পাতাল জে এ তিন ভুবন।
সকল মারিতে পারি মোর বিস বাণ।।
সবে পূজ তোমি শঙ্কর ভবানি।
মর হাতে দুইজনে হারাইছে পরাণী।।

Dhaka University Institutional Repository

বাপ হেন সমন্ধেহ না মারিলুহ মনে।
কোপ দৃষ্ট সতাইরে বধিলুম জিবনে।।
দেবগণে স্তুতি করি বোলিল ভজিয়া।
তে কারণে এতেক তোলিলু জিয়া।।
তোমা কি করিতে পারে সঙ্কর ভবানি।
আমারে গালি দিয়া তেমি বারাইলু বানি।।"১১

মনসার কথা শুনে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় চাঁদের মনের দ্বন্দ্ব ঃ

"চান্দে বোলে জদি পূজম বিসহরি।
পশ্চাতে সুনিলে কষ্ট করিবেক গৌরি।।"১২

চাঁদের মনের দ্বন্দ্ব ঘুচাতে এবার স্বয়ং গৌরী বা ভবানী বা চণ্ডীর আবির্ভাব ঘটল .

"চান্দোরে ডাকিয়া চণ্ডী বলিলা বচন।।
তোমার ঠাই কহি শুন চান্দ সদাগর।
এক মূর্ত্তি আমি সেই নাহি অন্য পর।।
যেই ব্রহ্মা সেই বিষ্ণু সেই মহেশ্বর।
কুবের বরুণ আদি চন্দ্র দিবাকর।।
পদ্মা আমি দেখ তুমি হই এক মূর্ত্তি।
এ বলিয়া সাক্ষাত হইল ভগবতী।।
এক দৃষ্টে দুইজন চাহে সদাগর।
ভিন্ন ভেদ নাহি কিছু এক সমসর।।
এতেক দেখিয়া চান্দোর লাগে চমৎকার.
ভূমে পড়ি অষ্ট অঙ্গে করে নমস্কার।।"১৩

মনসা ও ভবানী বা ভগবতীর অদ্বয় মূর্তি দেখে চাঁদের মনসাপূজা করার ক্ষেত্রে আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রইল না। এখন তিনি মনসাপূজায় কৃত সংকল্পবদ্ধ । কিন্তু তার পূর্বে দেবীর কাছে তার ছোট্ট একটা আবদার ঃ

Dhaka University Institutional Repository

''চান্দে বলে তোমা পারি পূজিবারে।
আমান নাহি চান্দয়া টাঙ্গায়ত উপরে।।''[১৪]

চাঁদের নাম কাপড়ে (চান্দোয়ায়) লিখে মনসাদেবীর মাথায় টাঙিয়ে রাখতে হবে ; তা হলেই চাঁদ সদাগর মনসার পূজা করবেন। দেবী দশভুজার কাছে যেমন মৃত্যু পথযাত্রী মহিষাসুর তাঁর চরণতলে স্থান নিয়ে ভক্তগণের পূজা পাবার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন এবং অসুর-ভক্তের কাতর অনুরোধ যেমন করুণাময়ী মাতা ফিরিয়ে দিতে পারেননি, আজও তেমনি মা করুণাময়ী চাঁদের কাতর অনুরোধকে ফিরিয়ে দিতে পারলেন না। এর পর মহাসমারোহে চাঁদ সদাগর কর্তৃক মনসাপূজার আয়োজন চলতে লাগল।

''পৃথিবীর যে অঞ্চলে যে যুগে যে সমাজবিধির ভিতরেই কোনও দেবীর উদ্ভব বা অভিব্যক্তি হৌক না কেন, তাঁহারা শক্তিরূপিণী এক সনাতনী মহাদেবীরই অংশ বা রূপভেদ মাত্র।''[১৫] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগর কর্তৃক মনসার স্তবে এই তত্ত্বটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে ঃ

''বলে চাঁদ অধিকারী তুমি মূল মন্ত্রধারী
কি করিব দেবী তব ধ্যান ।।
তুমি দেবী ভগবতী অযোনিসম্ভবা সতী
অনন্তাদি পাতালবাসিনী।

* * *

আদ্যাশক্তি সনাতনী তুমি মুক্তি প্রদায়িনী
জগতের গৌরী মহামায়া।।''[১৬]

বেদের মত পুরাণেও বহুদেবতার উপাসনার প্রচলন আছে। এক বা একাধিক দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে এক একটি পুরাণে । বেশির ভাগ মহাপুরাণ এবং উপপুরাণে বহু দেবতার প্রসঙ্গ আছে। পুরুষ দেবতার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব প্রধান। এই 'ত্রয়ী দেবতা' ছাড়াও আছেন গণেশ, কার্তিকেয়, সূর্য, চন্দ্র, পবন, বরুণ, ইন্দ্র, মদন, যম, কুবের, দক্ষ, অগ্নি প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতা। শক্তি তথা নারী দেবতার মধ্যে দুর্গা বা পার্বতী প্রধান। কিন্তু তাঁর বহু রূপভেদ-কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি। বিষ্ণুর

Dhaka University Institutional Repository

যেমন আছেন দশ অবতার, তেমনি শক্তিদেবতার প্রকারভেদ হিসেবে আছেন দশ মহাবিদ্যা। সরস্বতী, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, গায়ত্রী , গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি আরও অনেক নারী-দেবতা শক্তি গোষ্ঠীর অন্তর্গত। কিছু কিছু পুরাণে ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা প্রভৃতি দেবীদের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া আরও কত পৌরাণিক, লৌকিক প্রভৃতি দেবদেবী রয়েছেন। প্রচলিত কথায় হিন্দুর দেবদেবীর সংখ্যা তেত্রিশ কোটি হলেও ''এত দেবতার পূজার্চনা যে ধর্মের অঙ্গীভূত সেই ধর্মও মূলতঃ একেশ্বরবাদী।''[১৭] কথাটা বিস্ময়কর মনে হলেও সত্য। ভারতীয় দেবোপসনা বহুত্বকে স্বীকার করে নিয়ে বহুর মধ্যে এককে অথবা একের মধ্যেই বহু রূপের আত্মপ্রকাশকে অনুভব করেছেন। মনসামঙ্গল কাব্যেও এই ''বহুর মধ্যে এক এবং একের মধ্যে বহু'' - এই উভয় ভাবটি পরিলক্ষিত হয়। মনসামঙ্গল কাব্যে দেবদেবীর স্বরূপ এর মধ্যেই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

তথ্য নির্দেশ ঃ

০১। মহাভারত ও সিন্ধুসভ্যতা, পৃঃ ১২২

০২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২

০৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২-৯৩

০৪। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ২৫৯

০৫। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শক্তি সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৩৮৭, পৃঃ ৯

০৬। মমতাজুর রহমান তরফদার, বাংলার ধর্মজীবন (আনিসুজ্জামান সম্পাদিত ' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড)' - এর পঞ্চম অধ্যায়), পৃঃ ২৫০

০৭। পূজা-পার্বণের উৎসকথা, পৃঃ ৯২

০৮। বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গল, পৃঃ ১২৬-১২৭

০৯। মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৭৬

১০। সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ৩৩৩

১১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৩

১২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৩

১৩। কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ (জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত), পৃঃ ৫৩৫

Dhaka University Institutional Repository

১৪। সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ৩৩৩

১৫। ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃঃ ৫

১৬। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (সংকলিত ও সম্পাদিত), (কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত) মনসামঙ্গল, পৃঃ ১১৭

১৭। হিন্দুদের দেবদেবী ঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (প্রথম পর্ব), পৃঃ ১৮

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থ পঞ্জী

ক) মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণের মুদ্রিত গ্রন্থ ঃ

১। নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, তমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২

২। বিজয় গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২

৩। বিজয় গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, বসন্তকুমার ভট্টাচার্য সঙ্কলিত, বাণী-নিকেতন, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত।

৪। বিপ্রদাস , মনসাবিজয়, সুকুমার সেন সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৫৩

৫। শ্রীরায় বিনোদ, পদ্মাপুরাণ, ডঃ মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পাদিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩

৬ দ্বিজ বংশীদাস, পদ্মাপুরাণ, অনাথবন্ধু কাব্য - ব্যাকরণতীর্থ সংগৃহীত ও পরিশোধিত, বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, কলকাতা, রাজ সংস্করণ, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত।

৭। কেতকাদাস- ক্ষেমানন্দ, মনসা-মঙ্গল (প্রথম খন্ড), যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৩

৮। কেতাকাদাস-ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সংকলিত ও সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি, নয়াদিল্লী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৭৭

৯। ক্ষেমানন্দ দাস, মনসামঙ্গল, বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদতি, নটবর চক্রবর্তী প্রকাশিত, ১৩১৬

১০। তন্ত্রবিভূতি , মনসাপুরাণ, ডঃ আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০।

১১। জগজ্জীবন, মনসামঙ্গল, সুরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য ও ডঃ আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০।

১২। বিষ্ণু পাল, মনসা-মঙ্গল, সুকুমার সেন সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৬৮।

১৩। দ্বারিকাদাস, মনসামঙ্গল, ডঃ বিষ্ণুপদ পান্ডা সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৯।

১৪। কালী প্রসন্ন বিদ্যারত্ন, মনসা-মঙ্গল, নন্দলাল শীল সম্পাদিত, বেণী মাধব শীল'স লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৯৮

১৫। রাধানাথ রায় চৌধুরী, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৭৫

১৬। নারায়ণ দেব ও জানকী নাথ, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, প্রাণ কুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পঞ্চম সংস্করণ, , ১৩৮২

Dhaka University Institutional Repository

১৭। আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬২।

খ) ইতিহাস ও আলোচনা গ্রন্থ ঃ

১। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), লেখক-সমবায়-সমিতি, কলকাতা, সংক্ষেপিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮২।

২। দীনেশ চন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, পর্ষদ কর্তৃক দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯১

৩। দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দ্বিতীয় খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, পর্ষদ কর্তৃক দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯১।

৪। ডঃ সুকুমার সেন, ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, গ্রন্থ প্রকাশ, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৭৩।

৫। রনজিৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস-পরিক্রমা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৯৯২।

৬। ডঃ অুল সুর, মহাভারত ও সিন্ধু সভ্যতা, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৮৮।

৭। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৯।

৮। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা (দ্বিতীয় খন্ড- মধ্যযুগ), রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৭।

৯। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড ঃ ? - ষোড়শ শতাব্দী), আনন্দ পাবলিসার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আনন্দ সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৫।

১০। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড ঃ সপ্তদশ - অষ্টাদশ শতাব্দী), আনন্দ পাবলিসার্স লিঃ , কলকাতা, আনন্দ সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪০০

১১। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (প্রথম খন্ড ঃ আদি ও মধ্য যুগ), ওরিয়েন্ট বুক কোঃ, কলকাতা, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৬৭।

১২। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (খ্রীস্টীয় দশম-বিংশ শতাব্দী), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ , কলকাতা, পুনর্মুদ্রিত নতুন সংস্করণ, ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৩। আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭।

১৪। আহমদ শরীফ, মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

১৫। সুখময় মুখোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩।

১৬। আবদুল করিম, বাংলা সাহিত্যের কালক্রম (মধ্যযুগ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।

১৭। ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, ১৯৭৮।

১৮। গোপাল হালদার, বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (প্রথম খন্ড - প্রাচীন ও মধ্যযুগ), মুক্তধারা, ঢাকা, বাংলাদেশে দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮০।

১৯। আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খন্ড), বর্ণ মিছিল, ঢাকা, ১৯৭৮।

২০। ডঃ অতুল সুর, বাঙলার সামাজিক ইতিহাস, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৬।

২১। শিব প্রসাদ হালদার, পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গ সাহিত্য, ফার্মা কে এল এম, প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৮৩।

২২। ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবীঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (প্রথম পর্ব), ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮২।

২৩। ডঃ হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবীঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (দ্বিতীয় পর্ব), ফার্মা কে এল এম, প্রাঃ লিঃ কলকাতা, ১৯৭৮।

২৪। ডঃ হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবীঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (তৃতীয় পর্ব), ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৮০।

২৫। ডঃ রণেন্দ্রনাথ দেব, প্রাচীন বাংলা কাব্য প্রদক্ষিণ, প্রবাল প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৪।

২৬। স্বামী নির্মলানন্দ, দেবদেবী ও তাঁদের বাহন , শ্রী শ্রী প্রণব মঠ, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৩৫।

২৭। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (সম্পাদিত), কবি শুকুর মাহমুদ বিরচিত গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪।

২৮। পল্লব সেন গুপ্ত, পূজা-পার্বণের উৎসকথা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

২৯। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৩৮৭।

৩০। চিত্তরঞ্জন মাইতি, বাংলা কাব্য প্রবাহ, ডি মেহরা রূপা অ্যান্ড কোং, কলকাতা , ১৯৬৪।

৩১। ক্ষেত্রগুপ্ত, প্রাচীন কাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৩।

৩২। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ ঃ দর্শনে ও সাহিত্যে, এ, মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৩৯৬।

৩৩। গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, ১৯৭৮।

৩৪। ডঃ কামিনী কুমার রায়, বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার, বাসন্তী লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৮০।

৩৫। ডঃ শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য, পুঁথি প্রকাশনা, কলকাতা, ১৯৯৪।

৩৬। ডঃ অমলেন্দু মিত্র, রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর , ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৭২।

৩৭। ডঃ শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে পুরুষ চরিত্র, অমরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলকাতা, ১৯৯২।

৩৮। ডঃ জয়া সেন গুপ্তা, মনসামঙ্গল কাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী, বড়াল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০।

৩৯। অরবিন্দ পোদ্দার, মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৯৯৪।

৪০। ডঃ শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী চরিত্র, পুঁথি প্রকাশনা, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬।

৪১। ডঃ মুহম্মদ শাহ্ জাহান মিয়া, শ্রীরায় বিনোদঃ কবি ও কাব্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১।

৪২। সুবোধ কুমার চক্রবর্তী, বৈদিক উপনিষদ, মন্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৩৯০।

৪৩। ডঃ ভবতোষ দত্ত, বাঙালিমানসে বেদান্ত, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৬।

৪৪। সুবোধ কুমার চক্রবর্তী, পুরাভারতী, এ, মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৩৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

৪৫। সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ , গ্রীক পুরাণ কথা, তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৮২।

৪৬। ফরহাদ খান, প্রতীচ্য পুরাণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪।

৪৭। অতীন্দ্র মজুমদার, ভাষাতত্ত্ব, নয়া প্রকাশ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭।

গ) ধর্মীয় গ্রন্থ ঃ

১। সুবোধ কুমার চক্রবর্তী (সার-অনূদিত), কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত দেবী ভাগবত, এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ কলকাতা, ১৩৮৮।

২। মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, সপ্তশতী-সমন্বিত চন্ডীচিন্তা, শ্রীমহানামব্রত কালচার‍্যাল এন্ড ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, ১৪০১।

৩। সুবোধ কুমার চক্রবর্তী (সার-অনূদিত), শিব মাহাত্ম্য প্রকাশক সৌর পুরাণ, এ , মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৩৮৯।

৪। দীনেশ চন্দ্র সেন (সম্পাদিত), কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আখ্যাপত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত থাকায় প্রকাশকের নাম পাওয়া যায় নাই, কলকাতা, ১৯১৬।

৫। জগদীশ চন্দ্র ঘোষ (সম্পাদিত), শ্রীমদ্ভগবদগীতা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা, ষষ্ঠ-বিংশতিতম সংস্করণ, ১৯৯৬।

ঘ) অভিধান ঃ

১। সুধীর চন্দ্র সরকার (সংকলিত), পৌরাণিক অভিধান, এম, সি, সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পন্চম সংস্করণ, ১৩৯২।

২। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলিত), সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, ১৯৯৩।

৩। সুবল চন্দ্র মিত্র (সংকলিত), সরল বাঙ্গালা অভিধান, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯১।

৪। রাজ শেখর বসু (সংকলিত), চলন্তিকা, এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ত্রয়োদশ সংস্করণ, ১৩৮৯।

ঙ) ইংরেজী গ্রন্থ ঃ

১। Sir Monier Williams, BRAHMANISM AND HINDUISM, Enfield House, Ventor, 1891.

২। Delano Ames, GREEK MYTHOLOGY, Paul Hamlyn Limited, Westbook House, London, 1963.

চ) পত্রিকাদি ঃ

১। সাহিত্য পত্রিকা (ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চতুর্দশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শীত ১৩৭৭।

২। সাহিত্য পত্রিকা (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চৌত্রিশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৯৭।

৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত), দ্বাবিংশসংখ্যা, আষাঢ় ১৩৯১ (জুন ১৯৮৫)।

৪। সাহিত্য পত্রিকা (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফাল্গুন ১৩৯৮।

৫। গোপিকারঞ্জন চক্রবর্তী, বাংলা মঙ্গলকাব্যে শ্রমজীবী মানুষ, অপ্রকাশিত পি, এইচ, ডি, অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬।